মাধ্যমিক
সামাজিক বিজ্ঞান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবছর
থেকে নবম–দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত।

সামাজিক বিজ্ঞান

[নবম–দশম শ্রেণী]

রচনা

রওশন আরা বেগম
আব্দুল হাই শিকদার
ড. ক্ষণদা মোহন দাস

সম্পাদনা

আব্দুস শহীদ
মো: শামসুল হক
মো: আবুল হাসান
জাহান–ই–গুলশান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ
লেজার স্ক্যান লিমিটেড
ফোন : ৯৫৬২৮৬৫, ৯৫৬৭৬০৮

প্রচ্ছদ
সেলিম আহ্‌মেদ

চিত্রাঙ্কন
গ্রাফোসম্যান
দি ম্যাপপা

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে : অঙ্কুর আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওয়েব বিন্যাস)

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষাবিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশাকরা যায় পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক–শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়-শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে-কোনো বিষয়কে বিচারবিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টিতে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি ও অর্থনীতির মৌল বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া জনসংখ্যা শিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্যোগব্যবস্থাপনা এবং এইডস শিক্ষা-এই বিষয় তিনিটি সংযোজিত হয়েছে। এটির পঠনপাঠনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীরা সামাজিক অগ্রগতির ধারা, নিজ দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক, রাষ্ট্রিয় ও আর্থসামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হবে। আশা করা যায়, নিবিড়ভাবে শিক্ষাক্রম অনুসরণে রচিত এই পাঠ্যপুস্তকটি চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হবে, সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জন করবে এবং তাদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠ বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্র□টি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ
সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা

সমাজবিজ্ঞান

১৮৩৯ সালে ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁৎ (August Comte) সর্বপ্রথম "Sociology" শব্দটি প্রবর্তন করেন। Sociology শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ "Socious" এবং গ্রিক শব্দ "Logos"- এর সমন্বয়ে। "Socious" অর্থ সমাজ এবং "Logos" অর্থ অধ্যয়ন বা বিজ্ঞান। অর্থাৎ সমাজ সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে থাকে তাই সমাজবিজ্ঞান।

সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এল.এফ.ওয়ার্ড এবং গ্রাহাম সামনার-এর মতে, "সমাজবিজ্ঞান হল সামাজিক ঘটনাবলির বিজ্ঞান"। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খেইম বলেন যে, "সমাজবিজ্ঞান হল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান"। ম্যাকাইভার ও পেজ-এর মতে, "সমাজবিজ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান যা সমাজ ও মানুষের সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।"

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ। মূলত গোটা সমাজের নিখুঁত বিশ্লেষণই সমাজবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, গোটা সমাজই সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত। সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল :

সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা

সমাজ : মানুষ সামাজিক জীব। প্রত্যেক মানুষ সমাজেই জন্মগ্রহণ করে, বৃদ্ধি লাভ করে এবং সমাজেই মৃত্যুবরণ করে। তাই সমাজ ছাড়া মানুষ নিজের অস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারে না এবং নিজের প্রয়োজনেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। এখন প্রশ্ন হল সমাজ বলতে কী বোঝায় ?

সমাজ কী ?

সমাজ বলতে সাধারণত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে বোঝায়। অর্থাৎ যখন বহুলোক একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে। সাধারণত দুইটি বৈশিষ্ট্য থাকলে যে কোনো জনসমষ্টিকে সমাজ বলা যেতে পারে, যথা- (ক) বহুলোকের সংঘবদ্ধ বসবাস এবং (খ) ঐ সংঘবদ্ধতার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য।

সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট-এর মতে, "সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্কে যুক্ত"। যখন একজন মানুষ অপর একজনকে জানবে, তার সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করবে, এবং এক জন আরেক জন সম্পর্কে সচেতন হবে, তখনই সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলামেশার ফলে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তাই সামাজিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক যে কোনো ধরনের হতে পারে– সহযোগিতার সম্পর্ক, প্রতিযোগিতার সম্পর্ক, স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক, ঘৃণার সম্পর্ক, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক, শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক ইত্যাদি।

সমাজের উপাদান

সমাজ হল পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের সমবন্ধযুক্ত মনুষ্যগোষ্ঠী। অর্থাৎ যখন বহু ব্যক্তি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে তখন ঐ জনসমষ্টিকে সমাজ বলে। এখন প্রশ্ন হল কী কী উপাদান দ্বারা সমাজ গঠিত ? সমাজ বিভিন্ন উপাদান দ্বারা গঠিত। যথা–

১। **সংঘবন্ধ মানুষ :** সমাজের প্রধান উপাদান হল সংঘবন্ধ মানুষ। মানুষ ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

২। **পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সচেতনতা :** পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সচেতনতা না থাকলে সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। আর সামাজিক সম্পর্কহীন মনুষ্যগোষ্ঠীকে সমাজ বলা যায় না। সুতরাং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সচেতনতাকে সমাজ গঠনের অন্যতম উপাদান হিসেবে অভিহিত করা যায়।

৩। **সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য :** সমাজ গঠন করতে যেমন কতগুলো মানুষের প্রয়োজন তেমনি ঐ সব মানুষের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে অন্তত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থাকতে হয়। আর এ সম্বন্ধে তাদের মধ্যে অল্পবিস্তর চেতনা থাকাও জরুরি। সামাজিক সম্পর্কহীন মনুষ্যগোষ্ঠীকে সমাজ বলা যায় না। কেবলমাত্র সমাজের মধ্যে সাদৃশ্যই থাকবে, এটা ঠিক নয়। যেসব মানুষ নিয়ে সমাজ গঠিত, সেসব মানুষের মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

৪। **সহযোগিতা :** সহযোগিতা হল সমাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ সহযোগিতা ছাড়া সমাজ টিকে থাকতে পারে না। পারস্পরিক সহযোগিতা হল সমাজের ভিত্তি।

৫। **পরস্পর নির্ভরশীলতা :** পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সমাজের আরেকটি উপাদান। সমাজের মানুষ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। কারণ মানুষ একা বাঁচতে পারে না। সমাজে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে না।

সুতরাং উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, সমাজ গঠন করতে যেমন দরকার সমাজবন্ধ মানুষ, তেমনি প্রয়োজন মানুষদের মধ্যে সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সহযোগিতা। এগুলো না হলে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। আর সামাজিক সম্পর্ক না হলে কোনো মনুষ্যগোষ্ঠীকে আমরা সমাজ বলতে পারি না।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা

মানুষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীব। সংস্কৃতির অধিকারী হওয়ার জন্য মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা।

সংস্কৃতি কী ?

সাধারণত সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসগত উৎকর্ষ। কিন্তু আসলে সংস্কৃতি বলতে আরো কিছু বোঝায়। মানুষের জীবনের সব দিকগুলোই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতি হল মানুষের আচরণের সমষ্টি। সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ সমাজ থেকে যা কিছু অর্জন করে তাই সংস্কৃতি। মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার, ভাষা, খাওয়া-দাওয়া, নৈতিকতা, মূল্যবোধ সব কিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। ই.বি টেইলর (Tylor) বলেন যে, "সংস্কৃতি হচ্ছে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতি, নিয়ম, সংস্কার ও অন্যান্য দক্ষতা যা মানুষ সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জন করে থাকে। নর্থ (North) -এর মতে, "কোনো সমাজের সদস্যরা বংশ-পরম্পরায় যেসব আচার, প্রথা ও অনুষ্ঠান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে তাই সংস্কৃতি।"

সংস্কৃতির উপাদান : সংস্কৃতির উপাদানকে ২টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যথা– (ক) বস্তুগত উপাদান ও (খ) অবস্তুগত উপাদান। সংস্কৃতির যে উপাদানটি বাস্তবরূপ ধারণ করে থাকে তাকে সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান বলা হয়। যেমন– ঘরবাড়ি, কলকারখানা, টেবিল, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি। অন্যদিকে সংস্কৃতির যে উপাদানটি উপলব্ধি বা অনুধাবন করা যায় তাকে অবস্তুগত উপাদান বলে। যথা– জ্ঞান, বিশ্বাস, নাটক, সাহিত্য, নৃত্যকলা, ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

সভ্যতা কী ?

অনেক সমাজবিজ্ঞানী সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে এক করে দেখেন। কিন্তু সংস্কৃতি ও সভ্যতা এক জিনিস নয়। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ডন মার্টিন ডেল বলেন যে, উন্নত ধরনের শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম–এরই সম্মিলিত অর্থে সভ্যতা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সভ্যতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, "সভ্যতা অর্থে আমরা বুঝি মানুষ তার জীবন ধারণের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা, কলাকৌশল ও সংগঠন সৃষ্টি করেছে, তারই সামগ্রিক রূপ।" সুতরাং সভ্যতা বলতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে বোঝায় যার দ্বারা মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। অর্থাৎ নানা ধরনের কারিগরি কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে সম্পর্ক জানতে হলে তাদের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

(১) সংস্কৃতি হল মানুষের অবস্তুগত (Im-material) সৃষ্টি। যেমন– জ্ঞান, বিশ্বাস, সংগীত, নৃত্যকলা ইত্যাদি। এগুলো হল সংস্কৃতি। অন্যদিকে সভ্যতা হল মানুষের বস্তুগত (Material) সৃষ্টি। যেমন– ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, ঘড়ি, টেলিভিশন, মোটরগাড়ি ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার বলেন, "আমরা 'যা' সেটাই আমাদের সংস্কৃতি, আর আমাদের 'যা আছে' বা আমরা যা ব্যবহার করি সেটাই হল সভ্যতা।"

(২) জার্মান দার্শনিক কান্ট (Kant) বলেন যে, সংস্কৃতি ব্যক্তির মনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার; সভ্যতার সঙ্গে ব্যক্তির বাহ্য আচরণের সম্পর্ক।

(৩) দক্ষতার ভিত্তিতে সভ্যতার পরিমাপ করা যায়, কিন্তু সংস্কৃতির বিচার হয় মানুষের মানসিক উৎকর্ষের ভিত্তিতে। যেমন– একটি ট্রাক ঘোড়ার গাড়ির তুলনায় অধিক দ্রুতগামী, একটি উড়োজাহাজ ট্রাকের চেয়ে বেশি দ্রুতগামী। অন্যদিকে সংস্কৃতিকে কোনো কিছু দিয়ে বিচার করা যায় না। যেমন- একটি ভালো চিত্র কারোর কাছে সুন্দর, আবার কারোর কাছে অসুন্দর লাগতে পারে।

(৪) সভ্যতা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যায়, কিন্তু সংস্কৃতি অর্জন করতে হয়। যেমন- উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো ব্যক্তি একটি হারমোনিয়াম পেতে পারে, কিন্তু ঐ হারমোনিয়াম বাজানোর কৌশল তাকে শিখতে হয়।

(৫) সভ্যতার অবদানকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু সংস্কৃতির অবদান সাধারণ মানুষ অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারে না। সাধারণ লোক সামান্য শিক্ষা পেলেই আধুনিক যন্ত্রপাতির কলাকৌশল বা ব্যবহার বুঝে নিতে পারে। কিন্তু কোনো লোককে কবিতা লেখার নিয়ম শিখালেই যে সে ঐ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

(৬) সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু সংস্কৃতি সহজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। যেমন নর্ডিক জাতি রোমানদের পরাজিত করে রোমান সভ্যতা ধ্বংস করে দিয়েছিল, কিন্তু তারা রোমান ভাষা, আইন, প্রথা, ধর্ম প্রভৃতি সংস্কৃতির উপাদান ধ্বংস করতে পারে নি, বরং সেগুলো গ্রহণ করেছিল।

(৭) সভ্যতার গতি খুব দ্রুত, সংস্কৃতির গতি তেমন দ্রুত নয়।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। চারাগাছের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য যেমন উপযুক্ত মাটি ও জলবায়ুর প্রয়োজন, তেমনি সংস্কৃতির বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দরকার। সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান এ পরিবেশ সৃষ্টি করে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির যেমন উন্নতি সাধিত হয়, ঠিক তেমনি সভ্যতার অবদানকে উপেক্ষা করে সংস্কৃতি নিজেকে বিকশিত করতে পারে না। কাজেই সভ্যতাকে সংস্কৃতির একটি অংশ হিসেবে গণ্য করাই যুক্তিসঙ্গত।

সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন ধাপ

সমাজ স্থিতিশীল নয়, পরিবর্তনশীল। বর্তমানকালে আমরা যে আধুনিক সমাজে বসবাস করছি, আগে তা ছিল না। বর্তমান আধুনিক সমাজ বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে বিবর্তন ধারায় বর্তমান রূপ লাভ করেছে। সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজ বিকাশের ধারাকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করেছেন, যথা- (১) আদিম সমাজ, (২) পশুপালন সমাজ, (৩) কৃষি সমাজ এবং (৪) শিল্প সমাজ। আবার প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের ধারাকে (১) প্রাচীন প্রস্তরযুগ, (২) নব্য প্রস্তরযুগ, (৩) ব্রোঞ্জযুগ এবং (৪) লৌহযুগ এভাবে ভাগ করেছেন।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন ধাপ :

(১) **আদিম সমাজ :** মানবসভ্যতার শুরু হয়েছে আদিম সমাজ হতে। এ সমাজকে নৃবিজ্ঞানীগণ অনক্ষর সমাজ বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ যে সমাজে সভ্যতার আলো পৌছায়নি এবং যে সমাজের লোকেরা লিখতে পড়তে জানত না সে সমাজকে আদিম সমাজ বলা যেতে পারে।

আদিম সমাজের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

(ক) **অর্থনৈতিক অবস্থা :** আদিম সমাজের লোকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সহজ সরল নিম্নমানের। তারা দলবদ্ধ হয়ে বনজঙ্গল হতে ফলমূল সংগ্রহ ও পশুপাখি শিকার করত এবং নদীনালা খালবিল হতে মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। এ সমাজের মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে পারত না, প্রকৃতি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত। তাই এ অর্থনীতিকে খাদ্য-সংগ্রহ অর্থনীতি বলা হয়।

আদিম সমাজে সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানা ছিল না, ছিল সামাজিক মালিকানা। ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকার কারণে আদিম সমাজ ছিল শ্রেণীহীন। এ সমাজে খাদ্য ছিল অপ্রতুল। এ সময় কোনো বাড়তি খাবার জমা রাখার চিন্তাই করা যেত না। শিকারে যা পাওয়া যেত সবাই মিলে একসঙ্গে ভুরিভোজ করত নয়তো সবাই একসাথে উপোস করে থাকত। আদিম সমাজে প্রাকৃতিক শ্রমবিভাগ দেখা যায়। টাকা-পয়সা, লেনদেন, হাট-বাজার বলতে কিছুই ছিল না। তবে তাদের মধ্যে বিনিময় প্রথা বিদ্যমান ছিল।

(খ) **হাতিয়ার :** আদিম সমাজের মানুষেরা আত্মরক্ষা ও পশুপাখি শিকারের জন্য বিভিন্ন রকম হাতিয়ার ব্যবহার করত। আদিম মানুষের প্রথম হাতিয়ার হল গাছের ডালপালার লাঠি এবং অমসৃণ পাথরের টুকরা। ক্রমে ক্রমে তারা তীরধনুক, মুগুর, বল্লম, চাকু, বড়শি, দা, বর্শা, গদা, বুমেরাং ইত্যাদি তৈরি করতে শেখে।

(গ) **পোশাক-পরিচ্ছদ :** আদিম সমাজের লোকেরা শুধুমাত্র লজ্জা ও শীত নিবারণের জন্য বা বৃষ্টি ও রোদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই যে পোশাক পরিধান করত, তা নয়। সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে তারা পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করত। পোশাকের মাধ্যমেই আদিম সমাজের লোকদের সামাজিক মর্যাদা প্রকাশ পেত। পোশাক হিসেবে তারা ব্যবহার করত বনের লতাপাতা, গাছের ছাল-বাকল, অথবা পশু-পাখির চামড়া।

(ঘ) **জীবনমান :** আদিম সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালি ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। এরা ফলমূল সংগ্রহ, মাছ ও পশু-পাখি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। তারা প্রকৃতিতে অসহায় জীবন যাপন করত। প্রকৃতির কাছে তারা ছিল অসহায়। বাড়তি খাবার ছিল না। দলবদ্ধ হয়ে শিকার করে যা পেত তা সবাই ভাগ করে খেত। এদের অবস্থা ছিল অনেকটা "দিন আনে দিন খায় গোছের"। রোগ, শোক, মহামারী, জীবজন্তুর সঙ্গে লড়াই করে তাদেরকে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে হত।

(২) **পশুপালন সমাজ :** আদিম সমাজের পরবর্তী সমাজব্যবস্থার নাম পশুপালন সমাজ। এ সমাজের মানুষেরা খাদ্য সংগ্রহের পাশাপাশি পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। পশুপালন সমাজেই সর্বপ্রথম সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা যায়।

(৩) **কৃষি সমাজ :** কৃষির আবিষ্কার মানবসমাজ বিকাশের আরো একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। কেননা পশুপালন সমাজে মানুষ যাযাবরের ন্যায় এক স্থান হতে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু কৃষি আবিষ্কারের সাথে সাথে মানুষ স্থায়ীভাবে এক স্থানে বসবাস শুরু করে। কৃষিকাজ মানুষের খাদ্যের সরবরাহ আরো নিশ্চিত করে। উদ্বৃত্ত ফসল ফলায়, মানুষ কৃষিকাজ ছাড়াও অন্যান্য পেশায় যেমন– শিল্প, সংগীত, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি পেশায় অংশগ্রহণ করতে থাকে। অর্থাৎ কৃষিতে উদ্বৃত্ত ফসল সভ্যতার সূচনা করে।

(৪) **শিল্পযুগ :** কৃষিযুগের শেষ দিকে এবং শিল্পযুগে মানুষ শিল্পকারখানা গড়ে তোলে। এ সময়ে শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে। কৃষি ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার এবং বিদ্যুতের ব্যবহারে শিল্পকারখানায় উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ছোট ছোট শিল্পকারখানার পাশাপাশি বৃহদায়তন শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। সমাজে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী এবং শ্রেণী-বৈষম্য।

শিল্পযুগকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা– (ক) পুঁজিবাদী যুগ (খ) সমাজতান্ত্রিক যুগ এবং (গ) সাম্যবাদী যুগ। এ তিন যুগে সম্পত্তির প্রকৃতি ও মালিকানা বিভিন্ন প্রকৃতির। পুঁজিবাদী যুগে ২টি শ্রেণী দেখা যায়, যথা– বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি এবং শ্রমিক শ্রেণী। শিল্পকারখানা, ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হল বুর্জোয়া। এ ব্যবস্থায় শ্রমিকেরা মজুরীর বিনিময়ে উৎপাদন যন্ত্রে শ্রম বিক্রি করে।
পুঁজিবাদী যুগের পরবর্তী পর্যায় হল সমাজতান্ত্রিক যুগ। এ যুগে কলকারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পায় এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদনের উপকরণে সামাজিক মালিকানা থাকায় এখানে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ থাকে না। "সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষ যার যার সাধ্যানুযায়ী কাজ করবে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।" এটাই হল সমাজতন্ত্রের মূল কথা।
মার্কসীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে 'প্রত্যেক ব্যক্তি সাধ্যানুযায়ী কাজ করবে এবং প্রয়োজন অনুসারে বণ্টন ব্যবস্থায় অংশ নেবে।"

প্রত্নতাত্ত্বিক যুগ বিভাগ

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মানবসমাজ ও সভ্যতার বিকাশকে ৪টি ধাপে বা যুগে বিভক্ত করেছেন, যথা- (১) প্রাচীন প্রস্তরযুগ (২) নব্য প্রস্তরযুগ (৩) ব্রোঞ্জযুগ এবং (৪) লৌহযুগ।

(১) প্রাচীন প্রস্তরযুগ

প্রস্তরযুগ বলতে পাথরের হাতিয়ার ব্যবহারের সংস্কৃতিকালকে বোঝায়। আর প্রাচীন প্রস্তরযুগ বলতে সে যুগ বা কালকে বোঝায় যখন আদিম মানুষ ভোঁতা ও অমসৃণ পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত। প্রাচীন প্রস্তরযুগ আজ থেকে ৬ লক্ষ বছর পূর্বে আরম্ভ হয়েছিল এবং তা ১০ হাজার বছর পূর্বে শেষ হয়েছিল। প্রাচীন প্রস্তরযুগকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা- (ক) নিম্ন প্রাচীন প্রস্তরযুগ (খ) মধ্য প্রাচীন প্রস্তরযুগ এবং (গ) উচ্চ প্রাচীন প্রস্তরযুগ।

(ক) নিম্ন প্রাচীন প্রস্তরযুগ (৬০০০০০-১০০০০০) : নিম্ন প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ পানি সরবরাহের উৎস, শিকার করার উপযোগী খোলা স্থানে বসবাস করত। তারা পাথরের গায়ে নদীর গতিপথ খোদাই করে রাখত। নিম্ন প্রাচীন প্রস্তরযুগের প্রথম দিকে মানুষ কাঁচা মাংস ভক্ষণ করত, কিন্তু কালক্রমে তারা আগুন জ্বালাবার কৌশল আয়ত্তে এনে মাংস আগুনের তাপে ঝলসে খেতে অভ্যাস করে। এ যুগের মানুষ হল জার্মানীতে প্রাপ্ত হাইডেলবার্গ, ইন্দোনেশিয়ার জাভা মানব এবং চীনের পিকিং মানব।

(খ) মধ্য প্রাচীন প্রস্তরযুগ (১০০০০০-৩০০০০) : মধ্য প্রাচীন প্রস্তরযুগ ১ লক্ষ বছর আগে শুরু হয় এবং ৩০ হাজার বছর পূর্বে শেষ হয়। পূর্বের তুলনায় এ যুগের মানুষ যেসব হাতিয়ার তৈরি করত তা ছিল অধিকতর সরু ও ধারালো। মধ্য প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত। তারা গুহায় বসবাস করত এবং মানুষের মৃত্যু হলে হলুদ ও লাল রং মেখে মৃতদেহ কবর দিত। এ যুগের মানুষ আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছিল। মৃত্যুর পরে আত্মা দেহে পুনরায় ফিরে আসে বলে তারা বিশ্বাস করত। এ বিশ্বাস থেকেই এ যুগের মানুষ কবরের মধ্যে খাদ্য, পানীয়, মৃতের ব্যবহার্য হাতিয়ার প্রভৃতি রেখে নানা রকম আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে কবর দিত। রুগ্ণ ও বয়স্কদের প্রতি যত্ন নেওয়ার রীতি এ সময় হতে চালু হয়েছিল।

(গ) উচ্চ প্রাচীন প্রস্তরযুগ (৩০০০০-১০০০০) : উচ্চ প্রাচীন প্রস্তরযুগের যাত্রা শুরু হয় প্রায় ৩০০০০ বছর পূর্বে এবং তা খ্রিস্টপূর্ব ১০০০০ অব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ যুগের মানুষেরা আরো উন্নত ধরনের হাতিয়ার তৈরি করতে সক্ষম হয়। আল নামক ছিদ্রকারী সুচ ক্ষেপণাস্ত্র ও কাঁটাবিশিষ্ট হার্পুন প্রভৃতি এ সময়ের উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার।

উচ্চ প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ হল ক্রোম্যাগনন। এরা ছিল শিকারি। তারা গুহার দেয়ালে ছবি অঙ্কন করত। এসব ছবির মধ্যে ধাবমান অবস্থায় বাইসন, ঘোড়া, হরিণ, প্রভৃতি জীবজন্তুর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তারা নানারকম অলংকার যেমন– হাতির দাঁত, পুঁতিজাতীয় গুটকা, হাড়, শামুক ও ঝিনুকের মালা ব্যবহার করত। এ যুগের মানুষ মৃত্যু, আত্মা, নিদ্রা প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিল। মৃত্যু হলে আত্মা দেহ হতে চলে যায় বলে তাদের বিশ্বাস ছিল।

(২) নব্য প্রস্তরযুগ

খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ অব্দের পূর্বেই এ যুগের সূচনা হয় মধ্যপ্রাচ্যে, পরে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং সর্বশেষে ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বে ব্রিটেনে। সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসে নব্য প্রস্তরযুগ একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য আবিষ্কারের দিক দিয়ে এ যুগের মানুষ অনেক উন্নতি সাধন করেছিল।

উৎপাদন ব্যবস্থা : এ যুগের মানুষ উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রাচীন প্রস্তরযুগ অপেক্ষা অনেক উন্নতি সাধন করেছিল। তারা খাদ্য-সংগ্রহ অর্থনীতির স্থলে খাদ্য-উৎপাদন অর্থনীতির প্রবর্তন করে। ভূমি চাষও করে, গবাদিপশু পালন করে তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি খাদ্যসম্পদে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এ যুগে স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার পরও বাড়তি খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হয়। সর্ব প্রথম এশিয়া মাইনর বা ইরাক, ইরানের কোনো স্থানে কৃষি আবাদ শুরু হয়। এ অঞ্চলের মানুষ সর্ব প্রথম গম, বার্লি, যব, কুমড়া, গোলআলু প্রভৃতি ফসল উৎপাদন করত। কৃষিতে উদ্বৃত্ত ফসল ফলায় সমাজে অনেকেই হস্তশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কাজে যোগ দেয়। ফলে এ সময়ে বাজার ও শহর গড়ে ওঠে। এজন্য ভি. গর্ডন চাইল্ড (Gordon Child) এ যুগকে নবপলীয় বিপ্লব নামে আখ্যা দেন।

আবিষ্কার : এ যুগের মানুষ মসৃণ, ধারালো ও উন্নত ধরনের পাথরের হাতিয়ার তৈরি করে। তারা উন্নত ধরনের চাকু, কুঠার, গাঁতি প্রভৃতি ব্যবহার করত। মানুষ এ সময় কুঠারের সঙ্গে হাতল লাগানোর কৌশল আয়ত্ত করেছিল। তখন কোদাল তৈরি করা হত। হরিণের শিং দিয়ে তৈরী গাঁইতি মাটি আলগা করার কাজে লাগাত। বর্শা ও তীরের সাহায্যে এ যুগের মানুষ দূরের পশুপাখি শিকার করত। এ যুগে নিড়ানি ও গর্তকারীর উপকরণ (লাঠির) ব্যবহার ছিল আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ যুগের সর্বাপেক্ষা বড় আবিষ্কার হল চাকা। মাটির পাত্র তৈরি করার কাজে চাকা ব্যবহারের সাথে সাথে যন্ত্রশিল্পের সূত্রপাত হয়। তাছাড়া এ যুগের শেষের দিকে মানুষ লাঙল আবিষ্কার করে কৃষিকাজ শুরু করে। তাঁত এ যুগের আরো একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার।

ধর্মীয় জীবন : মধ্য প্রাচীন প্রস্তরযুগের ধর্মীয় রীতিনীতি তখনো লোপ পায়নি। তখনকার মানুষ বিশ্বাস করত যে, আত্মা, প্রেতাত্মা, ঝড়-বজ্রপাত মানুষের অকল্যাণ করতে পারে। তারা অপদেবতা, আত্মা-প্রেতাত্মা বা অতিপ্রাকৃত শক্তির হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা রকম আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করত। এছাড়া তখনকার মানুষ রোগ, শোক, মৃত্যু বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে এসব হতে পরিত্রাণ লাভের আশায় জাদুকরের শরণাপন্ন হত।

মধ্য প্রাচীন প্রস্তরযুগ ও উচ্চ প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষের ন্যায় নব্য প্রস্তরযুগের মানুষেরা বিশ্বাস করত যে মানুষের মৃত্যুর পরে আত্মা দেহে পুনরায় ফিরে আসে। সেজন্য তারা মৃতদেহের সৎকার করার সময় কবরের মধ্যে খাদ্য, পানীয়, মৃতের ব্যবহার্য হাতিয়ার প্রভৃতি রেখে দিয়ে নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে কবর দিত। এছাড়া নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ প্রকৃতিপূজা যেমন– গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা ইত্যাদির পূজা করত। কালক্রমে এ যুগে মানুষেরা ঈশ্বরপূজা করতে শুরু করে।

ব্রোঞ্জযুগ

খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ থেকে ৩০০০ অব্দের মধ্যে মিসর, ভারত, মেসোপটেমিয়া এবং চীনে ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হয় এবং তা ১৪০০ অব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ যুগে মানুষ টিনের সঙ্গে তামা মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করত এবং তা দিয়ে অনেক উন্নতমানের হাতিয়ার তৈরি করত। এ যুগের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

(ক) **ব্রোঞ্জ নির্মিত হাতিয়ার :** এ যুগের মানুষ ব্রোঞ্জের দ্বারা নানা ধরনের হাতিয়ার নির্মাণ শুরু করে। ব্রোঞ্জের নির্মিত বর্ম, শিরস্ত্রাণ, উরস্থান (Curass), তলোয়ার, বর্শা এবং তীর এ যুগের উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার।

(খ) **ব্যবসা-বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক রূপ :** ব্রোঞ্জযুগেই সর্ব প্রথম ব্যবসা-বাণিজ্য আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। খ্রিষ্ট পূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে ভূমধ্যসাগর, আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে নিয়মিতভাবে পাল তোলা বড় বড় নৌকা যাতায়াত করত। সমুদ্রপথে যাতায়াতের জন্য মানুষ আকাশের তারা দেখে দিক নির্ণয় করত এবং এ সময় মানুষ সমুদ্র যাতায়াতের নিয়মকানুন চালু করেছিল।

(গ) **স্থায়ী বসতি নির্মাণ :** ব্রোঞ্জযুগে মানুষ অধিক জনসমষ্টি মিলে বড় বড় স্থায়ী মানবসমাজ গড়ে তোলে। গাছের গুঁড়ির ওপর ঘরের ছাউনি দিয়ে ঘর নির্মাণ করত। এ যুগের শেষ দিকে মানুষ শবদাহ করার রীতি প্রচলন করে।

(ঘ) **লিখন পদ্ধতির উন্নতি :** নব্য প্রস্তরযুগে যে লিখন পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছিল তা ব্রোঞ্জযুগে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল।

(ঙ) **চাকা তৈরি :** চাকা আবিষ্কৃত হওয়ায় এ যুগের মানুষ চাকাওয়ালা গাড়ি যানবাহন হিসেবে ব্যবহার করত। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়ায় যাত্রীবাহী, পণ্যবাহী, যুদ্ধরত প্রভৃতি নানা ধরনের চাকাওয়ালা গাড়ির প্রচলন শুরু হয়।

লৌহযুগ

খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে মধ্যপ্রাচ্যে এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে ব্রিটেনে লৌহের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। এশিয়া মাইনরে হিটটিদের (Hittites) মধ্যে সর্বপ্রথম লৌহশিল্পের ব্যবহার জানা যায়। এ যুগে লৌহনির্মিত কুঠার ও লাঙলের ফলা আবিষ্কার হওয়ায় অকর্ষিত ভূমি পরিষ্কার ও কৃষিকাজ আরো সহজতর হয়। লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহারে জমির ফলন আগের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ লৌহ কৃষিতে আনে এক নবতর বিপ্লব।

আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে লৌহ। বর্তমান যুগে হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি প্রধানত লৌহনির্মিত। যানবাহন তৈরিতে লৌহ ব্যবহারের ফলে যানবাহন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটে। ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণে লৌহের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। লৌহ দ্বারা নির্মিত প্রেস ও অক্ষর আবিষ্কৃত হওয়ায় ছাপাশিল্পের অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখা দেয়। পূর্বের সমাজব্যবস্থার চেয়ে এ সমাজব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে অধিকতর যুক্তিনির্ভর ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ লৌহযুগ মানেই আধুনিক সভ্যতার যুগ এবং এ যুগেই মানুষ আধুনিক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

আধুনিক সমাজ

আধুনিক সমাজ হল সে সমাজ যেখানে মানুষ শিল্পকারখানা স্থাপন ও কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে।

প্রথমত : আধুনিক সমাজে মানুষের জাতীয় আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ আধুনিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল স্বনির্ভর হওয়া।

দ্বিতীয়ত : আধুনিক সমাজের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল রাজনীতিতে আপামর জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। অর্থাৎ রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে দাবি-দাওয়া আদায় এবং নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ যাতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারে সে সুযোগ থাকতে হবে।

তৃতীয়ত : নগরায়ন ও শিল্পায়নের দ্রুত বিকাশ আধুনিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিল্পের সম্পসারণ, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতির মাধ্যমে জনগণের ভৌগোলিক সচলতা আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থত : নিরক্ষরতা দূরীকরণ আধুনিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আধুনিক সমাজে কারিগরি বিদ্যার প্রসারের ফলে মানুষের শারীরিক শ্রম হ্রাস পায় এবং অবসর সময়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলে আধুনিক সমাজে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস লোপ পায় এবং মানুষের মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তিবাদী চিন্তার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

পঞ্চমত : আধুনিক সমাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল প্রচারমাধ্যমগুলোর আধুনিকতা। জনসাধারণের নিকট নানা প্রকার তথ্য-সংবাদ এবং নানা বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান সরবরাহের জন্য সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন তথা ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর প্রভূত উন্নতি সাধন।

ষষ্ঠত : আধুনিক সমাজের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল, এ সমাজের মানুষের মধ্যে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশ কম। কারিগরি বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ও শিক্ষার সম্প্রসারণ এর প্রধান কারণ।

সুতরাং আধুনিক সমাজ বলতে সে সমাজকে বোঝায় যেখানে মানুষ মন-মানসিকতার দিক দিয়ে আধুনিক এবং তারা অতীতের ধ্যান-ধারণার প্রতি অন্ধ আনুগত্য না দেখিয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে যুক্তিবাদী কার্যক্রম গ্রহণ করে।

মানবসমাজে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব

সমাজবিজ্ঞানী পি, সরোকিন (P. Sorokin) এর মতে, "ভৌগোলিক উপাদান বা ভৌগোলিক পরিবেশ বলতে সেই সব মহাজাগতিক অবস্থা এবং ব্যাপারকে নির্দেশ করে যা মানুষের সৃষ্টি নয় এবং যা নিজের নিয়মেই পরিবর্তিত হয়।" তিনি ভৌগোলিক উপাদান বলতে জলবায়ু, তাপমাত্রা, মাটি, বায়ুমণ্ডল, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, গ্রহ নক্ষত্র, ঋতু পরিবর্তন, বৃষ্টিপাত প্রভৃতিকে বুঝিয়েছেন।

ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব :

ভৌগোলিক উপাদান কিভাবে মানবসমাজে প্রভাব বিস্তার করে তা নিম্নে বর্ণনা করা হল :

(১) **জনসংখ্যা বণ্টনের ওপর প্রভাব :** মানবসভ্যতা বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ হল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। যেখানে বসবাস করার উপযোগী আবহাওয়া বিরাজ করে এবং যেখানে খাদ্যের যোগান পর্যাপ্ত সেখানেই জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

(২) **পেশার ওপর প্রভাব :** মানুষের পেশা ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সিলেট পাহাড়ী এলাকা এবং প্রচুর বৃষ্টি হয় বলেই সেখানে চা উৎপন্ন হয়। ফলে সিলেটের চা বাগানে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

(৩) **কুটির শিল্পের ওপর প্রভাব :** শিল্পকারখানাও ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত। রাজশাহীতে রেশম শিল্প এবং সিলেটে বেত ও চা শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে ঐ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ দায়ী।

(৪) **যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর প্রভাব :** কোনো দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা কীরূপ হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে সে দেশের ভৌগোলিক পরিবেশের ওপর। বাংলাদেশ নদী-নালার দেশ বলেই এদেশের প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম হল নৌকা। আবার মরুভূমি অঞ্চলের যোগাযোগের মাধ্যম হল উট।

(৫) **পোশাক-পরিচ্ছদ :** মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদের ওপর ভৌগোলিক পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করে। গ্রীষ্মমণ্ডলের লোকেরা পাতলা, ঢিলেঢালা এবং শীত অঞ্চলের লোকেরা গরম বা পশমি কাপড় পরিধান করে।

(৬) **গৃহ নির্মাণের ওপর প্রভাব :** গৃহ নির্মাণের রীতিতে ভৌগোলিক উপাদান বেশ কার্যকরি ভূমিকা পালন করে । জাপানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয় বলে সেদেশের লোকেরা কাঠ ও কাগজের ঘর নির্মাণ করে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে গোলপাতা ও সুন্দরী কাঠ বেশি জন্মে বলে ঐ অঞ্চলের লোকেরা গৃহ নির্মাণে ঐসব কাঠ ব্যবহার করে।

(৭) **খাদ্যের ওপর প্রভাব :** মানুষের খাদ্য উপাদান ও খাদ্যাভ্যাস নির্ভর করে ভৌগোলিক পরিবেশের ওপর। বাংলাদেশের জলবায়ুতে ধান, ডাল, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি ভালো জন্মে এবং নদনদী, খালবিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। এজন্য বাঙালিদেরকে বলা হয়, "ভাতে মাছে বাঙালি"।

(৮) **অপরাধ প্রবণতার ওপর প্রভাব :** ফরাসি অপরাধবিজ্ঞানী লমব্রসো (Lombroso) বলেন যে, ভৌগোলিক কারণে অপরাধ সংঘটিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে চরাঞ্চলের লোকের মারামারিতে বেশি লিপ্ত হতে দেখা যায়।

(৯) **দক্ষতার ওপর প্রভাব :** মানবদক্ষতাও ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আবহাওয়া মানুষের কর্মক্ষমতাকে প্রভাবান্বিত করে।

উপরের আলোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত।

সমাজজীবনে রাজনৈতিক উপাদানের প্রভাব

মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও আচারব্যবস্থা সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে। মানুষের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয় সাধারণত নাগরিকদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের নানাবিধ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার জন্য এবং দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য।

এর জন্য মানুষ রাজনৈতিক দল গঠন করে, রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এসব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে। ব্যক্তি দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন দলে সংগঠিত হয়ে নিজেদের বক্তব্য ও মতামত জনগণের নিকট উপস্থাপিত করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে জয়ী দল সরকার গঠন করে এবং বিজিত দল 'বিরোধী দল' হিসেবে চিহ্নিত হয়। সরকার দেশের নানাবিধ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার জন্য চেষ্টা করে। অপরদিকে বিরোধী দলের কাজ হল ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনা করা, ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ করা, মন্দ কাজের বিরোধিতা করা, যাতে পরবর্তী নির্বাচনে সরকারি দলকে পরাজিত করা যায়। বিরোধী দলের সক্রিয় ভূমিকার কারণে সরকার দুর্নীতি ও অন্যায়মূলক কাজ হতে বিরত থাকে। এজন্য বলা হয় কোনো দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল সে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। সুতরাং সরকার ও বিরোধী দল মিলে দেশে যদি জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাহলে সে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি না হওয়ার কোনো কারণ থাকে না। দেশের প্রগতি অনেকাংশে নির্ভর করে জনগণের রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা ও কর্মকাণ্ডের ওপর।

সমাজজীবনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব

মানুষের জীবনের যে কর্মগুলো অর্থ-উপার্জনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই অর্থনৈতিক কাজ। যেমন– কৃষক চাষ করে ফসল ফলায়, জেলে মাছ ধরে, শ্রমিক কলকারখানায় কাজ করে, শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করে, চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করে। এগুলো সবই অর্থনৈতিক কাজ। সমাজে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অর্থনৈতিক কার্যাবলির গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ বাঁচার তাগিদেই মানুষ অর্থনৈতিক কার্যাদি সম্পাদন করে। আদিমকাল হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানুষ তার মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য নানা ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করে থাকে। উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে মানুষ দৈনন্দিন নানা ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা করে। তা নাহলে মানুষ তার অপরিসীম অভাব মেটাতে পারত না। সুতরাং মানব ও সমাজজীবনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব অপরিসীম।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। "সমাজবিজ্ঞান হল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান", কোন সমাজবিজ্ঞানী এ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন?

ক. এল, এফ, ওয়ার্ড খ. গ্রাহাম সামনার
গ. ডুর্খেইম ঘ. ম্যাকাইভার ও পেজ

২। কোন শব্দ থেকে সমাজবিজ্ঞান (Sociology) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ?

ক. গ্রিক খ. ল্যাটিন
গ. ইংরেজি ঘ. রোমান

৩। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অর্থনৈতিক কার্যাবলির গুরুত্ব সর্বাধিক হবার কারণ ইহা–

ক. আরাম–আয়েশের নিশ্চয়তা বিধান করে খ. সামাজিক ক্ষমতায়নে সহায়তা করে
গ. ন্যূনতম চাহিদা পূরণে সহায়তা করে ঘ. বিনোদনমূলক চাহিদা পূরণে সহায়তা করে

৪। 'সমাজ' বলতে বুঝায়–

ক. বিশেষ প্রয়োজনে সংগঠিত জনসমষ্টি খ. সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনে সংগঠিত জনসমষ্টি
গ. বিশেষ লক্ষ্য অর্জনে সমবেত জনসমষ্টি ঘ. একই উদ্দেশ্যে সামাজিক সম্পর্কযুক্ত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি

৫। যে বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে পশুপালন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে–

i. জলাভূমি, পশুশিকার ও সমভূমিকে কেন্দ্র করে
ii. তৃণভূমি, মরুভূমি ও পাহাড়ি এলাকাকে ঘিরে
iii. বিশাল উদ্যান, বন্যপশু ও কৃষিভূমিকে নিয়ে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬ থেকে ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সুমির মা ভালো হারমোনিয়াম বাজায়। সুমি তার মায়ের কাছ থেকেই গান শেখে, নূতন কুঁড়িতে গিটার বাজিয়ে যন্ত্রসংগীতে সে প্রথম স্থান অধিকার করে।

৬। সুমির গান শেখার এ আগ্রহকে কী বলা যায় ?

ক. সংস্কৃতি খ. সভ্যতা
গ. সংস্কার ঘ. শিল্প

৭। সভ্যতার পরিমাপ করা যায়–

i. দক্ষতার ভিত্তিতে
ii. উত্তরাধিকার সূত্রে
iii. কলাকৌশলের প্রয়োগ দেখে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৮। **সুমির হারমোনিয়াম বাজানো থেকে গিটারে আগ্রহ সংস্কৃতি ও সভ্যতার কোন উপাদানগুলোকে প্রভাবিত করছে বলে তুমি মনে কর?**

ক. বস্তুগত উপাদান
খ. অবস্তুগত উপাদান
গ. যান্ত্রিক উপাদান
ঘ. কলাকৌশলগত উপাদান।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। **মিনা আধুনিক সভ্যতায় বেড়ে ওঠা সংস্কৃতমনা মেয়ে। কিন্তু মিনার নানি সন্ধ্যা হলেই রাতের খাবার খেয়ে পাশের ঘরে তার জা–য়ের সাথে বসে গল্প করত। মিনার মা দিনান্তে কাজ শেষে রেডিওতে গান শুনত এবং অবসরে গুণ গুণ করে গান করত। মিনা কাজ শেষে বাড়ি ফিরে অবসর সময়ে টেলিভিশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে এবং ইন্টারনেটে বন্ধুদের সাথে আর্থ–সামাজিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।**

ক. সভ্যতা কাকে বলে?
খ. সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ব্যাখ্যা কর।
গ. মিনার মা এবং নানির জীবনবোধের ভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. আধুনিক সংস্কৃতির বিকাশে রেডিও, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিকীকরণ

সংজ্ঞা

একটি শিশু যখন জন্মায়, তখন সে একান্তই ইন্দ্রিয়সর্বস্ব প্রাণী। কারণ সে তখন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাড়িত হয়। কিন্তু আস্তে আস্তে সে নানাভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রক্রিয়াকে সামাজিকীকরণ বলে।

সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিশুর জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন এক পর্যায় হতে আরেক পর্যায়ে প্রবেশ করে তখন তাকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে, নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়। এ খাপ খাওয়ানো প্রক্রিয়ার ফলে তার আচরণে পরিবর্তন আসে। নতুন নিয়মকানুন, রীতিনীতি এবং নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলার প্রক্রিয়ার নাম সামাজিকীকরণ।

সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস -এর মতে, "সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি পুরোপুরি সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়া ছাড়া ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব লাভে ব্যর্থ হয় এবং সমাজে সে একজন যোগ্য ও উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না।" অগবার্ন ও নিমকফ বলেন যে, "সামাজিকীকরণ ছাড়া সমাজে জীবনযাপন একেবারেই সম্ভব নয় এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশায় সামাজিক মূল্য বজায় রাখে।"

উপরিউক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় সামাজিকীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানবশিশু ক্রমশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়।

সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম

শিশুর সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে, যথা– শিশুর পিতামাতা বা পরিবার, খেলার সাথি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি ইত্যাদি। নিম্নে সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলো বর্ণনা করা হল।

পরিবার : সামাজিকীকরণের কতগুলো মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে পরিবারের ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে যে, শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বংশগতি মূল উপাদান জোগায়, সংস্কৃতি নকশা তৈরি করে এবং পরিবারে পিতামাতা কারিগর হিসেবে কাজ করে। কারণ শিশুর সমস্ত দৈহিক, মানসিক, বস্তুগত ও অবস্তুগত যাবতীয় প্রয়োজন মেটায় পরিবার। পরিবারেই শিশু তার চিন্তা, আবেগ ও কর্মের অভ্যাস গঠন করে। মূলত শিশুর চরিত্রের ভিত্তিপ্রস্তর রচিত হয় পরিবারেই। কীভাবে কথা বলতে হয়, নিজের আবেগ কিভাবে প্রকাশ করা হয় তা শিশু পরিবার হতেই শিক্ষালাভ করে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনযুদ্ধে সে যেন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে পারে তার জন্য পূর্ব হতেই পরিবার তাকে শিক্ষা প্রদান করে। পরিবার শিশুর অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। শিশুর চলাফেরা, কথাবার্তা, ভাষা শিক্ষা দেওয়া, আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়া, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দান করার দায়িত্ব একমাত্র পরিবারের। সমাজের একজন যোগ্য ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পরিবারের অবদান সবচেয়ে বেশি। সুতরাং শিশুর ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে তিনটি সম্পর্কের ওপর, যথা– (১) পিতা-মাতার মধ্যে সম্পর্ক (২) পিতা-মাতা ও শিশুর মধ্যে সম্পর্ক এবং (৩) পরিবারের শিশুদের মধ্যে সম্পর্কের ওপর।

পিতা-মাতার মধ্যে সম্পর্ক মধুর হলেই সে পরিবারের শিশুরা সুন্দর পারিবারিক পরিবেশে নিজেদের ব্যক্তিত্ব গঠন করতে সক্ষম হয়। অপরদিকে পিতামাতার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, মারামারি বা পারিবারিক অশান্তি বিরাজ করলে সে পরিবারের শিশুদের মধ্যে মনোদৈহিক সমস্যা দেখা দেয় এবং ঐসব শিশুরা নানা প্রকার অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়। পিতামাতা ও শিশুদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করলে পরবর্তীকালে ঐ শিশুরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে ওঠে এবং সমাজে সহজ জীবনযাপন করতে পারে।

পরিবারের শিশুদের মধ্যে কেমন সম্পর্ক বিরাজ করবে তার ওপর ভিত্তি করে সে পরিবারের শিশুদের ব্যক্তিত্ব গঠিত হবে। সুতরাং শিশুর সামাজিকীকরণের সংস্থা হিসেবে পরিবারের পক্ষে যা করা সম্ভব, অন্য কোনো সংস্থার পক্ষে তা অচিন্তনীয়।

খেলার সাথি : শিশুর সামাজিকীকরণে তার সঙ্গী বা খেলার সাথিরা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। শিশু তার খেলার সাথিদের সঙ্গে মেলামেশা করলে তার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলির পরিস্ফুটন হয়। সে স্বাবলম্বী হতে শেখে। অন্যদিকে কিশোর অপরাধী হওয়ার অন্যতম কারণ হল খেলার সাথি। গবেষণায় দেখা গেছে যেসব শিশু রেললাইন, রাস্তা, অলিগলি, বস্তিতে ঘুরে বেড়ায় ও খেলাধুলা করে তারা পরবর্তীকালে বিভিন্নরকম অপরাধমূলক কাজে বেশি লিপ্ত হয়। অর্থাৎ একটা শিশুকে অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত করার ব্যাপারে খেলার সাথি বা সঙ্গীসাথি খুব শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

ধর্ম : ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। যে ব্যক্তি যে ধর্মে বিশ্বাসী সে ব্যক্তি সে ধর্মের রীতিনীতি ও বিধানসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। শৈশবকাল হতে যে ব্যক্তি যে ধর্মে বিশ্বাসী সে ব্যক্তি সে ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা লালিত হয় এবং সে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তীকালে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে প্রতিফলিত হয়। ধর্ম মানুষের মনে সামাজিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে, সত্যবাদিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হতে শিক্ষা দেয়। ধর্ম মানুষকে মন্দপথ পরিহার করে সৎপথে চলার নির্দেশ দেয়, আচরণে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়। এক কথায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও পরিবারের মধ্য দিয়েই শিশুর যে সামাজিকীকরণ শুরু হয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সে প্রক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বজায় থাকে। সমাজের সভ্যরা যাতে সামাজিক মূল্য, সামাজিক আদর্শ, সামাজিক অভ্যাসগুলো আয়ত্ত করতে পারে তার জন্য প্রতিটি সমাজকে তার শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি সভ্যকে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করার জন্য শিক্ষা দান করতে হয়। সমাজ তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদেরকে সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। সমাজে বসবাস করতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কতকগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ববোধ ও সামাজিক চেতনা না থাকলে সে এ দায়িত্ব পালন করতে পারে না। শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তির মনে এ দায়িত্ববোধ ও সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানুষকে নানাভাবে শিক্ষাদান করে মানুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সার্থক করে তোলে। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আচার-অনুষ্ঠান, আইন-কানুন, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক-শিক্ষিকা শিশুর মনে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সামাজিকীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা : গণমাধ্যমসমূহ যেমন– সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র সামাজিকীকরণে গৌণ ভূমিকা পালন করে। কারণ, সামাজিকীকরণের বাহন হিসেবে পরিবার, খেলার সাথি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানত মৌলিক ভূমিকা পালন করে। নিচে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের ভূমিকা বর্ণনা করা হল।

সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন : সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, জার্নাল প্রভৃতি গণমাধ্যমে পরিবেশিত তথ্যসমূহ সমাজের মূল্যবোধ, প্রথা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচিত হয়। এছাড়া সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে এমন কতকগুলো শিক্ষামূলক তথ্য প্রচার করা হয় যার দ্বারা শিশু-কিশোর, এমনকি যেকোনো ব্যক্তির সামাজিকীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বেতার : বেতারযন্ত্র আজকাল সহজলভ্য হওয়ায় সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিনোদনের মুখ্য মাধ্যম হল বেতার। সে কারণে এ মাধ্যমটি নানা ধরনের বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

টেলিভিশন : দর্শন ও শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে একই সাথে তথ্য সংগৃহীত হওয়ায় অন্যান্য গণমাধ্যমের তুলনায় টেলিভিশনে পরিবেশিত তথ্য সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির অনুকূলে নানা ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে টেলিভিশন সামাজিকীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

চলচ্চিত্র : চলচ্চিত্র সামাজিকীকরণের বাহন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যদি তা শুধুমাত্র বিনোদনধর্মী না হয়ে আদর্শ ও বাস্তবধর্মী শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র হয়। এ ধরনের চলচ্চিত্র জনগণের ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনোভাব গঠনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

সামাজিকীকরণে গণমাধ্যমের যেমন ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে, তেমনি আছে এর নেতিবাচক ভূমিকা। বর্তমানে শহর এলাকা এমনকি মফস্বল এলাকাতেও ডিশ এন্টেনা, ভিসিপি, ভিসিআর, বিদেশি ম্যাগাজিন প্রভৃতির মাধ্যমে বিদেশি অপসংস্কৃতি এদেশের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে।

পরিবার

পরিবার হল সমাজের ক্ষুদ্রতম মানবগোষ্ঠী। গোষ্ঠীজীবনের প্রথম ধাপই হল পারিবারিক জীবন। প্রত্যেকটি মানুষ একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। এমন কোনো মানবসমাজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে পরিবার-প্রথা নেই। পরিবার হল একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন যেখানে পিতা-মাতা ও তাদের সন্তান-সন্ততি একত্রে বসবাস করে।

পরিবারের সংজ্ঞা : অধ্যাপক নিমকফ পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংঘ যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানাদি ছাড়া স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে।" সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, "পরিবার হল একটি গোষ্ঠী যা সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয়।"

পরিবার কিভাবে গঠিত হয় : বিবাহ হল পরিবার গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত। একজন পুরুষ সমাজস্বীকৃত উপায়ে এক জন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে একটি একক পরিবার গঠন করে। তবে আদিম সমাজে বিবাহ ব্যতিরেকেই পরিবার গঠিত হত। কিন্তু আমাদের সমাজে এটা সম্ভব নয়। এমন পরিবার অজানা নয় যেখানে পিতৃমাতৃহীন ভাই-বোন অথবা মা ও মেয়ে বা ছেলে অথবা বাবা তার অবিবাহিত ছেলে বা মেয়ে অথবা দাদা তার নাতি বা নাতনি নিয়ে পরিবার গঠন করছে। সুতরাং বলা যায় যে, বিবাহের মাধ্যমে অথবা বিবাহ না করেও পরিবার গঠন করা যায়।

পরিবারের প্রকারভেদ

পরিবার বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান হলেও সমাজ-ভেদে বা দেশ-ভেদে পরিবারের রূপ ভিন্নরকম হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। নিম্নে বর্ণনা করা হল। (১) স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) এক বিবাহ পরিবার (খ) বহুপত্নীক পরিবার (গ) বহুপতি পরিবার।

(ক) এক বিবাহ পরিবার : একজন পুরুষ একই সময়ে শুধুমাত্র একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে যে পরিবার গঠন করে তাকে এক বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। আধুনিক সভ্য সমাজে এ ধরনের পরিবার বেশি পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কর্তৃত্বের নয় বরং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দেখা যায়।

(খ) বহুপত্নীক পরিবার : একজন পুরুষের সঙ্গে একই সময়ে একাধিক স্ত্রীলোকের বিবাহের মাধ্যমে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে বহুপত্নীক পরিবার বলে। সাধারণত কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ মুসলিম সমাজে এ ধরনের বহুপত্নীক পরিবার দেখা যায়। আবার যেসব সমাজে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশি সেখানে বহুপত্নীক পরিবার বেশি দেখা যায়।

(গ) বহুপতি পরিবার : যখন একজন স্ত্রীলোকের একই সময়ে একাধিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হয়ে পরিবার গড়ে ওঠে তখন সে পরিবারকে বহুপতি পরিবার বলে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এ পরিবারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতের টোডা উপজাতিদের মধ্যে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়।

(২) পরিবারের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা কার ওপর ন্যস্ত তার ওপর ভিত্তি করে পরিবারকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-(ক) পিতৃপ্রধান পরিবার (খ) মাতৃপ্রধান পরিবার।

(ক) পিতৃপ্রধান পরিবার : পরিবারের কর্তৃত্ব যদি পিতা-স্বামী বা বয়স্ক কোনো পুরুষের হাতে থাকে তখন সে পরিবারকে পিতৃপ্রধান পরিবার বলে। পিতা এ পরিবারের সকল সম্পত্তির মালিক এবং তিনিই পরিবারের শাসনকর্তা । বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলিম পরিবার হল পিতৃপ্রধান পরিবার।

(খ) মাতৃপ্রধান পরিবার : যখন পরিবারের কর্তৃত্ব মাতা, স্ত্রী বা বয়স্কা কোনো মহিলার ওপর ন্যস্ত হয় তখন সে পরিবারকে মাতৃপ্রধান পরিবার বলে। এ পরিবারে নেতৃত্ব দেন মাতা বা বয়স্কা কোনো মহিলা। এ পরিবারে সম্পত্তির মালিকানা মেয়েদের হাতে ন্যস্ত। বাংলাদেশের গারো নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃপ্রধান পরিবার দেখা যায়।

(৩) বিবাহ-উত্তর বাসস্থানের ওপর ভিত্তি করে পরিবারকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা- (ক) পিতৃবাস পরিবার (খ) মাতৃবাস পরিবার (গ) নয়াবাস পরিবার।

(ক) পিতৃবাস পরিবার : বিবাহের পর স্বামী যদি নিজের পিতার গৃহে স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করে তাহলে তাকে পিতৃবাস পরিবার বলে। বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু সমাজের পরিবার হল পিতৃবাস।

(খ) মাতৃবাস পরিবার : বিবাহের পর স্বামী যদি স্ত্রীর মাতার গৃহে বসবাস করে তাহলে তাকে মাতৃবাস পরিবার বলে। বাংলাদেশে গারো সমাজে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়।

(গ) নয়াবাস পরিবার : নয়াবাস পরিবারের ক্ষেত্রে বিবাহিত নবদম্পতি তাদের পিতার বা মাতার গৃহে বাস না করে সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের (দম্পতি) বাড়িতে বসবাস করে তাকে নয়াবাস পরিবার বলা হয়। আমাদের দেশে শহরাঞ্চলে নয়াবাস পরিবার দেখা যায়।

(৪) বংশ গণনার ওপর ভিত্তি করে পরিবারকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা- (ক) পিতৃ-বংশানুক্রমিক পরিবার (খ) মাতৃ-বংশানুক্রমিক পরিবার।

(ক) পিতৃ-বংশানুক্রমিক পরিবার : পিতার বংশানুসারে বংশ গণনা করা হয় যে পরিবারে সে পরিবারকে পিতৃ-বংশানুক্রমিক পরিবার বলে। এ পরিবারে বংশনাম, বংশমর্যাদা, উপাধি এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রভৃতি পিতৃধারায় বর্তায়। বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান পরিবার হল পিতৃ-বংশানুক্রমিক পরিবার।

(খ) মাতৃ-বংশানুক্রমিক পরিবার : মাতার বংশানুসারে বংশগণনা করা হয় যে পরিবারে সে পরিবারকে মাতৃ-বংশানুক্রমিক পরিবার বলা হয়। এ পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বংশমর্যাদা, উত্তরাধিকার, উপাধি সবকিছুই মাতৃধারায় প্রবর্তিত হয়। বাংলাদেশের গারো সমাজে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়।

(৫) পরিবারের আকারের ভিত্তিতে পরিবারকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (ক) অণু পরিবার (খ) বর্ধিত পরিবার এবং (গ) যৌথ পরিবার।

(ক) অণু পরিবার : অণু পরিবার গঠিত হয় সাধারণত স্বামী-স্ত্রী এবং অবিবাহিত এক বা একাধিক সন্তান-সন্ততি নিয়ে। এ পরিবার দুইপুরুষে আবদ্ধ, এ দুইপুরুষ হল পিতা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি।

(খ) বর্ধিত পরিবার : বর্ধিত পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হয় স্বামী-স্ত্রী, অবিবাহিত ও বিবাহিত পুত্র কন্যা; পৌত্র ও পৌত্রীগণ। কমপক্ষে ৩ পুরুষের পরিবার হল বর্ধিত পরিবার। বাংলাদেশে গ্রামীণ কৃষি সমাজে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়।

(গ) যৌথ পরিবার : যৌথ পরিবার হল কয়েকটি একক পরিবারের সমষ্টি। যৌথ পরিবারে বিবাহিত পুত্র ও তার সন্তানাদিসহ পিতামাতার কর্তৃত্বাধীন এক সংসারে বাস করে। সবাইকে পরিবারের নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। এখানে কেউ ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব সবাই ভাগাভাগি করে নেয়।

পরিবারের কার্যাবলি

সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সর্বাধিক। সুতরাং সমাজজীবনের ওপর এর প্রভাবও বেশি। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে। যথা–

(১) জৈবিক কাজ : নরনারীর জৈবিক ও দৈহিক প্রয়োজন মেটানো পরিবারের অন্যতম প্রধান কাজ। বিয়ের মাধ্যমে পরিবার তার সদস্যদের জৈবিক চাহিদা পূরণ করে।

(২) সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালন করা : সন্তান উৎপাদনের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। জন্মের পর শিশুকে লালন-পালন করে একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পরিবারের।

(৩) সামাজিকীকরণ : শিশুর চরিত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় পরিবারেই। শিশুকাল হতে একটি শিশু সমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কানুন, অভ্যাস প্রভৃতি পরিবার হতে শিক্ষালাভ করে। পরিবারে সুন্দর পরিবেশ থাকা বাঞ্ছনীয়। পরিবারের সুন্দর পরিবেশ ছাড়া শিশুর সামাজিকীকরণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না।

(৪) **অর্থনৈতিক কাজ :** পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক চাহিদা তথা তাদের অন্যান্য চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব হল পরিবারের। এমন একসময় ছিল যখন পরিবারই ছিল যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু। তখন পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো গৃহেই উৎপাদিত হত। এজন্যই পরিবারকে উৎপাদনের একক বলা হত (Unit of Production)। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবারের অর্থনৈতিক কাজগুলো মিল, কারখানা, দোকান, বাজার, ব্যাংক এসব প্রতিষ্ঠানগুলো কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদন করছে। এখন পরিবারের সদস্যরা ঘরের বাইরে কাজ করে অর্থ উপার্জনের জন্য। এজন্য পরিবারকে বর্তমানে আয়ের একক (Unit of Income) বলা হয়।

(৫) **শিক্ষামূলক কাজ :** গৃহ শিশুদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিক্ষা কেন্দ্র। জন্মের পর শিশু গৃহেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। যদিও বর্তমানে শিক্ষা দেওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তবুও আচার-ব্যবহার, নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিকতা ও ধর্মীয় বিষয়গুলো শিশুরা গৃহেই শিক্ষালাভ করে।

(৬) **ধর্মীয় কাজ :** শিশুর নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা এক সময়ে পরিবারের ওপরই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ কাজটা গ্রহণ করেছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ। তবে একথা ঠিক সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে এবং নৈতিকতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা শিশু নিজ গৃহেই লাভ করে।

(৭) **নিরাপত্তামূলক কাজ :** সবরকম বিপদ-আপদ, অসুখবিসুখ হতে পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের। যদিও বর্তমানে পরিবারের নিরাপত্তামূলক কাজের মাত্রা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে তবুও পরিবার তার সদস্যদের শারীরিক ও নৈতিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে।

(৮) **বিনোদনমূলক কাজ :** এমন একসময় ছিল যখন গৃহই ছিল সব রকম আমোদ-প্রমোদ বা বিনোদনের কেন্দ্রস্থল। কিন্তু শিল্পসভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের কাজগুলোর জন্য সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান। তবুও পারিবারিক পরিমণ্ডলে সকল সদস্যের মিলেমিশে বনভোজন করা, কোনো দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যাওয়া, ঘরে বসে টিভি, ভিসিআর দেখা, কারও জন্মোৎসব করা প্রভৃতি কাজগুলো এখনো পরিবার সম্পাদন করে।

সাম্প্রতিককালে পরিবারের কার্যাবলির অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পরিবারের অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, ধর্মীয়, নিরাপত্তা ও বিনোদনমূলক কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রথা-প্রতিষ্ঠান। তবে সন্তান উৎপাদন, লালন-পালন করা বিশেষ করে শিশুর সামাজিকীকরণের মতো কাজে পরিবারের গুরুত্ব অসীম।

গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় (Group and Community)

সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষকে বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণ করতে হয়। এসব চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ নানা ধরনের গোষ্ঠী গড়ে তোলে। চাহিদার তারতম্যের জন্য সমাজে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী দেখা যায়।

গোষ্ঠীর সংজ্ঞা : বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ একাধিক ব্যক্তির সমষ্টিকে গোষ্ঠী বলা হয়। ম্যাকাইভার ও পেজ (MacIver & Page) বলেন, "গোষ্ঠী বলতে বোঝায় কোনো ব্যক্তির সমষ্টি যারা পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত"। সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট (Gisbert) এর মতে, "সামাজিক গোষ্ঠী হল ব্যক্তির সমষ্টি যারা একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে পরস্পরের ওপর কর্ম সম্পাদন করে।" উদাহরণ- কোনো রাজনৈতিক দল, ফুটবল ক্লাব, পরিবার ইত্যাদি।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কতকগুলো ব্যক্তির সমষ্টিকে সামাজিক গোষ্ঠী বলা চলে না। কারণ ঐ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে কোনো সামাজিক সম্পর্ক নেই এবং ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক চেতনাবোধ নেই। যখন সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক থাকে তখনই সামাজিক গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়।

গোষ্ঠীর ধরন বা প্রকারভেদ

বিভিন্ন আদর্শের ভিত্তিতে বা গোষ্ঠীর স্থায়িত্বের ভিত্তিতে সামাজিক গোষ্ঠীকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী কুলি (C.H. Cooley) সামাজিক গোষ্ঠীকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা– (১) মুখ্য গোষ্ঠী (Primary Group) এবং (২) গৌণ গোষ্ঠী (Secondary Group)।

মুখ্য গোষ্ঠী (Primary Group) : মুখ্য গোষ্ঠী বলতে সে গোষ্ঠীকে বোঝায় যে গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক থাকায় অনেকে এ গোষ্ঠীকে ব্যক্তিগত বা মুখোমুখি (Face- to-face) গোষ্ঠী বলে থাকেন। মুখোমুখি পরিচয়ই এ গোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। মুখ্য গোষ্ঠী আকারে অনেক ছোট। পরিবারের ছোট শিশুদের খেলার সাথি, পাড়া প্রতিবেশী দল ইত্যাদি হল মুখ্য গোষ্ঠীর উদাহরণ। কোনো স্বার্থের ভিত্তিতে নয় বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

গৌণ গোষ্ঠী (Secondary Group) : মুখ্য গোষ্ঠীর মধ্যে যে ধরনের অন্তরঙ্গতা থাকে, বড় বড় গোষ্ঠীতে সেরূপ অন্তরঙ্গতা দেখা যায় না। এরাই হল গৌণ গোষ্ঠী। এ গোষ্ঠী আকারে এত বড় যে গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। এদের সদস্যরা অধিকাংশই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের মধ্যে পরোক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। সাধারণত স্বার্থের ভিত্তিতে এ ধরনের গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। উদাহরণ শিক্ষক-সমিতি, সেনাদল, আনসার, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি।

সম্প্রদায় (Community)

সম্প্রদায় বলতে সাধারণত একই অঞ্চলে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীকে বোঝায়, যাদের মধ্যে ভাষাগত, ধর্মীয়, আচারগত এবং অন্যান্য ব্যাপারে কতগুলো সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ম্যাকাইভার ও পেজ (MacIver and page) -এর মতে, "যখন কোনো ছোট বা বড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা এমনভাবে বসবাস করে যে তারা কোনো বিশেষ স্বার্থের অংশীদার না হয়ে সাধারণ জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে অংশগ্রহণ করে, তখন সেই গোষ্ঠীকে সম্প্রদায় বলা হয়।" যেমন– চাকমা সম্প্রদায়, গারো সম্প্রদায়, গ্রামীণ সম্প্রদায় ইত্যাদি।
ম্যাকাইভারের মতে সম্প্রদায়ের ২টি ভিত্তি রয়েছে, যথা– (ক) অঞ্চল (খ) স্বজাত্যবোধ।

অঞ্চল : যেকোনো সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে এবং যে অঞ্চলে তারা বসবাস করে সে অঞ্চল হতে তাদের প্রয়োজনগুলো মেটায়।

স্বজাত্যবোধ : স্বজাত্যবোধ না হলে সম্প্রদায় হতে পারে না। স্বজাত্যবোধ হল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা।

সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য : সম্প্রদায়ের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়–
(ক) সম্প্রদায় হল একই এলাকায় বা অঞ্চলে বসবাসকারী মনুষ্যগোষ্ঠী। (খ) একই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ভাষাগত, রীতিগত, ধর্মীয় এবং অন্যান্য ব্যাপারে কতকগুলো মিল খুঁজে পাওয়া যায়। (গ) সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে স্বজাত্যবোধ খুবই বেশি। (ঘ) সম্প্রদায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে এর সদস্যরা সম্প্রদায়ের মধ্যেই সবধরনের সামাজিক সম্পর্ক খুঁজে পায় এবং এর মধ্যেই তারা তাদের সব প্রয়োজন মেটায়।

প্রতিষ্ঠান (Institution)

সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ সংঘ গঠন করে। এসব সংঘের মধ্যে কতকগুলো স্থায়ী এবং কতকগুলো অস্থায়ী। পরিবার, রাষ্ট্র, মসজিদ, মন্দির হল স্থায়ী সংঘ। স্থায়ী সংঘগুলো তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কতকগুলো কর্মপদ্ধতি, বিধিবিধান, নিয়মনীতির ওপর নির্ভর করে। এসব কর্মপদ্ধতি, বিধিবিধান, নিয়মনীতি স্থায়ীরূপ লাভ করলে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

জিসবার্ট (Gisbert) "প্রতিষ্ঠান" বলতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য কতগুলো স্থায়ী ও স্বীকৃত কর্মপদ্ধতিকে বুঝিয়েছেন। ম্যাকাইভার ও পেজ-এর মতে, "প্রতিষ্ঠান হল সেই সব প্রচলিত কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়"। এ অর্থে বিবাহ, সম্পত্তি, ধর্মশিক্ষা ইত্যাদি হল প্রতিষ্ঠান।

বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান ও তাদের ভূমিকা

সমাজজীবনের প্রয়োজনের দিক থেকে প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা–

(ক) **সামাজিক প্রতিষ্ঠান :** সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবার সবচেয়ে আদিম এবং গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের প্রধান কাজ হল বংশধারা অক্ষুণ্ন রাখা এবং মানুষের জৈবিক প্রয়োজন মেটানো। শিশু লালন-পালন করা এবং বৃহত্তর জীবনের জন্য শিশুকে গড়ে তোলার দায়িত্ব পরিবারের। এছাড়া পরিবার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রধান বাহন হিসেবে কাজ করে। পরিবারের সদস্যদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সামাজিক সংহতি রক্ষার্থে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিবাহ আরো একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহের মাধ্যমেই মানুষ পরিবার গঠন করে। সমাজস্বীকৃত উপায়ে মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হল বিবাহ। সমাজে যদি বিবাহপ্রথা গড়ে না উঠত তবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকত না এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

(খ) **শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান :** শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হল ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত বুদ্ধিগত ক্ষমতাগুলোকে বিকশিত করে তার ব্যক্তিত্বকে সুগঠিত করা এবং ব্যক্তিকে চরিত্রবান করে গড়ে তোলা। শিশুর সামাজিকীকরণের দায়িত্ব শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের। স্কুল, কলেজ ইত্যাদি হল শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

(গ) **অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান :** অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ তাদের যাবতীয় বস্তুগত অভাব ও চাহিদা পূরণ করে থাকে। উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন-ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ তাদের অর্থনৈতিক চাহিদা মেটায়। ব্যাংক, বীমা, ঋণদান সংস্থা ইত্যাদি হল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

(ঘ) **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান :** ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্ম হল কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস। ধর্মের অভ্যন্তরীণ দিক হল ব্যক্তির বিশ্বাস ও ধারণা এবং বাহ্যিক দিক হল কতগুলো আচার-অনুষ্ঠান যেমন– উপাসনা করার পদ্ধতি যার মাধ্যমে ব্যক্তির ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ পায়। ধর্ম মানুষকে খারাপ কাজ হতে বিরত থাকতে এবং ভালো কাজ করার জন্য প্রণোদিত করে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ঙ) **আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত প্রথা-প্রতিষ্ঠান :** আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত প্রথা-প্রতিষ্ঠান সমাজের সদস্যদের বিভিন্নভাবে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে ব্যক্তির মনের চাহিদা পূরণ করে। সংগীত সংঘ, থিয়েটার, সিনেমা হল ইত্যাদি এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

(চ) **রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান :** রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, দেশে শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সমাজের সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে দুর্নীতি, অনাচার ও সামাজিক সমস্যাবলি মোকাবেলা করা হয়। উন্নয়নমূলক কার্যাবলির মাধ্যমে জনগণের নানাবিধ সমস্যা দূর করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। রাজনৈতিক দল, পুলিশ বাহিনী, আমলাতন্ত্র হল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

পূর্বপৃষ্ঠার আলোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজকে সুশৃঙ্খল রাখতে তথা সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক উন্নয়নে এবং সমাজ গঠনে সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ধর্ম (Religion)

ধর্ম একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। আদিম যুগ হতে আরম্ভ করে বর্তমান আধুনিক সভ্য সমাজেও ধর্মের অস্তিত্ব দেখা যায়। বিভিন্ন সমাজে ধর্মের বিভিন্নতা দেখা যায়। আবার বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সমাজে ধর্মের বিভিন্ন ধরন দেখা যায়। যেমন– কোনো সমাজে ভূতপ্রেতকে কেন্দ্র করে ধর্ম গড়ে ওঠে, কোনো সমাজে মানুষ গাছপালা, লতাপাতা, পশুপাখিকে পূজা করে, কোনো সমাজে এক ঈশ্বর/সৃষ্টিকর্তাকে আরাধনা করে।

ধর্মের সংজ্ঞা : নৃবিজ্ঞানী টেইলর (Tylor)-এর মতে, "ধর্ম হল আত্মিক জীবে বিশ্বাস" (belief in spiritual beings)। ডুর্খেইম (Durkheim) বলেন যে, "ধর্ম হল পবিত্র জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানাদি।" মনীষী ফেজার (Fazar) -এর মতে, "ধর্ম হল মানুষের চেয়ে উচ্চতর এমন একটি শক্তিতে বিশ্বাস যা মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে।" তার মতে, ধর্মের মূল উপাদান ২টি যথা– (ক) মানুষের চেয়ে উচ্চতর শক্তিতে বিশ্বাস এবং (খ) সে শক্তির আরাধনা।

ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে মতবাদগুলোকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা– (১) টেইলরের সর্বপ্রাণবাদ মতবাদ (২) মেরেটের মহাপ্রাণবাদ মতবাদ।

১। টেইলরের মতবাদ : টেইলর বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে, আদিম মানুষ প্রথমে আত্মা, প্রেতাত্মা ও নিজ নিজ মৃত পূর্বপুরুষের পূজা করত। পরে তাদের মধ্যে প্রকৃতিপূজার উন্মেষ ঘটে। ফলে তারা নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, চাঁদ-তারা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা শুরু করে। প্রকৃতিপূজা থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় দেবদেবীর মূর্তি পূজার উদ্ভব হয়। এ পর্যায়ে আদিম মানুষ ছিল বহু-ঈশ্বরবাদী। কালক্রমে তাদের মধ্যে পরমেশ্বরের ধারণার সৃষ্টি হয় এবং সমাজে একেশ্বরবাদের উদ্ভব হয়।

টেইলরের মতে, ভূতপ্রেত ও মৃত পূর্বপুরুষ পূজার উদ্ভব ঘটে আত্মার ধারণা থেকে। বস্তুত টেইলরের মতবাদের মূল ভিত্তি হল আত্মা। আদিম মানুষ মনে করত দেহ ও আত্মা নিয়ে মানবজীবন। দেহ জড়পদার্থ কিন্তু আত্মা অমর ও সচল। এরা অতি-প্রাকৃত বলেই রহস্যময়, বিস্ময়কর। এরা বস্তু, সময় ও স্থানকে অতিক্রম করে চলতে পারে। এখন প্রশ্ন হল আদিম মানুষ আত্মার ধারণাকে কিভাবে পেল ? আদিম মানুষ আত্মার ধারণা পেয়েছে স্বপ্নের মধ্যদিয়ে। ঘুমের মধ্যে মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে সে বহু দূরে বেড়াতে যায়, পাহাড় -পর্বতে চড়ে, শিকার করে। কিন্তু ঘুম ভাঙার পর সে দেখে তার দেহ সেখানেই আছে। তারা মনে করত যে, মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে আত্মা ভ্রমণে বের হয়। দেহ থেকে আত্মার সাময়িক অনুপস্থিতি হল ঘুম। আর স্থায়ী বিচ্ছেদ হল মৃত্যু। মৃত্যুর পর দেহ পচে যায়, নষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা বিনষ্ট হয় না। আত্মা আশেপাশে বসবাস করে এবং মাঝেমধ্যে জীবন্ত লোকের ওপর ভর করে তাতে তার মঙ্গল-অমঙ্গল ঘটে। তাই প্রেতাত্মাকে সর্বদা খুশি করার জন্য আদিম মানুষ মৃত পূর্বপুরুষের আত্মাকে পূজা দিত।

পূর্বপুরুষ-পূজার স্তর পার হয়ে আদিম মানুষ প্রকৃতিপূজা অর্থাৎ গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতিকে আরাধনা করতে শুরু করে। এসময় সমাজে বহু ঈশ্বরবাদের অস্তিত্ব দেখা দেয়। এরপর ক্রমে ক্রমে বিবর্তনের মাধ্যমে একেশ্বরবাদের উৎপত্তি হয়।

২। মেরেটের মহাপ্রাণবাদ তত্ত্ব ঃ

আদিম মানুষ এত বুদ্ধিমান ছিল না যে তারা আত্মার ধারণা লাভ করতে পারে। তাই মেরেট মনে করেন যে, আদিম মানুষ আত্মা-প্রেতাত্মার ধারণা লাভের আগেই বিশেষ এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ধারণা অর্জন করেছিল। এ তত্ত্বের মূলকথা হল সর্বপ্রাণবাদে পৌঁছার পূর্বে আদিম মানুষের মনে 'মনা' বা নৈর্ব্যক্তিক প্রাকৃত শক্তির ধারণা জন্মে। এ তত্ত্বের নাম মহাপ্রাণবাদ।

এখন প্রশ্ন হল 'মনা' শক্তি কী ? 'মনা' বলতে বোঝায় এক অস্বাভাবিক অতিপ্রাকৃতিক শক্তি। 'মনা' বলতে কোনো ভূত, প্রেত, আত্মা, প্রেতাত্মাকে বোঝায় না, এটা একটি নৈর্ব্যক্তিক অতিপ্রাকৃতিক শক্তি যা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুতে অস্বাভাবিক গুণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ 'মনা' শক্তি যার মধ্যে বিরাজ করে সে অসাধারণ ও অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। আদিম মানুষ এই মনা-শক্তির উপস্থিতি অনুধাবন করে এবং সেগুলোকে ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে থাকে। আর এভাবেই আদিম সমাজে ধর্মের উৎপত্তি লাভ করে।

সমাজ গঠনে ধর্মের ভূমিকা

ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও সমাজজীবনে ধর্মের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এজন্য বলা হয় ধর্ম যতখানি না ব্যক্তিগত ব্যাপার তার তুলনায় অনেক বেশি সামাজিক। সমাজজীবনে ধর্ম নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। বিভিন্ন পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ওপর ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক মেলামেশার কেন্দ্র। সামাজিক মেলামেশার ফলে ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও প্রীতির সঞ্চার হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং জনকল্যাণমূলক কর্ম সম্পাদন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে। এছাড়া সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার জন্য ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্ম ব্যক্তির মনে সামাজিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে, ধর্ম ব্যক্তিকে সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে শিক্ষা দেয়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সামাজিক জীবনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং সমাজ গঠনে তথা সমাজজীবনে সংহতি রক্ষা করতে ধর্ম একটি নিয়ামক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সামাজিকীকরণে মুখ্য ভূমিকা কোন মাধ্যম পালন করে ?

ক. চলচ্চিত্র খ. পরিবার

গ. খেলার সাথি ঘ. বিদ্যালয়

২। মাতৃতান্ত্রিক পরিবার দেখা যায়–

ক. গারো সমাজে খ. হিন্দু সমাজে

গ. বৌদ্ধ সমাজে ঘ. চাকমা সমাজে

৩। সামাজিকীকরণ বলতে বুঝায়–

ক. সমাজে বসবাস করার অধিকার আদায়ের পদ্ধতি

খ. পরিবারে বসবাস করার রীতিনীতি আয়ত্ত করার শিক্ষা

গ. নতুন রীতিনীতি ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার প্রক্রিয়া

ঘ. বিদ্যালয়ের রীতিনীতি ও নিয়মকানুন আয়ত্ত করার শিক্ষা

৪। শিশু তার খেলার সাথিদের সাথে মেলামেশা করলে –

i. নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলি অর্জন করে

ii. স্বাবলম্বী হতে শেখে

iii. মুক্তবুদ্ধি-সম্পন্ন হয়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

হান্নান সাহেব কমরপুর গ্রামের বাসিন্দা। তার গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার লোকের বাস। তার এলাকায় দুই-এক ঘর হিন্দু পরিবার ছাড়া বাকি অধিবাসীরা একই ভাষাভাষি ও ধর্মাবলম্বী। উক্ত গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে।

৫। কমরপুর গ্রামটি একটি গ্রামীণ সমাজের উদাহরণ। কারণ–

i. বাসিন্দারা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে।
ii. বাসিন্দাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যবোধ রয়েছে।
iii. বাসিন্দাদের মধ্যে কিছু ভিন্ন ধর্মের লোক রয়েছে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৬। নিচের কোন উপাদানটি সম্প্রদায় গঠনের জন্য অপরিহার্য ?

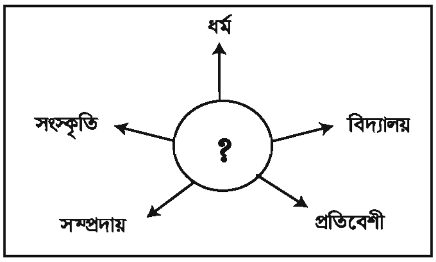
ক. সামাজিক রীতিনীতি খ. স্বজাত্যবোধ
গ. ধর্ম ঘ. ভাষা

৭। ধর্ম একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, কারণ–

i. ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের একটি কর্মপদ্ধতি
ii. ব্যক্তির সুপ্ত বুদ্ধিগত ক্ষমতাকে বিকশিত করে।
iii. মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii



৮। উপরের চার্টে "?" নির্দেশিত স্থানে যথার্থ শব্দটি হবে–

ক. রাষ্ট্রীয়করণ খ. জাতীয়করণ
গ. সামাজিকীকরণ ঘ. আন্তর্জাতিকীকরণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া দ্বারা মানবশিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। শিশুর এ সামাজিকীকরণে পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ পরিবারেই তার চরিত্রের ভিত্তিপ্রস্তর রচিত হয়। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ, বিভিন্ন পরিবেশে এবং পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে পারিবারিক শিক্ষা ছাড়াও আরো কতগুলো মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে শিশুর সামাজিকীকরণে গণমাধ্যম বিশেষ করে টেলিভিশনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

ক. সামাজিকীকরণ কী?
খ. শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবার কেন গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম?
গ. সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম তোমার শৈশবকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে?
ঘ. শিশুর সামাজিকীকরণে টেলিভিশনে প্রচারিত শিশুতোষ অনুষ্ঠানমালার প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজ কাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাস

সমাজ কাঠামো

সর্ব প্রথম হারবার্ট স্পেনসার জীবদেহের কাঠামোর সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজতে "সমাজ কাঠামো" প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। এটা একটি বিমূর্ত ধারণা। একে চোখে দেখা যায় না বা স্পর্শ করা যায় না। তবে সমাজের নিজস্ব কাঠামো বা গড়ন রয়েছে।

সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা

সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তবে তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী রেডক্লিফ ব্রাউন (Redcliffe Brown) বলেন, "সমাজ কাঠামো হল সমাজস্থ মানুষের সাথে মানুষের সব ধরনের সামাজিক সম্পর্ক।" এখানে তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। নৃবিজ্ঞানী নেডেল (Nadel) সমাজের মানুষের সামাজিক ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, "সমাজ কাঠামো হল একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টির বিভিন্ন সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটা রূপ বিশেষ, যা তাদের ভূমিকার মধ্যদিয়ে প্রতিফলিত হয়।" মার্ক্স (Marx)-এর মতে, উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সমাজ কাঠামো।

মরিস জিন্সবার্গ সমাজ কাঠামোর একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, "প্রধান প্রধান সামাজিক গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় হল সমাজ কাঠামো।" তিনি এ সংজ্ঞায় সমাজস্থ ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল এসব গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানগুলো কী কী ? সমাজবিজ্ঞানী বটোমোর (Bottomore) বলেন যে, এসব গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের যৌগিক সমন্বয়ে সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠে এবং এগুলোকে চিহ্নিত করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি সমাজের কতকগুলো ক্রিয়াশীল পূর্বশর্তের কথা উল্লেখ করেন এবং মনে করেন যে, এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভূমিকার যৌগিক সমন্বয়েই সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠে। এ গুলো হল–

১. ভাবের আদান-প্রদান।
২. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা উৎপাদন ও বণ্টন-প্রক্রিয়া।
৩. পারিবারিক শিক্ষাসহ সমগ্র সামাজিকীকরণ।
৪. কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বণ্টন।
৫. সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি যা বয়ঃসন্ধিক্ষণ, বিবাহ, মৃত্যু ইত্যাদিকে ঘিরে গড়ে ওঠে।

সমাজ কাঠামোর উপাদান

একটা চেয়ার, বা একটা বিল্ডিং যেমন কতকগুলো উপাদান দ্বারা তৈরি, তেমনি সমাজ কাঠামোরও কতকগুলো উপাদান আছে। একটা বিল্ডিং তৈরি করতে কতকগুলো উপাদান, যেমন– ইট, বালি, সিমেন্ট, কাঠ, রড প্রভৃতির প্রয়োজন, তেমনি সমাজ কাঠামো কতকগুলো উপাদানের সৃষ্টি। এখন প্রশ্ন হল সমাজ কাঠামো কী কী উপাদান দ্বারা গঠিত ? সমাজ কাঠামোর উপাদানগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল।

প্রথমত, সমাজবদ্ধ মানুষ ছাড়া কোনো সমাজের কথা কল্পনাই করা যায় না। প্রত্যেক মানুষ সমাজে বাস করতে গিয়ে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং সমাজস্থ মানুষ ও তাদের ভূমিকাকে সমাজ কাঠামোর উপাদান হিসেবে গণ্য করা যায়। আর এজন্যই নেডেল সমাজের মানুষদের ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা প্রদান করেন।

দ্বিতীয়ত, সমাজে বসবাস করতে গিয়ে, মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য, মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানা রকম স্থায়ী ও অস্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। এসব গোষ্ঠীর সৃষ্টি না হলে সমাজের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত। সুতরাং নানা ধরনের স্থায়ী ও অস্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠী সমাজ কাঠামোর অন্যতম উপাদান।

তৃতীয়ত, সমাজের মানুষের প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রথা-প্রতিষ্ঠান (institution) গড়ে উঠছে। এসব প্রথা-প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকর্মের ওপরই সমাজ টিকে আছে। কারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যদিয়েই মানুষের ভূমিকা প্রতিফলিত হয়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, সমাজ গঠিত হয় সমাজের মানুষদের নিয়ে। তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে বিভিন্ন রকম ভূমিকা পালন করে। সামাজিক পরিচিতি ও ভূমিকার ভিত্তিতেই বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তাই এসব সামাজিক গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়েই সামাজিক কাঠামো সৃষ্টি হয়।

সামাজিক স্তরবিন্যাস

পৃথিবীতে এমন কোনো সমাজের অস্তিত্ব নেই যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য বা বৈষম্য নেই। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। কেউ অর্থের দিক হতে, কেউ শিক্ষার দিক হতে, আবার কেউ কেউ ক্ষমতার দিক থেকে। অর্থের দিক হতে মানুষকে সাধারণত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা– (১) ধনী, (২) মধ্যবিত্ত এবং (৩) দরিদ্র। শিক্ষার দিক থেকে সমাজে ২টি শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যথা– শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত। ক্ষমতার ভিত্তিতে সমাজের মানুষ ২ ভাগে বিভক্ত, যথা– (১) শাসক (২) শাসিত। এভাবে প্রত্যেক সমাজের মানুষ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। কোনো সমাজই পুরোপুরি সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই সরোকিন (Sorokin) বলেন, "পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না যা পুরোপুরি সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"

সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা

সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে সাধারণত সমাজের মানুষকে উঁচু-নীচু পর্যায়ে বিভক্ত করা বোঝায়। সরোকিন (Sorokin)-এর মতে, "সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে জনসংখ্যাকে পর্যায়ক্রমে বিভক্তিকরণ বোঝায়।" এর অর্থ হল সমাজের এক প্রান্তে উচ্চ শ্রেণী এবং অন্য প্রান্তে নিম্ন শ্রেণী অবস্থিত। চিনয় (Chinoy) বলেন যে, প্রতিটি সমাজে কিছু কিছু লোক উৎকৃষ্ট আবার কিছু কিছু লোক নিকৃষ্ট। কেউ শাসন করে, কেউ শাসিত হয়। এভাবে সমাজের মানুষকে উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিত ইত্যাদি পর্যায়ে ভাগ করাকেই সামাজিক স্তরবিন্যাস বলা হয়।

ম্যাকাইভার ও পেজ (MacIver and Page) বলেন, সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে (১) মর্যাদাভিত্তিক স্তরবিভাগ বোঝায় এবং (২) উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্টের ভিত্তিতে স্তরবিভাগ নির্দেশ করে। তাঁদের মতে মর্যাদার ভিত্তি হল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। আর এই মর্যাদাবোধই একটি স্তরকে অন্য স্তর থেকে পৃথক করে।

উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, সামাজিক স্তরবিন্যাস হল সমাজের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অসম অবস্থান। এ অবস্থানের এক পাশে উচ্চ শ্রেণী এবং অন্য পাশে নিম্ন শ্রেণী রয়েছে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক স্তরবিন্যাসের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এগুলো নিম্নরূপ :

(ক) এর প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এটা এক ধরনের সামাজিক অবস্থা। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে অসমতা দেখা যায় তা সমাজেরই সৃষ্টি। এর কোনো জৈব তাৎপর্য নেই। কারণ জৈব গুণাগুণের ভিত্তিতে কোনো সামাজিক স্তরবিন্যাস হয় না।

(খ) সামাজিক স্তরবিন্যাস একটি সুপ্রাচীন ব্যবস্থা। অতীতে এমন কোনো সমাজ ছিল না যেখানে কোনো না কোনো ভাবে স্তরবিন্যাস ছিল না। আদিম সমাজে মানুষ যখন দলবদ্ধ হয়ে জঙ্গলে ফলমূল আহরণ ও পশুপাখি শিকার করত, তখনো তারা উঁচু-নীচু স্তরে বিভক্ত ছিল।

(গ) সর্বব্যাপিতা (Ubiquity) সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন সমাজে, আধুনিক সমাজে, কৃষি সমাজে, পুঁজিবাদী সমাজে এমনকি সমাজতান্ত্রিক সমাজেও এর অস্তিত্ব দেখা যায়। অর্থাৎ এমন কোনো সমাজ ব্যবস্থা নেই যেখানে সামাজিক স্তরবিন্যাস দেখা যায় না।

(ঘ) স্তরবিন্যাসের সামাজিক ফলাফল দুইদিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে যথা- (১) জীবনে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা (life-chances) এবং (২) জীবন যাপনের রীতি (life styles)। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাওয়া,

পরা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কে কতটুকু সুযোগ-সুবিধে পাবে এটা প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্তরবিন্যাসের দ্বারা নির্ণীত হয়। উপরের স্তরের লোকদের জীবনযাপনের রীতি নিম্ন স্তরের লোকদের চেয়ে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট বা দামি। তাই নিম্ন শ্রেণীর লোকের তুলনায় উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ বেশি পায়।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রধানত ৪টি প্রকরণ দেখা যায় যথা— (১) দাস প্রথা, (২) এস্টেট প্রথা, (৩) সামাজিক শ্রেণী এবং (৪) বর্ণপ্রথা। নিম্নে সংক্ষেপে স্তরবিন্যাসের ৪টি প্রকরণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হল :

দাস প্রথা (Slavery)

দাস প্রথা সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি প্রকরণ। দাস হল এমন এক ব্যক্তি যাকে সমাজের আইন ও প্রথা দ্বারা অন্যের সম্পত্তি বলে বিবেচনা করা হয়। দাস প্রথার ৪টি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যথা— (১) দাসের একমাত্র পরিচয় হল যে, সে তার প্রভুর সম্পত্তি। প্রভু খেয়াল খুশিমতো দাসকে ব্যবহার করতে পারতেন। (২) সামাজিক ক্ষেত্রে দাসরা ছিল ঘৃণার পাত্র। (৩) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দাসরা ছিল দর্শক এবং (৪) দাসদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে পরিশ্রম করতে হত। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল।

এস্টেট প্রথা (Estate)

এস্টেট প্রথা বলতে কখনো ভূসম্পত্তি, কখনো সামাজিক শ্রেণী আবার কখনও অধিকার-কর্তব্যকে বোঝায়। মধ্যযুগে ইউরোপে এস্টেট প্রথার ৩টি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, সমাজের লোকেরা ৩টি এস্টেট বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীতে ছিল যাজক সম্প্রদায়ের লোকেরা। তাদেরকে প্রথম এস্টেট বলা হত। দ্বিতীয় এস্টেটের লোক ছিল অভিজাত শ্রেণী। সাধারণ লোকদের বলা হত তৃতীয় এস্টেট। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেকের পদমর্যাদা আইনের দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা ছিল। আইনের চোখে সবাই সমান, এ নীতির প্রচলন ছিল না। তৃতীয়ত, প্রথম ও দ্বিতীয় এস্টেটের লোকরাই সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত।

সামাজিক শ্রেণী (Social Class)

ম্যাকাইভার ও পেজ-এর মতে, “সামাজিক শ্রেণী হল সম্প্রদায়ের একটি অংশ যা অপর অংশ হতে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে পৃথক।” সাধারণত তিন দিক হতে সমাজের মানুষকে ৩টি ভাগ করা যায়। যথা– (১) অর্থনৈতিক দিক হতে, (২) ক্ষমতার দিক হতে এবং (৩) মর্যাদার দিক হতে। অর্থ, ক্ষমতা ও মর্যাদা অনুযায়ী সমাজের মানুষকে ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা– (১) উচ্চ শ্রেণী, (২) মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং (৩) নিম্ন শ্রেণী। আয়, জীবনযাত্রা প্রণালি, সম্মান, প্রতিপত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণী হতে পৃথক।

বর্ণ প্রথা (Caste system)

ডি, এন মজুমদার এবং টি এন, মদন (D. N. Mazumdar and T. N. Madan) বলেন যে, বর্ণপ্রথা হল একটি বন্ধ গোষ্ঠী। যখনই কোনো শ্রেণীকে উত্তরাধিকার-সূত্রে বিচার করা হয় তখনই তাকে বর্ণপ্রথা বলে অভিহিত করা হয়। বর্ণপ্রথায় সদস্যপদ জন্মসূত্রে নির্ধারিত এবং সামাজিক মর্যাদাও পূর্বনির্ধারিত। তাছাড়া এ প্রথায় এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। বর্ণপ্রথা হিন্দু সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বর্ণপ্রথা অনুসারে হিন্দুদেরকে প্রধানত ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা– (১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয়, (৩) বৈশ্য এবং (৪) শূদ্র।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের কারণ

পৃথিবীর সব সমাজেই কম বেশি স্তরবিভাগ দেখা যায়। অতীতেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে। আদিম সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। আদিম সমাজে গোত্রপ্রধান বা দলপতি গোত্রের অন্যান্য সদস্য অপেক্ষা অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। সেখানে স্ত্রী-পুরুষভেদে সামাজিক অসমতা দেখা দিত। আদিম সমাজে শ্রেণীবৈষম্য ছিল একথা মার্ক্সবাদীরা স্বীকার করেন না। তাদের মতে, আদিম সমাজ ছিল সাম্যবাদী সমাজ। আদিম সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না বলে সেখানে শ্রেণীবিন্যাসের উদ্ভব হয়নি। কিন্তু যখন থেকে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার সৃষ্টি হয় তখন থেকেই শ্রেণী বৈষম্যেরসৃষ্টি হয়। মার্ক্সীয় তত্ত্বে, এটাই ছিল স্তরবিন্যাসের অন্যতম কারণ। দ্বিতীয়ত, জাতি (Racial) বা বর্ণপ্রথাগত পার্থক্যের জন্য সমাজে শ্রেণীবিন্যাসের উদ্ভব হয়। যেমন, হিন্দু সমাজে এ ধরনের স্তরবিন্যাস দেখা যায়। হিন্দুরা সমাজে নিজেদেরকে প্রধানত ৪টি প্রধান বর্ণে বিভক্ত করেছে, যথা– (১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয়, (৩) বৈশ্য এবং (৪) শূদ্র। তৃতীয়ত, কৃষিভিত্তিক সমাজে ভূমি মালিকানার ওপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাস গড়ে ওঠে। চতুর্থত, সমাজে শ্রেণীবিন্যাসের আরেকটি কারণ হল অর্থনৈতিক। উৎপাদনের উপাদান যারা নিয়ন্ত্রণ করে, তারা সমাজে অন্যান্যদের ওপর কর্তৃত্ব করে। এর ফলে সমাজে স্তরবিন্যাস দেখা দেয়।

সামাজিক বৈষম্য ও গ্রাম শহরে ব্যবধান

বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাসের গ্রামীণ ও শহরের জীবনে ভিন্নতর প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসের যেসব উপাদান বিশেষ ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে জমিই প্রধান। ভূ- সম্পত্তির পরিমাণ ও মালিকানার ভিত্তিতে গ্রামীণ সমাজে নিম্নলিখিত শ্রেণী দেখা যায়, যথা– (১) ভূমিহীন কৃষক : (ক) যাদের বসতবাড়ি ও কৃষিজমি কিছুই নেই, (খ) যাদের বসতবাড়ি আছে, কিন্তু কৃষিজমি নেই। (২) প্রান্তিক কৃষক : যাদের জমির পরিমাণ ১ একরের নিচে। (৩) ছোট কৃষক : যাদের জমির পরিমাণ ১ থেকে ৩ একরের নিচে। (৪) মধ্যম কৃষক : এদের জমির পরিমাণ ৩ থেকে ৭ একরের মধ্যে। এরা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল এবং নিজেদের অবস্থা উন্নত করার সুযোগ এদের রয়েছে। (৫) ধনী কৃষক : এদের জমির পরিমাণ ৭ একর থেকে তার উর্ধ্বে। এরা সরাসরি কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত নয়। ব্যবসা বাণিজ্য, গ্রামীণ রাজনীতি এরাই নিয়ন্ত্রণ করে। এদের অনেকেই শহরে বসবাস করছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের শহর-সমাজে স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা বা সম্পদ, ক্ষমতা ও শিক্ষা প্রভৃতি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব উপাদানের ভিত্তিতে শহর-সমাজ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা–

(১) উচ্চবিত্ত : এরা নাগরিক ধনিক গোষ্ঠী। এদের মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের কলকারখানার মালিক, শিল্পপতি, পণ্য বিপণন ও সেবামূলক খাতের ব্যবসায়ী, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধি, আমদানি রপ্তানিকারক প্রভৃতি।

(২) উচ্চ মধ্যবিত্ত : মাঝারি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ছাড়াও বিভিন্ন দক্ষ পেশাজীবী এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৩) মধ্যবিত্ত : এরা হল সীমিত আয়ের মানুষ, যেমন, ছোট চাকুরে, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, উৎপাদক ইত্যাদি।

(৪) নিম্ন মধ্যবিত্ত : এরা নিম্ন ধাপের চাকুরে, ছোট পুঁজির ব্যবসায়ী। দৈহিক শ্রম দিয়ে আয়ের বদলে এরা কিছুটা দক্ষ শ্রম দ্বারা অর্থোপার্জনে সক্রিয় থাকে।

(৫) নিম্নবিত্ত : নিম্নবিত্ত বলতে বোঝায় শহরের দরিদ্র মানুষদের। সংখ্যায় এরাই সবচেয়ে বেশি। অনেক ক্ষেত্রে এদের স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা নেই। স্থায়ী আবাসও নেই। এদের একাংশকে তাই ভাসমান মানুষ বলে। এরা দিনমজুরি করে, রিকশা চালায়, ঠেলাগাড়ি টানে, ইট ভাঙে ও এমনি আরো নানা ধরনের প্রচলিত-অপ্রচলিত শ্রমের কাজ করে।

বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য এত প্রকট যে, গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি রাজধানী শহরে এসে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। গ্রামের সম্পদ অনেকাংশে সীমিত। তাই সেখানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান এতো বেশি নয়। কিন্তু শহরে ধনসম্পদ অর্জনের সুযোগ অনেক বেশি। তাই শহরে একেবারে দরিদ্র বিত্তহীন এবং উচ্চবিত্ত ও ধনী নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের ফারাক অনেক বেশি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সামাজিক স্তরবিন্যাসকে ভাগ করা যায়–

ক. ২ ভাগে খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে

২। নিচের কোনটিতে মানুষ অর্থের দিক থেকে বিভক্ত বুঝায়?

ক. অশিক্ষিত খ. সাম্য
গ. মধ্যবিত্ত ঘ. শাসিত

৩। এস্টেট প্রথা বলতে বুঝায়–

ক. যাজক সম্প্রদায় খ. সামাজিক শ্রেণী
গ. অভিজাত শ্রেণী ঘ. সাধারণ শ্রেণী

৪। গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসে প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান উপাদান হচ্ছে

ক. ভূ–সম্পত্তির পরিমাণ খ. বসতবাড়ি ঘরের আকার
গ. গবাদিপশুর সংখ্যা ঘ. সন্তান–সন্ততির সংখ্যা

৫। সমাজের মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় কাজ করে তা হচ্ছে–

i. অর্থ, পেশা ও ক্ষমতা
ii. ক্ষমতা, মর্যাদা ও শিক্ষা
iii. অর্থ, ক্ষমতা ও মর্যাদা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬–৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব হাসান একজন প্রান্তিক চাষি। তিনি কৃষির ওপর নির্ভর করে পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারছেন না। তাঁর ছেলে ঢাকা শহরের একজন বিত্তশালী ওয়ার্ড কমিশনার। কিন্তু তিনি পিতার সংসারে কোনো সহায়তা করছেন না।

৬। প্রান্তিক কৃষক বলতে যাদের জমির পরিমাণ–

ক. ১ একরের নিচে খ. ২ একরের নিচে
গ. ৩ একরের নিচে ঘ. ৪ একরের নিচে

৭। বাংলাদেশের শহর–সমাজের স্তরবিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে–

i. ক্ষমতা, বংশমর্যাদা ও পেশা
ii. সম্পদ, ক্ষমতা ও শিক্ষা
iii. সম্পদ, বয়স ও ব্যবসা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৮। হাসানের পরিবারের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের বিষয়টি কিসের বৈশিষ্ট্য–

ক. সামাজিক পরিবর্তন খ. সামাজিক সম্পর্ক
গ. সামাজিক উন্নয়ন ঘ. সামাজিক স্তর–বিন্যাস

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সামাজিক পরিবর্তন

সামাজিক পরিবর্তন

মানবসমাজ স্থিতিশীল নয়, পরিবর্তনশীল। তবে সব সমাজ একইভাবে পরিবর্তিত হয় না। এ পরিবর্তন কোথাও দ্রুত, কোথাও মন্থর। আবার অনেক সময় দেখা যায় একই সমাজের সকল অংশে সমান তালে পরিবর্তন হয় না। যেমন– বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তনের গতি খুবই মন্থর। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে পরিবর্তন হয় বেশ দ্রুত। সমাজের যে অংশে শিল্পায়ন ও শহরায়নের প্রভাব, শিক্ষার সম্প্রসারণ, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান সে অঞ্চলে পরিবর্তন দ্রুত ঘটে।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা

সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কেউ কেউ সমাজব্যবস্থার আংশিক (Partial) আবার কেউ কেউ সামগ্রিক (Total) অংশে পরিবর্তনের কথা বলেন। যেমন সমাজবিজ্ঞানী রস (Ross) সমাজের আংশিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে বলেন, "সামাজিক পরিবর্তন হল শুধুমাত্র সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের (Social institutions) এবং তাদের বিভিন্ন রূপের পরিবর্তন"। মরিস জিন্সবার্গ (M. Ginsberg) বলেন, "সামাজিক পরিবর্তন বলতে বুঝি সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং সমাজস্থ লোকদের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণের পরিবর্তন"। কিংসলে ডেভিস (Kinsley Davis) বলেন, "সামাজিক পরিবর্তন হল সমাজ কাঠামো ও কার্যাবলির পরিবর্তন।"

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানবসমাজের আংশিক বা সামগ্রিক, যেকোনো অংশের পরিবর্তনকেই সামাজিক পরিবর্তন বলা যায়। সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের, শ্রেণী কাঠামোর, অর্থনৈতিকব্যবস্থার, আচার ব্যবহারের, জীবনযাত্রা প্রণালির অর্থাৎ মানুষের সব রকম মৌলিক সম্পর্কের পরিবর্তন।

সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা হতে আমরা এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই।

প্রথমত, সামাজিক পরিবর্তন ভৌগোলিক পরিবর্তনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত ঘটে। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সমাজে বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন সত্ত্বেও সমাজের একটা মোটামুটি স্থায়িত্ব আছে, যার জন্য কোনো একটি সমাজকে অন্য সমাজ হতে পৃথক করা যায়।

তৃতীয়ত, সামাজিক পরিবর্তন কম-বেশি অনিশ্চিত বলে পরিবর্তন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না।

চতুর্থত, বৈচিত্র্য সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সামাজিক পরিবর্তন কখনো উন্নতির দিকে, কখনো অবনতির দিকে, কখনো স্থায়ী আবার কখনও অস্থায়ীভাবে হয়ে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান

সামাজিক পরিবর্তন একটি জটিল প্রক্রিয়া। বিভিন্ন উপাদান এ পরিবর্তনের জন্য দায়ী। সামাজিক পরিবর্তন সাধনে শিল্পায়ন, শহরায়ন, শিক্ষা, প্রযুক্তিবিদ্যা, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান বর্ণনা করা হল।

শিল্পায়ন– শিল্পায়ন বলতে মূলত কৃষি সমাজে আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পের বিকাশকে বোঝায়। শিল্পায়ন অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। উৎপাদন-যন্ত্রের উন্নতির ফলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছে। মানুষের জীবযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ যৌথ পরিবার ভেঙে শহরে একক দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার গঠিত হচ্ছে। সমাজে অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মেয়েরা পুরুষের পাশাপাশি ঘরের বাইরে এসে কলকারখানায় উৎপাদন-কর্মে নিয়োজিত হচ্ছে। শিল্পায়নের আরেকটি আনুষঙ্গিক ফল হল শহর ও নগরের বৃদ্ধি। অর্থাৎ শিল্পায়ন ছাড়া কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন তথা উন্নয়ন সম্ভব নয়।

নগরায়ণ– নগরায়ণ বলতে বোঝায় এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো এলাকা নগরে বা শহরে রূপান্তরিত হয়। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে মানুষ কৃষিজ পেশা বাদ দিয়ে নানা ধরনের পেশা গ্রহণ করে বিধায় সমাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। পেশায় বৈচিত্র্য থাকায় গ্রামের মানুষ দলে দলে শহরমুখী হয়। ফলে গ্রামীণ যৌথ পরিবার ভেঙে একক বা অণু পরিবারের সৃষ্টি হয়। শহরের মানুষ তুলনামূলকভাবে বেশি বাস্তববাদী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। নারীপুরুষ পাশাপাশি শিল্প-কারখানা, অফিস-আদালতে চাকরি করে জীবিকা অর্জন করে। এর ফলে মহিলাদের আগের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে বেশি স্বাবলম্বী হতে দেখা যায়। সুতরাং শিল্পায়ন ও শহরায়ন সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা– শিক্ষা হল এমন একটি প্রকিয়া যা ব্যক্তিকে সামাজিক করে তোলে, ব্যক্তিত্বশীল করে গড়ে তোলে। শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলে সমাজ কাঠামোতে আসে নানা ধরনের পরিবর্তন। কারণ শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে এনেছে পরিবর্তন। শিক্ষার সম্প্রসারণ সমাজে জন্মহার ও মৃত্যুহার হ্রাস পেতে সাহায্য করে। দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রযুক্তিবিদ্যা– বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা প্রযুক্তিবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের ফলে শিল্প-কারখানায় বৃহদায়তন উৎপাদন শুরু হয়। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। এটা মানুষের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আগের তুলনায় মানুষ বর্তমানে অনেক বেশি বাস্তবধর্মী হয়ে পড়ছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা– সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম উপাদান হল যোগাযোগ ব্যবস্থা। যেমন- রাস্তাঘাট, যানবাহন, টেলিযোগাযোগ ও অন্যান্য ইলেকট্রনিকস। যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে সমাজ যত উন্নতি সাধন করেছে সে সমাজ তত আধুনিক। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উন্নত ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা।

বাংলাদেশের সমাজে পরিবর্তন

বাংলাদেশের সমাজের পরিবর্তন বলতে আমরা বুঝি এদেশের সমাজের প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যেমন: অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রের পরিবর্তন বা এগুলোর কাঠামো ও কার্যাবলিতে পরিবর্তন।

বাংলাদেশের গ্রামের তুলনায় শহর-সমাজেই পরিবর্তনের হার দ্রুত হলেও গ্রামাঞ্চলে পরিবর্তনের ঢেউ একেবারেই লাগে নি একথা বলা যাবে না। গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক চাষাবাদের প্রচলন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি, ১৯৮২ সালে প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে উপজেলা প্রশাসন কাঠামো গঠন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রচলন প্রভৃতি কারণে গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। শুধুমাত্র অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানেই নয় গ্রামীণ মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও এ পরিবর্তনের ধারা লক্ষ করা যায়।

গ্রামীণ কৃষিতে যান্ত্রিক চাষাবাদ, উন্নত ধরনের বীজ, সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ভূমিতে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এর সুফল ভোগ করছে মূলত গ্রামীণ ধনী কৃষক। তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে বেশি ফসল ফলিয়ে আরো বেশি ধনী হচ্ছে। গরিব আরো গরিব হচ্ছে। অর্থাৎ কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে শোষণের সম্পর্ক বিরাজ করায় গ্রামীণ কৃষক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে নতুন নতুন অফিস, রাস্তাঘাট নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ছোট কৃষকেরা অকৃষিজ পেশায় অংশগ্রহণ করছে। উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন অফিস-আদালতে চাকরি গ্রহণ করায় গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক পেশায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটায় গ্রামীণ ছেলেমেয়েরা বর্তমানে পূর্বের চেয়ে ব্যাপক হারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ায় অংশগ্রহণ করছে। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ায় গ্রামীণ মেয়েরা আগের চেয়ে লেখাপড়ার সুযোগ বেশি পাচ্ছে। তাছাড়া খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তনের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন হওয়াতে গ্রামীণ কৃষকের মেয়েরা শহরে এসে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ও অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। এর ফলে পারিবারিক পরিমণ্ডলে মেয়েদের মর্যাদা, ক্ষমতা ও আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নগরায়ণ, শিল্পায়নের প্রভাবে গ্রামের যৌথ পরিবার ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে। গ্রাম ও শহর-সমাজে স্বামী-স্ত্রীরা পরিবার ছোট রাখার মানসে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলে এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজে বহু স্ত্রী-গ্রহণ প্রথা অনেক হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে বিয়ের বয়স বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখছে।

বর্তমানে গ্রাম ও শহর উভয় সমাজে জীবনযাত্রা প্রণালিতে সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ঘরবাড়ি, তৈজসপত্র ও আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশ পরিবর্তন। আগের দিনে গ্রামীণ মানুষ মাটি ও কাঁসার তৈজসপত্র ব্যবহার করত। কিন্তু এখন ঐ সবের স্থান দখল করেছে চীনামাটি, প্লাস্টিক, মেলামাইন এবং কাচের তৈজসপত্র। শহরের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক ডিজাইনের আসবাবপত্র এখন গ্রাম-সমাজে ব্যবহার হতে দেখা যায়।

চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরে এসেছে অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। গ্রামে জারি, মুর্শিদী ও যাত্রাগানের প্রচলন বেশ কমে আসছে। এসব গুলোর স্থান দখল করেছে টিভি, ভিসিআর ইত্যাদি। ফলে চিত্তবিনোদনের প্রাচীন মাধ্যমগুলো ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে।

সকল সমাজের ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন স্বাভাবিক। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ ও বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবলমাত্র এ পরিবর্তন সুফল বয়ে আনতে পারে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনো দেশের আর্থ–সামাজিক পরিবর্তনের সহায়ক কোনটি ?

ক. শিল্পায়ন খ. কৃষিকাজে কৃত্রিম সারের প্রয়োগ
গ. যৌথ পরিবার প্রথা ধরে রাখা ঘ. সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করা।

২। সামাজিক পরিবর্তনের হার কোন অঞ্চলে দ্রুত?

ক. গ্রাম অঞ্চলে খ. পাহাড়ি অঞ্চলে
গ. শহর অঞ্চলে ঘ. নদী–তীরবর্তী অঞ্চলে

৩। গ্রামীণ কৃষিতে অধিক উৎপাদনের ফল ভোগ করছে–

ক. ভূমিহীন কৃষক খ. প্রান্তিক কৃষক
গ. ধনী কৃষক ঘ. বেকার যুব সমাজ

৪। মেয়েদের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ?

ক. শিল্পায়ন খ. নগরায়ণ
গ. শিক্ষা ঘ. প্রযুক্তি বিদ্যা।

৫। শিল্পায়ন ও শহরায়ন সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে–

i. পেশায় বৈচিত্র্য এনে
ii. যৌথ পরিবার ভেঙে অনু পরিবার সৃষ্টি করে
iii. কৃষকদের ভাগ্যের উন্নতি করে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আজমল বিবাহ করে এবং তার বাবা–মা থেকে আলাদা বাসা নেয়। সেখানে তার স্ত্রীসহ সে বসবাস করে। আজমলের বাবা–মা মাঝে মধ্যে আজমলের বাড়িতে যায় এবং পরিবারের খোঁজখবর নেয়। নাগরিক জীবনের ব্যস্ততার কারণে আজমল বাবা, মার সাথে সর্বদা যোগাযোগ রাখতে পারে না।

৬। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে বলা যায়–

i. নগরায়ণ, শিল্পায়নের প্রভাবে গ্রামের যৌথ পরিবার ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে।
ii. গ্রাম ও শহর–সমাজে স্বামী–স্ত্রীরা পরিবার ছোট রাখার চিন্তা করছে।
iii. শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে সচেতনতার অভাব দেখা যাচ্ছে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৭। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে গ্রামীণ সমাজে কী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়?

ক. যৌথ পরিবার ভেঙে অনু পরিবার তৈরি হচ্ছে, খ. অনু পরিবার ভেঙে যৌথ পরিবার তৈরি হচ্ছে,
গ. পরিবারের সংহতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঘ. পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সামাজিক পরিবর্তনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক প্রগতি এক বিষয় নয়, যদিও উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। সামাজিক প্রগতি হল এক বিশেষ ধরনের সামাজিক পরিবর্তন যা মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমাজবিজ্ঞানী হবহাউজ (Hobhouse) মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ পরিবর্তনকে প্রগতি বলে অভিহিত করেন। অর্থাৎ মানুষ যখন সামাজিক পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে তখনই সামাজিক প্রগতি বা অগ্রগতি দেখা দেয়।

এখন প্রশ্ন হল বাংলাদেশের সমাজ প্রগতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে কি না ? এক কথায় এর উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া সামাজিক প্রগতি পরিমাপের কোনো মানদণ্ড নেই যার দ্বারা তা পরিমাপ করা যায়। তবে বাংলাদেশে সমাজ প্রগতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিনা তা জানতে হলে সামাজিক প্রগতির পূর্বশর্ত সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

পূর্বশর্তগুলো নিম্নরূপ :

(ক) শিক্ষা সমাজের অগ্রগতির পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক। শিক্ষা মানুষকে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা থেকে দূরে রাখে এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে সচেতন করে।

(খ) জাতীয় বা ব্যক্তিগত, শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত উন্নতি সামাজিক প্রগতির অন্যতম পূর্বশর্ত।

(গ) দেশের সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য উৎপাদিত সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও ব্যবহারের নিশ্চিতকরণ।

(ঘ) ভারসাম্য জনসংখ্যা সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম পূর্বশর্ত।

(ঙ) জনগণের জন্য আর্থিক ও রাজনৈতিক সুবিধা।

(চ) প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রদান।

(ছ) বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণার্থে প্রয়োগ।

(জ) উপযুক্ত নেতৃত্ব, সুন্দর শাসন-ব্যবস্থা সামাজিক প্রগতির পক্ষে সহায়ক।

(ঝ) সমাজের ব্যক্তিদের মাঝে নৈতিক ও সামাজিক চেতনা জাগ্রত করতে হবে, যাতে তারা সমাজের কল্যাণ সাধনে অংশগ্রহণ করে।

উপরিউক্ত শর্তাবলি পূরণ হলেই বাংলাদেশের সমাজে অগ্রগতি সাধিত হবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।
সামাজিক পরিবর্তন আবার সামাজিক সমস্যার জন্য দায়ী। কারণ হল সমাজের বিভিন্ন উপাদান বা অংশের মধ্যে আনুপাতিক হারে পরিবর্তন না হয়ে সমাজের কোনো বিশেষ অংশে বা উপাদানে পরিবর্তন হয়। ফলে সমাজের বিভিন্ন অংশে বা উপাদানে পরিবর্তন দেখাযায়। এ কারণে ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়ে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ অপরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা তথা ভূমিকা পালনের ব্যর্থতা থেকেই সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য

সামাজিক সমস্যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সামাজিক সমস্যার উৎপত্তি ঘটে সামাজিক বিশৃঙ্খলা হতে। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম-এর (Emile Durkheim) মতে, "সামাজিক বিশৃঙ্খলার অর্থ ব্যক্তির ওপর সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব হ্রাস পাওয়া" । অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতি যখন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন মানুষের নৈতিক অবনতি শুরু হয়। নৈতিক অবনতি ব্যাপক আকার ধারণ করলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙন শুরু হয়।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙনের ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। এসব পরিস্থিতিতে সমাজে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার পরিমাণ বাড়তে থাকে। সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন ও নিম্‌কফ্ (Ogburn and Nimkoff) সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের জন্য সমাজে বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির অসম পরিবতনকে দায়ী করেন।

কোনো সমাজ বিশৃঙ্খল কিনা তা জানা যায় সে সমাজের সামাজিক বিশৃঙ্খলার কতকগুলো লক্ষণ দেখে। যেমন– অপরাধ, কিশোর অপরাধ, পতিতাবৃত্তি, মাদকাসক্তি, আত্মহত্যার প্রবণতা, বিবাহ বিচ্ছেদ, অবৈধ সন্তান জন্মদান, যৌনব্যাধি, স্বেচ্ছাচার, শিশুশ্রম, শিশুদের প্রতি অবহেলা, নির্ভরশীলতা, নারী নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, ঘুষ, ছিনতাই, সন্ত্রাস, হত্যা, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, ইত্যাদি হল সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের লক্ষণ।

সামাজিক বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ

সামাজিক অসংগতি প্রায় সব সমাজেই দেখা যায়। কোনো সমাজে বেশি, আবার কোনো সমাজে অপেক্ষাকৃত কম। সামাজিক অসংগতির কারণগুলো নিচে বর্ণিত হল।

১। **জটিল শ্রমবিভাগ :** জটিল শ্রমবিভাগের ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা বা অসংগতি দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খেইম (Durkheim) বলেন যে, জটিল শ্রমবিভাগের ফলে সামাজিক অসংগতির উদ্ভব হয়। সীমাহীন সামাজিক শ্রমবিভাগের ফলে সামাজিক ভারসাম্যের অভাব ঘটে বলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

২। **সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব হ্রাস :** সামাজিক অসংগতির অর্থ ব্যক্তির ওপর সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব হ্রাস পাওয়া। অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতি যখন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন মানুষের নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। এর ফলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙন শুরু হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙনের ফলে সামাজিক অসংগতি দেখা দেয়।

৩। **সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় :** সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, আদর্শ, চিন্তাভাবনা যার দ্বারা সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় সে গুলোর সমষ্টিই হল সামাজিক মূল্যবোধ। এসব প্রচলিত মূল্যবোধের অবক্ষয়ই সামাজিক অসংগতির অন্যতম কারণ।

৪। **সংস্কৃতির অসম অগ্রগতি :** সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন (Ogburn)-এর মতে, সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশের পরিবর্তনের অসংগতির ফলে সামাজিক অসংগতি দেখা দেয়।

৫। **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** মানুষের পরিবেশের পরিবর্তন, মহামারী, ভূমিকম্প, বন্যা, যুদ্ধ প্রভৃতি কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা বা অসংগতি দেখা যায়।

নৈরাজ্য : সাধারণত সামাজিক বিশৃঙ্খলা যখন চরমে পৌঁছে তখন সমাজে নৈরাজ্য দেখা দেয়। নৈরাজ্য বলতে সমাজের শৃঙ্খলার অভাবকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের যখন শাসনযন্ত্র আর কাজ করে না এবং শাসনযন্ত্র ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তখন সমাজে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির পেছনে যেসব কারণ দায়ী তা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

১। **মূল্যবোধের অবক্ষয় :** সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ই সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য দায়ী।

২। **আইন-শৃঙ্খলার অবনতি :** সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ হল আইন-শৃঙ্খলায় অবনতি এবং শিথিলতা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার বৈষম্যমূলক আইন প্রয়োগ এবং তাদের আচরণ সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে।

৩। **অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ :** বিজাতীয় সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ও আগ্রাসন আমাদের সমাজজীবনে হতাশা ও নৈরাজ্য ডেকে আনে।

৪। **রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্নীতি :** রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি এদেশে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

সামাজিক মূল্যবোধ : সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান হল মূল্যবোধ। যেসব ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প মানুষের আচার-আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোর সমষ্টিই হল মূল্যবোধ। মনোবিজ্ঞানী Sherif-এর মতে, "যেকোনো সমাজের রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য অনুমোদিত ব্যবহারের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। যেমন– স্নেহ, মায়ামমতা, সততা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ইত্যাদি হল সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ।

সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হয়। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত বিদ্যা, শহরায়ন এবং শিল্পায়নের ফলে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। এর কারণগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল :

১। **ন্যায়বিচারের অভাব :** ন্যায়বিচারের অভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা বা অসংগতি বৃদ্ধি পায়। ফলে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা যায়।

২। **বিশৃঙ্খল পরিবেশ :** সুশৃঙ্খল পরিবেশ সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং বিশৃঙ্খল পরিবেশ সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ বলে বিবেচিত হয়।

৩। **সহনশীলতার অভাব :** সহনশীলতার অভাবে সমাজে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, দ্বন্দ্ব, সংঘাত ইত্যাদি বৃদ্ধি পায় বলে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ডেকে আনে।

৪। **আইনের শাসনের অভাব :** সমাজে আইনের শাসনের অভাব হলে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়।

সামাজিক বিশৃঙ্খলা বা অসংগতি, নৈরাজ্য এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে বাংলাদেশে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিরাজমান প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যাগুলো নিম্নরূপ :

(১) জনসংখ্যা সমস্যা (২) দারিদ্র্য (৩) নিরক্ষরতা (৪) বেকারত্ব (৫) অপরাধ (৬) কিশোর অপরাধ (৭) দুর্নীতি (৮) পুষ্টিহীনতা (৯) মাদকাসক্তি (১০) পতিতাবৃত্তি (১১) ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে সমস্যা (১২) যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতন (১৩) বিবাহ বিচ্ছেদ (১৪) মানসিক প্রতিবন্ধী সমস্যা (১৫) নিরাপত্তাহীনতা (১৬) সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের সমস্যা (১৭) স্বাস্থ্যহীনতা ইত্যাদি।

জনসংখ্যা সমস্যা : বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম মারাত্মক ও ভয়াবহ সমস্যা হল জনসংখ্যা সমস্যা। বাংলাদেশ সরকার এ সমস্যাকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা হল ১১ কোটি ১৪ লক্ষ এবং প্রতিবর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৭৫৫ জন লোক বাস করে। এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১৭% ভাগ। ২০০০ সালের বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটাশিট অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৮৬৮ জন লোক বাস করে। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২.৯২ কোটি এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৮৭৬ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৮% এবং প্রতি দিন বাংলাদেশে প্রায় ৬ হাজার ৫শত শিশু জন্মগ্রহণ করে। দেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৬ লক্ষ। প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৯৫৩ জন মানুষ বাস করে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪১। বাংলাদেশের পক্ষে যেখানে শুধুমাত্র তার জনসংখ্যার ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করাই দুঃসাধ্য সেখানে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ এক অস্বাভাবিক ব্যাপার। ফলে বেড়ে যাচ্ছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নির্ভরশীলতা, বাসস্থান সংকট, খাদ্য সমস্যাসহ আরো বহু রকম সামাজিক সমস্যা।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ :

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো হচ্ছে

১। **শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা :** বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। নিরক্ষর ও অশিক্ষিত মানুষ অধিক সন্তানের ফলে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞ।

২। **মহিলাদের কর্মসংস্থানের অভাব :** যে দেশে নারীশিক্ষার হার যত বেশি সে দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার তত কম। শিক্ষিত কর্মজীবী মহিলারা সংসারের বাইরে কর্মে ব্যস্ত থাকে এবং জীবন সম্পর্কে অধিক সচেতন বলে তারা কম সন্তান কামনা করে।

৩। **দারিদ্র্য :** দেশের জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। দারিদ্র্য বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম একটি কারণ। তাই বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি।

৪। **ধর্মীয় গোঁড়ামি :** বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ হল ধর্মীয় গোঁড়ামি। ধর্মভীরু মানুষ বিয়ে ও সন্তান জন্মদানকে পবিত্র জ্ঞান করে। সন্তান জন্মদানে মানুষের হাত নেই। "মুখ দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি"– এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৫। **বাল্যবিবাহ :** গ্রামীণ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের প্রচলন অত্যন্ত বেশি। জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে বাল্যবিবাহ মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে।

৬। **সামাজিক নিরাপত্তার অভাব :** বাংলাদেশে এখনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গৃহীত হয় নি। বৃদ্ধ ও অবসর কালীন সময়ের নিরাপত্তার একমাত্র সম্বল হল সন্তান-সন্ততি। ফলে এদেশের মানুষ অধিক সন্তান কামনা করে।

৭। **চিত্তবিনোদনের অভাব :** আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে চিত্তবিনোদনের খুবই অভাব রয়েছে। ফলে স্বামী স্ত্রীর একে অপরের সঙ্গ কামনাই চিত্তবিনোদনের একমাত্র উৎস বলে বিবেচিত হয়। তাই দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিকার : বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ক) **জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন :** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বাস্তব জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারের জাতীয় জনসংখ্যা নীতি রয়েছে।

(খ) **পরিবার পরিকল্পনা :** পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে এ দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। শুধু তাই নয়, পরিকল্পিত পরিবারের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কোঠায় আনা সম্ভব।

(গ) **শিক্ষার সম্প্রসারণ :** শিক্ষা হল জনসংখ্যা রোধের অন্যতম উপায়। বিশেষ করে এ দেশের নারীশিক্ষা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

(ঘ) **কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ প্রবণতা বাড়লে প্রজনন হার কমে। সুতরাং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঙ) **বিনোদনমূলক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ :** দেশে সুস্থ ও কল্যাণধর্মী বিনোদনমূলক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটলে জনসংখ্যা হ্রাস পাবে। এজন্য গ্রামীণ পর্যায়ে টিভি, সিনেমা প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের মাধ্যমগুলোর সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা উচিত।

(চ) **বাল্যবিবাহ :** আইনের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ করতে হবে এবং বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স মেয়েদের বেলায় ২০ এবং ছেলেদের বেলায় ২৫ বছর করতে হবে। এ শর্ত ভঙ্গ করলে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(ছ) **অপরাধ :** অপরাধ হল এক ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ যা সমাজ ও প্রচলিত আইন কর্তৃক স্বীকৃত নয়। সমাজবিজ্ঞানী কোনিগ (Koenig) বলেন, "সমাজ বা গোষ্ঠী দ্বারা দৃঢ়ভাবে অসমর্থিত বা নিষিদ্ধ মানব আচরণই হল অপরাধ।" যেমন– চুরি করা, ভেজাল দেওয়া, খুন করা, ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি হল অপরাধমূলক কাজ।

বাংলাদেশে অপরাধের কারণ : বাংলাদেশে অপরাধ বৃদ্ধির কারণ অনেক। এসব কারণ উদঘাটন করতে হলে ব্যক্তির দৈহিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক অবস্থা– এগুলো বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশে অপরাধ বৃদ্ধির কারণগুলো বর্ণনা করা হল।

১। **ভৌগোলিক কারণ :** অপরাধ-বিজ্ঞানী আবুল হাসনাত বলেন, বাংলাদেশে জুন ও ডিসেম্বর মাসে ডাকাতি বৃদ্ধি পায়। অপরাধ-বিজ্ঞানী লমব্রোসোর (Lombroso) মতে, "খুন-জখম সমতল ভূমিতে কম, পাহাড়ি অঞ্চলে বেশি।" বাংলাদেশে চর-অঞ্চলে অপরাধ কম-বেশি সংঘটিত হয়।

২। **দারিদ্র্য :** বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যের কারণে অপরাধকর্ম সংঘটিত হয়। ছোট ছোট চুরি, ডাকাতি, পকেটমার, সিঁধেল চুরি, প্রভৃতি অপরাধগুলো সাধারণ দারিদ্র্যের কারণেই হয়ে থাকে।

৩। **বেকারত্ব :** আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান হারে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ে। এরা তাই অনেকে ছিনতাই, খুন, মদ্যপান, হেরোইন সেবন ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মে লিপ্ত হয়।

৪। **পারিবারিক কারণ :** পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। যে পরিবারে শিশুদের গড়ে ওঠার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ নেই সে পরিবারের শিশু-কিশোররা অপরাধী হতে বাধ্য।

৫। **সামাজিক মূল্যবোধের অভাব :** সামাজিক মূল্যবোধের অভাব বাংলাদেশে অপরাধ বৃদ্ধির কারণ। আমরা সৎ, শিক্ষিত, ন্যায়বান লোক অপেক্ষা ধনী লোককে বেশি সম্মান প্রদর্শন করি। 'অর্থই সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি'– তাই মানুষ যেনতেনভাবে অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে নানা ধরনের অপরাধ কর্মে লিপ্ত হয়।

৬। **রাজনৈতিক কারণ :** রাজনৈতিক অস্থিতিশলীতা, অস্থিরতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের অনিয়মতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা, আইন-শৃঙ্খলায় অবনতি, রাজনৈতিক স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান হারে অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭। **জেলখানা ও বিচারালয়ের প্রভাব :** বিচার ব্যবস্থায় ত্রুটি, দীর্ঘসূত্রিতা এবং জটিল প্রক্রিয়ার দরুন অনেক সময় নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি পায়। এছাড়া জেলখানায় দাগি ও পেশাদার অপরাধীদের সংস্পর্শে কিশোর অপরাধী ও ছোট ছোট অপরাধী দাগি অপরাধীতে পরিণত হয়।

প্রতিকার : "অপরাধকে ঘৃণা কর, অপরাধীকে নয়"– এ দৃষ্টিভঙ্গি হতে অপরাধ ও অপরাধীকে বিচার-বিশ্লেষণ করাই অপরাধ নিরাময়ের প্রধান উপায়। নিচে বাংলাদেশে অপরাধ মোকাবেলার উপায়গুলো বর্ণনা করা হল। বাংলাদেশে অপরাধ যাতে সংঘটিত না হতে পারে তার জন্য ত্রিমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

(১) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (২) প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা এবং (৩) পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা।

১। **প্রতিরোধমূলক ব্যব**স্থা **:** কথায় আছে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই সর্বোত্তম ব্যবস্থা। তাই বাংলাদেশে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ক) অপরাধ প্রতিরোধ করতে হলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
(খ) বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি গ্রহণ, যাতে শিক্ষা গ্রহণের পর যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা থাকে।
(গ) গণদারিদ্র্য হ্রাসের উপায় হিসেবে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
(ঘ) অবসর যাপন ও চিত্তবিনোদনের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং অপ-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে।
(ঙ) জনকল্যাণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থা, পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে হবে।
(চ) বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। দীর্ঘসূত্রিতা কমাতে হবে।
(ছ) নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

২। **প্রতিকারমূলক ব্যব**স্থা **:** অপরাধের মাত্রানুযায়ী উপযুক্ত শাস্তি দানের মাধ্যমে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাংলাদেশে অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশে দূর করা যেতে পারে। এজন্য দেশে যেসব প্রবেশন ও প্যারোল কার্যক্রম ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা জোরদার করতে হবে। তাছাড়া কারা-ব্যবস্থার সংস্কার এবং বিচার-ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করতে হবে।

৩। **পুনর্বাসনমূলক** ব্যবস্থা **:** অপরাধ ও শাস্তিভোগের পর মানুষ অপরাধীকে সহজভাবে গ্রহণ করতে চায় না; তাকে অপরাধী হিসেবে ঘৃণা করে। কিন্তু সেটা করা উচিত নয়। বরং যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাংলাদেশে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে।

কিশোর অপরাধ

কিশোর-কিশোরী কর্তৃক সংঘটিত আইন ও সমাজবিরোধী কার্যাবলিকে কিশোর অপরাধ বলা হয়। অপরাধ-বিজ্ঞানী এ, ভি, জন এর মতে, "কিশোর অপরাধী হল নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার মধ্যে দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গকারী ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনকারী।" বাংলাদেশে সাধারণত ৭-১৬ বছরের কিশোর-কিশোরীদের কিশোর অপরাধীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ অপরাধের প্রধান প্রধান লক্ষণ হল স্কুল পালানো, শিক্ষক ও গুরুজনকে অমান্য করা, পথে-ঘাটে, সিনেমা হলে ও অন্যান্য চিত্তবিনোদন কেন্দ্রে মারপিট বাধানো, পথচারী বিশেষ করে মেয়েদের সাথে অশালীন ব্যবহার করা, উদ্দেশ্যহীনভাবে যেখানে সেখানে ঘোরাফেরা করা, জুয়া খেলা, পরীক্ষার হলে নকল করা, মদ্যপান করা, খুন করা, রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় বিভিন্ন অপরাধকর্মে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি।

কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির কারণসমূহ : বাংলাদেশে দিন দিন কিশোর অপরাধের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রবণতা যদি নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তবে এ সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। নিম্নে কিশোর অপরাধের কারণ বর্ণনা করা হল।

১। **ভৌগোলিক কারণ :** বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ প্রবণতার সাথে ভৌগোলিক অবস্থান, ঋতুচক্র প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ঘরে ফসল তোলার সাথে সাথে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পায়। আবার বর্ষাকালে কিশোর অপরাধ কমে যায়।

২। **ত্রুটিপূর্ণ মানসিক বিকাশ :** বাংলাদেশে বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশে অধিকাংশ শিশুরই মানসিক বিকাশ সুন্দরভাবে হয় না বিধায় তারা অপরাধী হয়ে বেড়ে ওঠে।

৩। **দারিদ্র্য :** দারিদ্র্য কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। অভাবী শিশু-কিশোররা তাদের মৌল চাহিদা মেটাতে না পেরে বিভিন্ন অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়।

৪। **পিতামাতার অসংগতিপূর্ণ আচরণ :** পিতামাতার মধ্যে দাম্পত্য কলহ, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, ব্যক্তিত্বের সংঘাত ইত্যাদির প্রভাবে শিশু-কিশোররা অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। তাছাড়া পিতামাতার স্নেহবঞ্চিত ছেলেমেয়েরা যে অপরাধী হয় একথা নিশ্চিত।

৫। **শহরায়ন ও শিল্পায়ন :** শহরায়ন ও শিল্পায়নের প্রভাবে সনাতন মূল্যবোধ, প্রথা, নিয়মনীতিতে ভাঙন ধরে। ফলে শিশু-কিশোররা পারিবারিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়।

৬। **চিত্তবিনোদনের অভাব :** শিশু-কিশোরদের সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য চিত্তবিনোদনের অভাব থাকায় শিশু-কিশোররা বিদেশী কুরুচিপূর্ণ আমোদ-প্রমোদের উপকরণের প্রভাবে ক্রমশ অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়।

৭। **অনুকরণ ও মেলামেশায় প্রভাব :** কথায় আছে "সৎসঙ্গে সর্গ বাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।" ভালো বন্ধুর সাথে মিশলে ভালো এবং উচ্ছৃখল ও খারাপ বন্ধুদের সঙ্গে মিশলে একজন কিশোর অপরাধীতে পরিণত হতে পারে।

প্রতিকার : বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ মোকাবেলা করতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন

১। সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিশু-কিশোরদের সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। প্রতিটি শিশু যাতে শিক্ষা লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নত করতে হবে।

৩। দারিদ্র্য ঘোচাতে হবে। দারিদ্র্যের কারণে যাতে তারা স্কুলে যাওয়া বন্ধ না করে তার জন্য "শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচি ব্যাপকভাবে চালু করতে হবে।

৪। সুস্থ চিত্তবিনোদনের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে শিশু-কিশোরদের মানসিক গঠন সঠিকভাবে হয়।

৫। শিশুরা যেহেতু অনুকরণপ্রিয়, তাই তারা যেন সৎসঙ্গে মিশে এবং অসৎসঙ্গ এড়িয়ে চলে সেদিকে নজর দিতে হবে।

৬। শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে।

৭। প্রতিবন্ধী ও মানসিকভাবে অসুস্থ শিশুদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
৮। শিশু-কিশোররা যাতে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে জন্য "জাতীয় শিশু নীতি" প্রণয়ন করতে হবে।

যৌতুক প্রথা

যৌতুক প্রথা বাংলাদেশের সমস্যাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক অমানবিক ও বেদনাদায়ক সমস্যা। হিন্দু সমাজে এর উৎপত্তি। হিন্দু আইনে কন্যারা পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না বিধায় পাত্রস্থ করার সময় নগদ অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী দেওয়ার প্রথা বর্তমান। সময়ের পরিবর্তনে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিবর্তন হয়ে যৌতুক প্রথার রূপ লাভ করে। ইসলাম ধর্মে যৌতুক প্রথার প্রচলন নেই। কিন্তু হিন্দু সমাজের অনুকরণে মুসলিম সমাজে এ সর্বনাশা প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

যৌতুক হল এমন একটি সামাজিক কু-প্রথা যাতে কন্যা পাত্রস্থ করার সময় কনে ও বরপক্ষের মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে বরপক্ষকে নগদ অর্থ, দ্রব্যসামগ্রী বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা দানে কন্যাপক্ষকে বাধ্য করা হয়। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে বিয়ের পর দাম্পত্য কলহ, স্ত্রী-নির্যাতন, স্ত্রী-হত্যা, বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতামাতা যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে সর্বস্ব বিক্রি করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। যৌতুকের লোভে বাংলাদেশে প্রায়ই অসামঞ্জস্য বিয়ে সংঘটিত হয়ে থাকে এবং আত্মহত্যার পেছনে যৌতুক প্রথা অনেকাংশে দায়ী।

যৌতুক প্রথার কারণ : বাংলাদেশে যৌতুক প্রথার কারণগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল–

১। **অর্থনৈতিক কারণ :** দারিদ্র্য যৌতুক দাবির অন্যতম প্রধান কারণ। পাত্রের আর্থিক দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য অথবা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার আশায় কন্যাপক্ষের কাছে যৌতুক দাবি করা হয়।
২। **পুরুষশাসিত সমাজে মহিলাদের প্রতি ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি :** পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা কম হওয়ায় যৌতুক প্রথার মাধ্যমে তা পূরণের হাতিয়ার হিসেবে এ প্রথা বিস্তার লাভ করেছে।
৩। **নারীদের পরনির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় তারা পর-নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করে। এই পরনির্ভরশীলতা যৌতুক-প্রবণতা সৃষ্টির সহায়ক।
৪। **প্রতিষ্ঠা লাভের মনোভাব :** শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত ছেলে ও তার অভিভাবকদের নগদ প্রাপ্তির লোভ এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় হিসেবে যৌতুক প্রথাকে গণ্য করা হয়।
৫। **সামাজিক দুর্নীতির প্রভাব :** সামাজিক দুর্নীতি, কালো টাকা, ঘুষ, চোরাকারবারি এবং অবৈধ টাকা যৌতুক প্রথা বিস্তারের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী।

প্রতিকার : বাংলাদেশ থেকে যৌতুক প্রথার ন্যায় অমানবিক অভিশপ্ত প্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১। **সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি :** এ প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে হবে যাতে জনগণ এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।
২। **মহিলাদের অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান :** সংবিধানে মহিলাদের অধিকার রক্ষার জন্য পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার আইন, যৌতুক–বিরোধী আইন, নারী-নির্যাতন আইন প্রণয়ন ও সেগুলো বাস্তবায়নের যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।
৩। **সামাজিক বর্জন :** যৌতুকের দাবিদার যারা তাদের বিয়েতে যোগদান হতে বিরত থাকতে হবে এবং সামাজিক ভাবে এক ঘরে করতে হবে।
৪। **মহিলাদের কর্মসংস্থান :** মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।
৫। **যৌতুক-বিরোধী আন্দোলন :** বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে যৌতুক-বিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

নিরক্ষরতা

সাধারণত নিরক্ষর বলতে অক্ষর জ্ঞানহীনতাকেই বোঝায়। নিরক্ষর হচ্ছে সে ব্যক্তি যার মধ্যে অক্ষরজ্ঞান নেই, যে ব্যক্তি লিখতে-পড়তে জানে না।

নিরক্ষরতা বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। যেহেতু বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর তাই এর প্রভাবে সমাজে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদিতা, স্বাস্থ্যহীনতা, দারিদ্র্য ইত্যাদি সমস্যা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে।

বাংলাদেশে নিরক্ষরতার কারণ : বাংলাদেশে নিরক্ষরতার পেছনে একাধিক কারণ বর্তমান। নিচে নিরক্ষরতার কারণগুলো বর্ণিত হল।

১। **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে নিরক্ষরতার অন্যতম প্রধান কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। প্রতি বছর যে বিপুল সংখ্যক শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদের শিক্ষার জন্য প্রতি বছরে নতুন প্রায় ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, যা তৈরি করা আমাদের দেশের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

২। **দারিদ্র্য :** বাংলাদেশে নিরক্ষরতার আরো একটি প্রধান কারণ হল দারিদ্র্য ও আর্থিক অসচ্ছলতা। ফলে ভূমিহীনদের পক্ষে খাদ্য যোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে শিক্ষাখাতে ব্যয় করার সংগতি থাকে না।

৩। **শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতা :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় নিরক্ষরতার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪। **শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি :** ক্রমবর্ধমান ব্যয়বহুল শিক্ষার খরচ যোগাড় করার অক্ষমতার কারণে বাংলাদেশে নিরক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫। **শিক্ষকদের আর্থিক অসচ্ছলতা :** মানুষ গড়ার কারিগর যারা সেই শিক্ষকদের আর্থিক অসচ্ছলতা বাংলাদেশে নিরক্ষরতা বিস্তারের অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রতিকার : বাংলাদেশ হতে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে–

১। **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রতি বছর ২৪ লক্ষ নতুন শিশু স্কুলে পড়ার উপযোগী হচ্ছে। এ বিপুল সংখ্যক শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব নয়।

২। **দারিদ্র্য দূরীকরণ :** শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত ব্যয় বরাদ্দ। সুতরাং জনগণের দারিদ্র্য দূর না করে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব নয়।

৩। **বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন :** দারিদ্র্য ও সচেতনতার অভাবে বাংলাদেশে নিরক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হবে।

৪। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব :** বাংলাদেশে এখনো বহু গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব।

৫। **নারীশিক্ষার সম্প্রসারণ :** বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাদেরকে উপেক্ষা করে নিরক্ষরতা দূর করা অসম্ভব। সুতরাং নিরক্ষরতা দূর করার জন্য নারীশিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।

৬। **যুব সমাজকে উৎসাহিত করা :** বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের কাজে লাগাতে হবে।

বেকারত্ব

সাধারণত কর্মহীনতাকে বেকারত্ব বলা হয়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হতে বেকারত্ব বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায়, যাতে কর্মক্ষম ব্যক্তি বর্তমান মজুরিতে কর্মে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কর্মে নিয়োগ লাভে সক্ষম হয় না। অর্থাৎ কর্মক্ষম ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতাকে সমাজবিজ্ঞানে বেকারত্ব বলে। অধ্যাপক পিগু (Pigu) বলেন, "যখন কর্মক্ষম লোকেরা যোগ্যতা অনুসারে প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায় অথচ কাজ পায় না তখন সে অবস্থাকে বেকারত্ব বলা হয়।"

বাংলাদেশে বেকারত্বের কারণ : বর্তমান বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেই বেকার। এ দেশে প্রায় ১.৫ কোটি লোক বেকার। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে বাংলাদেশে মূলধনের অভাব এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বেকারত্বের প্রধান কারণ বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু উপরের ২টি কারণ ছাড়া আরো বহুবিধ কারণ রয়েছে। বাংলাদেশে বেকার সমস্যার প্রধান প্রধান কারণগুলো বর্ণনা করা হল−

১। **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে কর্মসংস্থান না হওয়ায় ক্রমান্বয়ে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২। **ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা :** বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির জন্য দায়ী। বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব বেকার সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ।

৩। **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য এ দেশে বিদেশি বিনিয়োগ না হওয়ায় কলকারখানা গড়ে ওঠে না বলে এ দেশে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে না।

৪। **মূলধনের অভাব :** এ দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম বলে সঞ্চয়ের হারও কম। সঞ্চয় কম বলে বিনিয়োগ কম।

৫। **কারিগরি জ্ঞানের অভাব :** বাংলাদেশে বিদেশি প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে সে অনুপাতে দক্ষ শ্রমিকের যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে অদক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে থাকে।

৬। **চাকরি-নিয়োগ অধ্যাদেশ :** মাঝে মাঝে সরকার চাকরি-নিয়োগ অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে দেশে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ ঘোষণা করায় এদেশে সমস্যা আরো জটিল হয়ে পড়ে।

৭। **অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা :** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুন্নত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু আমাদের দেশের কৃষি মৌসুমি বায়ুর ওপর নির্ভরশীল। তাই বৃষ্টিপাত কম হলে চাষাবাদ ব্যাহত হয়। ফলে বেকারত্বও বৃদ্ধি পায়।

৮। **কুটিরশিল্পের অভাব :** দেশীয় কাঁচামাল ও প্রযুক্তিনির্ভর কুটিরশিল্পের প্রসার হয়নি এদেশে। যেগুলো আছে সেগুলোও পুঁজির অভাবে বিলুপ্তির পথে। তাই এদেশে বেকারত্ব বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল কুটিরশিল্পের প্রায় বিলুপ্তি।

প্রতিকার : বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে সীমিত সম্পদ নিয়ে বেকারত্ব মোকাবেলা করা খুবই কঠিন কাজ। দীর্ঘ ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা ব্যতীত এ সমস্যার সমাধান আশা করা যায় না। বাংলাদেশের বেকার সমস্যার প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন−

১। **কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগবৃদ্ধি :** ভূমির মালিকানার কাঠামো পরিবর্তন করে, খাস জমির সুষ্ঠু বণ্টন করে, কৃষিতে প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ করে এবং বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করে কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব।

২। **শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ :** কুটিরশিল্প এবং বৃহদায়তন শিল্প-কারখানা স্থাপন করে এদেশে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায়।

৩। **শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন :** শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করে উৎপাদন ও বাস্তবমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা যায়।

৪। **নারীশিক্ষার প্রসার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি :** নারীশিক্ষার সম্প্রসারণ ও উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারের সংখ্যা হ্রাস করা যায়।

৫। **বিদেশে নিয়োগ বৃদ্ধি :** আমাদের বেকার জনশক্তির একটা অংশকে প্রশিক্ষণদান করে বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা আরো জোরদার করা প্রয়োজন।

৬। **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা হচ্ছে না।

সামাজিক সংহতি ও পুনর্গঠন

সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক সমস্যা বলতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অসংগতিকে বুঝিয়েছেন। সামাজিক অসংগতি বা বিশৃঙ্খলার অর্থ– ব্যক্তির ওপর সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব হ্রাস পাওয়া। অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতি যখন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন মানুষের নৈতিক অবনতি শুরু হয়। নীতিহীনতা যখন ব্যাপক আকার ধারণ করে তখন গোটা সমাজের ওপর প্রভাব পড়ে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ভাঙন ধরে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙনের ফলে সামাজিক অসংগতি দেখা দেয়। সামাজিক বিশৃঙ্খলার বিপরীত ঘটনা হল সামাজিক শৃঙ্খলা। সামাজিক শৃঙ্খলা সমাজকে টিকিয়ে রাখে এবং সদস্যদের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংহতি রক্ষা করে। সমাজবিজ্ঞানী কুঈন, বডেন হেপার এবং হাপার-এর মতে সামাজিক অসংগতি বলতে সামাজিক সংগঠনের অভাবকে বোঝায়। তাঁদের মতে সামাজিক সংগঠন সুষ্ঠুভাবে কাজ করলে সামাজিক সংহতি রক্ষিত হয় এবং সমাজের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। অপরপক্ষে, সামাজিক অসংগতির অর্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্ষমতায় অভাব ঘটা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণ সমাজে নতুন শক্তি জন্ম নেয় যা সমাজের অনিবার্য ভাঙনকে রোধ করে এবং এ পুনর্গঠনের পথ সুগম করে। সামাজিক পুনর্গঠনের অর্থ ঘুণেধরা সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনরায় সঞ্জীবিত করা নয়; বরং পরিবর্তনশীল সমাজে নতুন নতুন চাহিদা পূরণের জন্য নতুন আচার-আচরণের প্রবর্তন করা বোঝায় যাতে মানুষ পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এ তৎপরতাকে সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়া বলেন।

সামাজিক বিশৃঙ্খলা তথা সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

সামাজিক সমস্যা বা বিশৃঙ্খলা সমাজজীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হলেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সেটা অনুভব করে। কারণ সামাজিক সমস্যা হল সমাজজীবনে এমন একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা যা সমাজের বেশির ভাগ লোকের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সবাই যৌথভাবে এ থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। সুতরাং সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে সবারই একযোগে যৌথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। তা না হলে সমস্যা দূর করা একেবারেই অসম্ভব। এখন প্রশ্ন হল একজন ব্যক্তি সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে ? সমাজের সদস্য হিসেবে একজন ব্যক্তি নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করতে পারে। যথা– (ক) সামাজিক সমস্যা যাতে সৃষ্টি হতে না পারে তার জন্য একজন ব্যক্তি সচেতন থাকতে পারে। (খ) সে ব্যক্তিগতভাবে সমাজের মূল্যবোধ পরিপন্থী কোনো কাজে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। (গ) অন্যকেও সামাজিক বিশৃঙ্খলা বা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করা থেকে দূরে রাখতে পারে। (ঘ) সামাজিক সমস্যা যাতে সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারে ব্যক্তি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে।

গোষ্ঠীর ভূমিকা

কোনো সমস্যাকেই সামাজিক সমস্যা বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা মোকাবেলার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না হবে। যেহেতু সামাজিক সমস্যা শুধু একজন ব্যক্তির নয়, সেজন্য দলগতভাবে সমাজবাসী তা মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসে। এক্ষেত্রে দলীয় কার্যক্রম, দলীয় আন্দোলন, দলীয় পরিকল্পনা ইত্যাদিতে সমাজবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছে জনসংখ্যা সমস্যা, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ, যৌতুক প্রথা, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ইত্যাদি। ব্যক্তিগতভাবে এসব সমস্যা সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব নয়। তাই এসব সমস্যা নিরসনকল্পে দলীয় কার্যক্রম জোরদার করা উচিত। আমরা জানি "দশের লাঠি, একের বোঝা"। সুতরাং দশ জন যা করতে পারে এক জন তা কিছুতেই পারে না। সুতরাং সামাজিক সমস্যার মোকাবেলায় গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতা ও দলীয় প্রচেষ্টার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন– অপরাধ ও কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য প্রবেশন, প্যারোল, রিম্যান্ডহোম, কিশোর আদালত, ট্রেনিং স্কুল এবং জেলখানা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলো অপরাধী ও কিশোর অপরাধীদের চরিত্র সংশোধন করতে সাহায্য করে এবং তাদেরকে ভালো হওয়ার শিক্ষা প্রদান করে। এছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তথা যুব উন্নয়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, স্বনির্ভর বাংলাদেশ কার্যক্রম, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংকসহ বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি সাহায্য সংস্থা (N.G.O.) রয়েছে। জনসংখ্যা সমস্যা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান, যেমন– পরিবার কল্যাণ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, জনসংখ্যা শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য তাদের কার্যক্রম দিন দিন সম্প্রসারিত করছে।

বর্তমানে অনেক বিদেশি সাহায্য সংস্থা বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল–

(ক) ভূমিহীন, বেকার ও প্রান্তিক কৃষকদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা।

(খ) সাক্ষরতা দান করা।

(গ) ঋণসুবিধা প্রদান করে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) নতুন নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকদের কৃষিক্ষেত্রে, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, গবাদিপশু পালন, তাঁত বোনা ইত্যাদিতে সাহায্য করা।

(ঙ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ দান।

(চ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের জীবিকার পথ করে দেওয়া।

(ছ) মা ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষাসহ পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করা। এভাবে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠান কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'বাংলাদেশে জুন ও ডিসেম্বর মাসে ডাকাতি বৃদ্ধি পায়' এ উক্তিটি করেছেন–

ক. অপরাধবিজ্ঞানী লমব্রোসো
খ. অপরাধবিজ্ঞানী আবুল হাসনাত
গ. সমাজবিজ্ঞানী কোনিগ
ঘ. সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খেইম

২। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের প্রচলন বেশি–

ক. গ্রামাঞ্চলে
খ. শহরাঞ্চলে
গ. পার্বত্য অঞ্চলে
ঘ. নদী–তীরবর্তী অঞ্চলে

৩। বাংলাদেশ থেকে যৌতুক প্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্যে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে–

ক. নারী অধিকার
খ. মানব অধিকার
গ. নাগরিক অধিকার
ঘ. রাজনৈতিক অধিকার

৪। মহসিন বাবা–মায়ের একমাত্র সন্তান, অতিরিক্ত আদর পেয়ে সে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে যেখানে সেখানে ঘোরাফেরা করে, মেয়েদের সাথে অশালীন আচরণ করে এবং গুরুজনদের অমান্য করে।

সহপাঠী হয়ে মহসিনের আচরণ পরিবর্তন করা যেতে পারে–

i. জীবনগঠনে পরামর্শ দান ও উদ্বুদ্ধ করে
ii. অনুকরণ ও মেলামেশার বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে
iii. সুস্থ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫–৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহিমা একজন রিকশাচালকের মেয়ে। তার বয়স ১৪ বছর। সে শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ–সুবিধা থেকে বঞ্চিত। হঠাৎ একদিন বিশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতিতে তার বিয়ে হয়ে যায় করিম নামে একজন দিনমজুরের সাথে।

৫। রহিমার শিক্ষার পর্যাপ্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পেছনে দায়ী–

i. দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর কষাঘাত
ii. শিক্ষার সুযোগ–সুবিধার সীমাবদ্ধতা
iii. কন্যাশিশুর প্রতি বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬। রহিমার বিয়ে হয় বিশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতিতে কেন?

ক. সে বাবা–মায়ের বোঝা ছিল বলে খ. করিমের অর্থপ্রাপ্তির লোভে
গ. করিমের বাবার শর্ত আরোপ করার ফলে ঘ. বরপক্ষ নগদ অর্থপ্রাপ্তিকে অধিকার মনে করে বলে।

৭। মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স কত?

ক. ২১ বছর খ. ২০ বছর
গ. ১৯ বছর ঘ. ১৮ বছর

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। কবির হোসেনের সঙ্গে রত্নার বিয়ে হয়েছিল মাস ছয়েক আগে। গরিব পিতা মেয়ের সুখের কথা ভেবে বিয়ের শর্ত অনুযায়ী ১৬ হাজার টাকা দিয়েছিল জামাইকে। এতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি জামাই কবির। সে আরো টাকা আনার জন্য দফায় দফায় রত্নাকে বাবার বাড়ি পাঠায়। তাতে কাজ হয়নি দেখে কবির এবং তার পক্ষের লোকজন রত্নাকে নির্যাতন করা শুরু করে। মেয়ের অসহায় অবস্থা দেখে রত্নার বাবা ইউনিয়ন পরিষদে নালিশ করেন। তাতে কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত রত্নার বাবা মেয়েকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে এবং রত্নাকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দেয়।

ক. রত্নার বাবা কবির হোসেনকে ১৬ হাজার টাকা কী হিসেবে দিয়েছে?
খ. রত্না তার স্বামীর এবং স্বামীর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হল কেন?
গ. রত্নাকে এ অসহায় অবস্থা থেকে কীভাবে উদ্ধার করা সম্ভব ? ব্যাখা কর।
ঘ. ''সেলাই মেশিন ক্রয়ের পদক্ষেপটি রত্নার অসহায় অবস্থার অবসান ঘটাবে'', উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২। মনিরের পিতা একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি ঢাকায় কর্মরত। মনির টাংগাইল বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র। বাবার অবর্তমানে মনির নিয়মিত স্কুলে যায় না এবং স্কুলে গেলেও স্কুল থেকে পালিয়ে রাস্তার মোড়ে আড্ডা দেয় এবং স্কুলফেরত মেয়েদের সাথে অশালীন আচরণ করে। ফসল তোলার সময় সে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায় এবং বাবার অজান্তে ফসল বিক্রি করে দেয়।

ক. মনির কোন অপরাধীর অন্তর্ভুক্ত?
খ. এ ধরনের অপরাধ বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্ণনা কর।
গ. এ দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিশোর–কিশোরীরা কীভাবে মুনিরের ন্যায় অপরাধী হয়ে পড়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মনিরকে এ ধরনের অপরাধী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার উপায় যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ
বাংলার জাগরণ

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইংরেজ-শাসনের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ছিল প্রবঞ্চনা, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও দমননীতির। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত একশ বছরের ইতিহাস ছিল সংগ্রামের ইতিহাস। এ সুদীর্ঘ সময়ে বাংলার সর্বত্র বিদেশি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জনগণ কখনো বিচ্ছিন্নভাবে, আবার কখনো সংগঠিতভাবে লড়াই করেছে, বিদ্রোহ করেছে। কখনও তারা ব্যর্থ হয়েছে, আবার কখনও কিছুটা সাফল্য পেয়েছে। ফকির-বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সংঘটিত সংঘবদ্ধ আন্দোলন। সংগ্রামী শহীদ তিতুমীরের আন্দোলন ছিল স্বাধিকার আন্দোলন। বাংলার উপেক্ষিত ও নির্যাতিত জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য হাজী শরীয়তউল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ফকির-বিদ্রোহ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা লাভের পর সর্বপ্রথম যে বিদ্রোহ সংঘবদ্ধভাবে সংঘটিত হয়েছিল তা ইতিহাসে ফকির-বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ফকিররা ১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করেছিলেন। ফকিরদের সাথে সন্ন্যাসীরাও সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেছিলেন। ফকির-সন্ন্যাসীদের পার্থিব বা বৈষয়িক কোনো লোভ-লালসা ছিল না। তাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ফকির-সন্ন্যাসীরা এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁরা ভ্রাম্যমাণ সংঘে বিভক্ত ছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে সারা বছর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁরা বর্শা, তরবারি ও বন্দুক বহন এবং কোনো কাজে বাধাগ্রস্ত হলে এসব অস্ত্র ব্যবহার করতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক অশান্ত প্রতিকূল পরিবেশে ফকির-সন্ন্যাসীরা সামরিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে নবাব মীর কাসিম ফকির-সন্ন্যাসীদের সাহায্য কামনা করেছিলেন। তারা তাঁর পক্ষে যুদ্ধও করেন। মীর কাসিম পরাজিত হলেন, কিন্তু তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকবর্গ ফকির-সন্ন্যাসীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরায় বাধা প্রদান করে এবং তাঁদেরকে দস্যু বলে চিহ্নিত করে। এসব কারণে কোম্পানির সরকারের পতন ঘটানোর জন্য তাঁরা এক দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। দরিদ্র কৃষক, বেকার সৈন্যদল এদের সঙ্গে যোগদান করে। ফকির-সন্ন্যাসীদের মূল লক্ষ্য ছিল কোম্পানির কুঠি, জমিদারদের কাছারি ও নায়েব-গোমস্তাদের বাড়ি আক্রমণ করা। এছাড়া কোম্পানির বেনিয়াদের নৌকা আক্রমণ, সৈন্যদের রসদ পরিবহন বন্ধ করা এবং যোগাযোগ বিপর্যস্ত করা ইত্যাদিও ছিল কোম্পানির বিরুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীদের গৃহীত ব্যবস্থা। ফকির-সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে মজনুশাহ ও ভবানী পাঠক।

মজনুশাহ ও ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে ফকিরদের বিদ্রোহ অব্যাহত থাকে। ১৭৬৩ সালে ফকিরগণ বরিশালে ইংরেজদের ওপর হামলা করেন। একই বছর তারা ইংরেজদের ঢাকা কুঠি আক্রমণ ও লুটপাট করেন। ইংরেজগণ পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। পরে তারা শক্তি বৃদ্ধি করে। ফকিরদেরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে কুঠি পুনরুদ্ধার করেন। ফকিরগণ রাজশাহীর রামপুরে ইংরেজ কুঠি আক্রমণ এবং লুট করেন, তাঁরা এর এজেন্ট বেনেটকে ধরে নিয়ে যান এবং পরে হত্যা করেন। ১৭৬৭ ও ১৭৬৯ সালে ফকিরদের সঙ্গে কোম্পানির কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ইংরেজ সেনাপতি মার্টল ও লেফটেন্যান্ট কিথ এবং আরো অনেকে নিহত হয়। এ সাফল্যে ফকির ও সন্ন্যাসীদের উৎসাহ বেড়ে যায়।

মজনুশাহের নেতৃত্বে ফকিরগণ রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বীরভূম, মালদহ, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে ইংরেজ-বিরোধী তৎপরতা শুরু করেন। ১৭৭৬ সালে তাঁরা মহাস্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন।

১৭৮০ সালে মজনুশাহ বগুড়া জেলার করাইয়ের জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর কাছে ৫০,০০০ টাকা দাবি করেন। শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে অন্যত্র চলে যান। ১৭৮১ সালে মজনুশাহ মধুপুর জঙ্গলে আধিপত্য স্থাপন করেন। ১৭৮২ সালে চরকায়থ নামক স্থানে ইংরেজ সৈন্যদের সাথে ফকিরদের এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ফকিরগণ পরাজিত হন। ১৭৮৩ সালে লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড সৈন্যদল নিয়ে এদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীগণ পরাজিত হন।

১৭৮৭ সালে ফকির মজনুশাহের মৃত্যুর পর সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ফকির-আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের পরবর্তী নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চেরাগ আলী শাহ, পরাগল শাহ, মাদার বখস, জারি শাহ, করিম শাহ, রওশন শাহ প্রমুখ। কিন্তু এদের মধ্যে দলীয় কোন্দল শুরু হয়। অন্তর্দ্বন্দ্ব, কোন্দল, সাংগঠনিক দুর্বলতা, যোগাযোগের অভাব, ধর্মীয় ভেদাভেদ ফকির-আন্দোলনের পতন ত্বরান্বিত করে। এছাড়া কোম্পানির তৎকালীন উন্নততর রণকৌশল এবং সেনাবাহিনী বৃদ্ধির ফলে ফকির-আন্দোলনের পতন ঘটে।

ফকির-সন্ন্যাসীরা দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ এবং পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন।

তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে শহীদ তিতুমীরের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রয়েছে। তিনিই সর্বপ্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। মুসলমানদের প্রতি দেশীয় জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার, শোষণ ও অবিচার দেখে তিনি সংগ্রামী চেতনায় অনুপ্রাণিত হন। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

তিতুমীর ১৭৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাজী নিয়ামতউল্লাহর কাছ থেকে কুরআন, হাদিস, আরবি ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষালাভ করেন। তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন মল্লযোদ্ধা ছিলেন। তিনি কিছুদিনের জন্য জমিদারদের পক্ষে প্রজাদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহের দায়িত্ব পালনকালে এক বিবাদে জড়িত হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর জেল হয়। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি মক্কায় পবিত্র হজ্ব পালন করেন।



চিত্র ২.১ : তিতুমীর

মক্কায় অবস্থানকালে তিতুমীর মুক্তিসংগ্রামের পথপ্রদর্শক সৈয়দ আহমদ শহীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৮২৭ সালে দেশে ফিরে এসে সমাজসংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন।

তিতুমীর অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে উৎসাহিত করেন। প্রথমে তিতুমীর নারিকেলবাড়িয়ায় সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু করেন। চব্বিশ পরগনা ও নদীয়ার অনেক কৃষক তাঁর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। অতি অল্পদিনের মধ্যে তিতুমীরের এ আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ নেয়। তিতুমীরের জনপ্রিয়তা দেখে পূর্ণিয়ায় জমিদার কৃষ্ণদেব মুসলমান কৃষকদের দাড়ির ওপর জনপ্রতি আড়াই টাকা হারে কর আরোপ করেন। বেআইনি কর সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে জমিদার তিতুমীরের সমর্থকদের বাড়িঘর লুট করেন এবং মসজিদ পুড়িয়ে দেন। তিতুমীর থানায় অভিযোগ করলে অভিযোগ অগ্রাহ্য করা হয়।

তিতুমীর শান্তিপূর্ণভাবে এবং সমঝোতার মাধ্যমে প্রজাদের অত্যাচারের প্রতিকার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার্থে তিনি অস্ত্রধারণ করেন। তিনি বারাসতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কোম্পানির বিরুদ্ধে এটাই তাঁর প্রথম বিদ্রোহ। তিনি চব্বিশ পরগনার কিছু অংশ, নদীয়া ও ফরিদপুরের একাংশ নিয়ে এক স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। তাঁকে দমন করার জন্য বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে প্রেরিত সশস্ত্র বাহিনী তিতুমীরের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এ বিদ্রোহ বারাসতের বিদ্রোহ নামে পরিচিত। উইলিয়াম হান্টারের মতে, এ বিদ্রোহে ৮৩ হাজার কৃষকসেনা তিতুমীরের পক্ষে যোগদান করে।

বারাসতের বিদ্রোহের পর তিতুমীর ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য বুঝতে পারেন। তাই সমরপ্রস্তুতি ও সেনা প্রশিক্ষণের জন্য এবং নিজ বাহিনীর নিরাপত্তার জন্য নারিকেলবাড়িয়ায় ১৮৩১ সালে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ এবং সেখানে যুদ্ধাস্ত্র জমা করেন। তিতুমীর তাঁর সহচর গোলাম মাসুমকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি নীলকরদের কুঠি আক্রমণ করলে ভীতসন্ত্রস্ত নীলকররা সপরিবারে কলকাতায় পালিয়ে যায়।

অতঃপর কোম্পানি সরকার ১৮৩১ সালে কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী ও বন্দুকধারী সৈন্যদের এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে। ১৯ শে নভেম্বর নারিকেলবাড়িয়ায় এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। ইংরেজদের কামান ও গোলাগুলি বর্ষণে বাঁশের কেল্লা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। তিতুমীর ও তাঁর চল্লিশ জন সহচর শহীদ হন। অনেকেই বন্দী হন। বিচারে বন্দীদের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডিত করা হয়। সেনাপতি গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

তিতুমীর দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি নির্ভীক বীরের মতো যুদ্ধ করে শহীদ হন। তিনি ভবিষ্যৎ স্বাধীনতাকামী সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের পথপ্রদর্শক হয়ে অমর হয়ে আছেন। তিতুমীরের জমিদার, নীলকর এবং ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রাম পরবর্তীকালের সকল আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি যুগিয়েছে এবং অনুপ্রাণিত করেছে।

ফরায়েজি আন্দোলন

ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশে যেসব ধর্মীয় আন্দোলন হয়েছিল ফরায়েজি আন্দোলন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি এটি ছিল কৃষক-আন্দোলন।

আর্থ-সামাজিক কারণসমূহ : বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মুসলমান সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে চরম দুর্দশা নেমে আসে। কোম্পানি মুসলমানদেরকে সেনা বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য চাকরি থেকে বিতাড়িত করার ফলে অজস্র মুসলিম পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নির্ধারিত খাজনা আদায় ছাড়াও জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, সরকারি কর্মচারীরা নানা ধরনের অত্যাচারের মাধ্যমে কৃষকসমাজকে পঙ্গু করে দেয়।

ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশে জমিদারদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল হিন্দু। আর প্রজারা অধিকাংশ ছিল গরিব কৃষক। জমিদারগণ প্রজাদের ওপর অবৈধভাবে নানাপ্রকার কর ধার্য ও আদায় করত। ইংরেজরা 'বাজেয়াপ্ত নীতির' দ্বারা কোটি কোটি টাকা মূল্যের নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করায় যেমন সম্ভ্রান্ত অনেক পরিবার ধ্বংস হয়, তেমনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ে এবং কুপ্রথা, অন্ধবিশ্বাস ও অনৈসলামিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

তাছাড়া নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারে নীলচাষিদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নীলকররা চাষিদের জোরপূর্বক নীলের চাষ করতে বাধ্য করত। ইংরেজ বিচারকদের পক্ষপাতিত্বের জন্য চাষিরা সুবিচার পেত না।

মুসলমান সমাজের এ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতন দেখে যিনি এর সংস্কারের জন্য এগিয়ে আসেন তিনি হলেন হাজী শরীয়তউল্লাহ। তিনি যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন, সে আন্দোলন ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত। ইসলামের 'ফরয' সমূহ পালনের জন্য হাজী শরীয়তউল্লাহ জোর প্রচার চালান। এই 'ফরয' হতেই এ আন্দোলনের নাম ফরায়েজি হয়েছে। হাজী শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পরে এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহসিনউদ্দীন ওরফে দুদু মিয়া।

হাজী শরীয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)

হাজী শরীয়তউল্লাহ ১৭৮১ সালে শরীয়তপুর জেলার শামাইল নামক গ্রামে এক মধ্যবিত্ত তালুকদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বার বছর বয়সে তিনি কলকাতায় গমন করে মাওলানা বাশারত আলীর কাছে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। ১৭৯৯ সালে তিনি পবিত্র হজ্ব সম্পন্ন করতে মক্কা শরীফ গমন করেন। তথায় তিনি হানাফী এবং কাদেরীয়া তরিকার সুফি মতবাদে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দুই বছর কায়রোর জামিয়া-আল-আজহার শিক্ষাকেন্দ্রে অবস্থান করেন। ১৮১৮ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়তউল্লাহ ছিলেন একজন ধর্ম ও সমাজসংস্কারক। তিনি মুসলমান সমাজকে অনৈসলামিক কার্যকলাপ থেকে সরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। সেজন্য ধর্মের ফরযগুলো যথাযথ পালনের ওপর তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা, নৈতিক দিক দিয়ে বলীয়ান করা, ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, কৃষক প্রজাদেরকে সরকার, জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার এবং উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা।

ফরায়েজি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর জেলা। এছাড়া ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় এ আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করে।

শরীয়তউল্লাহর জনপ্রিয়তা দেখে স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণ ফরায়েজি আন্দোলনের বিরোধিতা শুরু করেন। তারা প্রজাদের ওপর নানা প্রকার অবৈধ কর আরোপ করতেন। দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতি হিন্দু উৎসবের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন। ঈদ উপলক্ষে কোনো কোনো হিন্দু জমিদার গরু কোরবানি করতে নিষেধ করতেন। এভাবে নানারকম অজুহাতে হিন্দু জমিদারগণ ফরায়েজিদের অত্যাচার করতে থাকেন। হাজী শরীয়তউল্লাহ তাদেরকে রক্ষার জন্য একটি লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় তাঁর শিষ্য জালালউদ্দিন মোল্লার ওপর। জমিদারগণ বিভিন্ন উপায়ে তাঁকে হয়রানি করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের উৎপীড়ন ও বিরোধিতা কিছুতেই ফরায়েজিদের অগ্রগতি রোধ করতে পারেনি।

শরীয়তউল্লাহ তাঁর অনুসারীদেরকে নীলকরদের অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণ থেকে মুক্ত করতেও সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য হল তিনি বাংলার কৃষকদের মধ্যে জাগরণ সঞ্চার করেন। তাঁরই নেতৃত্বে কৃষকেরা জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়ার শক্তি সঞ্চার করে। হাজী শরীয়তউল্লাহ ১৮৪০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২)

হাজী শরীয়তউল্লাহর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র দুদু মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এ আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী ও সংগঠিত করে তোলেন।

দুদু মিয়া ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বার বছর বয়সে দুদু মিয়া শিক্ষালাভের জন্য মক্কা শরীফ গমন করেন। পাঁচ বছর পর দেশে ফিরে আসেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ সাংগঠনিক গুণের অধিকারী। তিনি ফরায়েজিদেরকে সংঘবদ্ধ ও সুসংহত করে তাদের মধ্যে সাহস ও আত্মবিশ্বাস জাগরিত করেন। জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য তিনি এক শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন। তিনি ফরায়েজিদের নিয়ে এক বিরাট প্রজা-আন্দোলন শুরু করেন।

সংগঠনের সুবিধার্থে তিনি বাংলাদেশকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য এক এক জন করে 'খলিফা' নিযুক্ত করেন। ফরায়েজিদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি, বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহ, কূটনৈতিক কলাকৌশল প্রয়োগ ইত্যাদি খলিফাদের কাজ ছিল। নিজ নিজ অঞ্চলের সমস্ত খবরাখবর দুদু মিয়াকে নিয়মিতভাবে জানানো ছিল খলিফাদের অপর একটি কর্তব্য।

দুদু মিয়া জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক, শ্রমিক, কারিগর প্রভৃতি দরিদ্র ও নির্যাতিত মানুষকে সংঘবদ্ধ করেন। তিনি তাঁর পিতার সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকে বৈপ্লবিক স্তরে উন্নীত করেন। তাঁর কর্মসূচি ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। ফলে এ আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তন ঘটে। তিনি ঢাকা, পাবনা, যশোর, মালদহ, বারাসত প্রভৃতি অঞ্চলে অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এর ফলে জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশ সরকার সম্মিলিতভাবে দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী জোট গঠন করে। ১৮৪৭ সালে তিনি এ সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। এ সংগ্রাম দমনে ব্যর্থ হয়ে সরকার দুদু মিয়াকে গ্রেপ্তার করে। ১৮৬০ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ফরায়েজি আন্দোলন প্রথমে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার হিসেবে শুরু হলেও এটা শুধুমাত্র মুসলমান জনগণকে সংঘবদ্ধ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেনি, আন্দোলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি স্থানীয় হিন্দু কৃষকদের এক বিরাট অংশকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এভাবে এ আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করে।

নীল বিদ্রোহ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের গণআন্দোলনের মধ্যে বাংলার নীল বিদ্রোহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিদ্রোহে বাংলার কৃষক সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

নীল নামক একপ্রকার চারাগাছ থেকে রং সংগ্রহ করা হত। এ রং সুতিবস্ত্রে ব্যবহার করার জন্য অতি প্রাচীনকাল থেকে এদেশে নীলের চাষ হত। মুসলমান আমলে কৃষকগণ ইচ্ছেমতো নীলচাষ করত ও বিক্রয় করত। বাংলাদেশের ফরিদপুর, যশোর, ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা, খুলনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় এবং ভারতের বারাসত, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে নীলের চাষ হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের ফলে বস্ত্রশিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় এবং কাপড় রং করার জন্য নীলের চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। ফলে বাংলা থেকে প্রচুর নীল ইউরোপের বাজারে রপ্তানি হয়। এ ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক ছিল। প্রথম দিকে নীলচাষ ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারে। ১৮৩৩ সালের সনদ আইনের ফলে তাদের একচেটিয়া অধিকার লোপ পায় এবং ব্রিটেন থেকে দলে দলে ইংরেজ নীলকররা বাংলায় আগমন করে ইচ্ছেমতো নীলের চাষ শুরু করে।

নীলকররা নীল-উৎপাদিত অঞ্চলসমূহে কুঠি স্থাপন করে। প্রত্যেক কুঠিতে কয়েদখানা ছিল। নীলকরদের নিজস্ব বেসামরিক বাহিনী ছিল। লাঠিয়াল, পাইক, পেয়াদা ও বরকন্দাজ নিয়ে গঠিত হত নীলকরদের বেসামরিক বাহিনী। নীলকররা কৃষকের উৎকৃষ্ট জমিতে দাগ দিয়ে নীলচাষে বাধ্য করত। প্রথম দিকে নীলকরগণ বিনামূল্যে নীল চাষিদেরকে নীলের বীজ যোগান দিত। এ সময় তারা পারিশ্রমিকও পেত। পরে নীলকরগণ দাদন (অগ্রিম টাকা) দেওয়ার প্রথা প্রচলন করে। দাদন নেওয়ার সময় চুক্তিনামায় সই করতে হত। এতে উল্লেখ থাকত চাষি কী পরিমাণ জমিতে নীলচাষ করবে এবং কত দামে নীলগাছ নীলকরদের কাছে বিক্রি করবে। শর্ত অনুযায়ী দাদনের টাকা দিয়ে নীলচাষ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ চাষিকে বহন করতে হত। মাপজোকের বেলায় নীলকররা কারচুপির আশ্রয় নিত। দেড় বিঘা জমিকে তারা এক বিঘা হিসাব করত। অনেক সময় নীলকরগণ জাল চুক্তিপত্র তৈরি করত।

যেসব চাষি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করত এবং নীলচাষ করতে সম্মত হত না, তাদের ওপর চলত অমানুষিক অত্যাচার। তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলা হত। তাদের স্ত্রী-কন্যাকে অপহরণ করা হত, তাদের গরু-বাছুর ধরে নিয়ে নীলকুঠিতে আটক করে রাখাহত। কোনো কোনো চাষিকে গুলি করে হত্যা করাহত। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হত। নীলকরদের অত্যাচারে নীলকুঠি এলাকাস্থ প্রজাগণ গ্রাম ছেড়ে চলে যেত। এশলি ইডেন বলেছেন যে, খুন, দাঙ্গা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, অপহরণ প্রভৃতি এমন কোনো অপরাধ নেই যা নীলকররা করত না।

১৮৫৬ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গোপাল লাল মিত্র বলেছেন যে, কৃষককে দাদনের টাকা হতে নীলকরের গোমস্তা, আমিন ও দাগিদারকে দিতে হত। এস্কনস নামে এক জজসাহেব মন্তব্য করেন যে, নীলকরের দালালদের অর্থলালসা মিটিয়ে কৃষকগণ দাদনের এক-তৃতীয়াংশ টাকাও বাঁচাতে পারত কিনা সন্দেহ।

'নীল দর্পণ' নাটকে দীনবন্ধু মিত্র নীলকরদের এসব অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণ সম্পর্কে নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন। ১৮৬০ সালে 'নীল দর্পণ' প্রকাশের সাথে সাথে দেশে উত্তেজনা ও ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়।

নীলকরদের অকথ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষকেরা নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে লাগল। প্রথমে বিদ্রোহী নীল কৃষকেরা কর্তৃপক্ষের কাছে মানবিক দিক বিবেচনার জন্য আবেদন করে। এ পর্যায়ে তারা শান্তিপূর্ণ মিছিল করে নিজেদের অভাব-অভিযোগ পেশ করে। তাদের আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল হলে আন্দোলন এক ধাপ এগিয়ে যায়। এ পর্যায়ে নীলচাষিরা সংঘবদ্ধভাবে নীলচাষ করতে অসম্মতি জানায়। এ আন্দোলন ছিল অহিংস 'সত্যাগ্রহ'। শান্ত ও নিরস্ত্রভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের ভিত্তিতে সংগ্রাম করাকে 'সত্যাগ্রহ' বলা হয়।

নীলচাষ না করার জন্য চাষিদের ওপর ভয়ানক নির্যাতন, গ্রেপ্তার ইত্যাদি শুরু হলে এ আন্দোলন সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয়। ফরিদপুর, যশোর, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, নদীয়া, বারাসত প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।

নীল বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার 'নীল কমিশন' গঠন করেন। কমিশন সরেজমিনে নীলচাষিদের অভিযোগের সত্যতা পরীক্ষা করেন এবং অভিযোগ যথার্থ বলে অভিমত দেন। ফলে সরকার একটি আইন দ্বারা ঘোষণা করেন যে, নীলকররা বলপূর্বক চাষিকে নীলচাষে বাধ্য করতে পারবে না এবং তা করলে সেটা আইনত দণ্ডনীয় হবে। এ আইন পাসের ফলে ১৮৬০ সালের নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

হিন্দু, মুসলিম, জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল নীলচাষির পারস্পরিক সহযোগিতা, শৃঙ্খলা এবং দৃঢ় সংকল্পের ফলে নীল বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত হয়। প্রথমদিকে এ আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ 'সত্যাগ্রহ'। এ আন্দোলনে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে মহাত্মা গান্ধী বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রিটিশ ভারতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন।

নীল বিদ্রোহের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রয়োজনে অশিক্ষিত, দুর্বল কৃষকেরাও সংঘবদ্ধ হয়ে অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ফারায়েজি আন্দোলনকে কোন ব্যক্তি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপদান করেন ?

ক. হাজী শরীয়ত উল্লাহ খ. দুদু মিয়া
গ. তিতুমীর ঘ. নবাব সলিমুল্লাহ

২। তিতুমীর কীভাবে স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের পথপ্রদর্শক হয়ে অমরত্ব লাভ করেছেন–

i. নিরাপত্তার জন্য বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে
ii. দেশীয় জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে
iii. নির্ভীক বীরের মতো যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

১৭৮৭ সালে ফকির মজনুশাহের মৃত্যুর পর সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ফকির–আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের পরবর্তী নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চেরাগ আলী শাহ, পরাগল শাহ, মাদার বখস, জারি শাহ, করিম শাহ, রওশন শাহ প্রমুখ। কিন্তু এদের মধ্যে দলীয় কোন্দল শুরু হয়। অন্তর্দ্বন্দ্ব, কোন্দল, সাংগঠনিক দুর্বলতা ফকির–আন্দোলনের পতন ত্বরান্বিত করে।

৩। ফকির–আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ার কারণ হল–

ক. অন্তর্দ্বন্দ্ব, কোন্দল ও সাংগঠনিক দুর্বলতা

খ. ফকিরদের আন্তরিকতার অভাব

গ. মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব

ঘ. কোম্পানির উন্নতির রণকৌশল

৪। ফকির–আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে কার অবদান সবচাইতে বেশি–

i. পরাগল শাহ

ii. মজনু শাহ

iii. মাদার বখস শাহ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কার

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু সমাজে নানা প্রকার কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। সতীদাহ প্রথা তার মধ্যে অন্যতম। তাছাড়া বাল্যবিবাহ, জাতি ও বর্ণ প্রথা ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। এসব কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূরীকরণ এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রসারের জন্য যেসব মনীষীর অবদান অবিস্মরণীয়, তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অন্যতম। মুসলমান সমাজেও এ সময় অনেক মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। পশ্চাৎপদ মুসলমানদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের মধ্যে হাজী মুহম্মদ মুহসীন, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন অবিভক্ত বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজ, শিক্ষা ও ধর্মীয় সংস্কারক। এই মনীষী ১৭৭২ সালে হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রামাকান্ত রায় ছিলেন তাঁর বাবা এবং তারিণী দেবী ছিলেন তাঁর জননী। তারিণী দেবী ছিলেন তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী ও নিষ্ঠাবান মহিলা। রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। হিব্রু, গ্রিক, সিরীয় প্রভৃতি ভাষায়ও দক্ষতা অর্জন করেন। ইসলাম ধর্ম, খ্রিষ্ট ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। ১৮২৬ সালে তিনি একখানি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। এ বইটি পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হয়। তিনি প্রথমে কোম্পানির চাকরিতে যোগদান করেন এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হন।



চিত্র ২.২ : রাজা রামমোহন রায়

১৮২৩ সালে সংবাদপত্র বিধি (Press Ordinance) পাস করা হলে রামমোহন এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টে এক প্রতিবাদলিপি দাখিল করেন। এ প্রতিবাদলিপির প্রতিলিপি ইংল্যান্ডে প্রিভি কাউন্সিলে প্রেরণ করেন। এ কৃতিত্ব তাঁর অদম্য সাহসের পরিচয় বহন করে।

শিক্ষা-সংস্কার : রাজা রামমোহন রায় এ দেশে পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতায় এ্যাংলো-হিন্দু নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া ব্রাহ্ম সমাজের মাধ্যমে এবং ডেভিড হেয়ার-এর সহযোগিতায় তিনি বহু স্কুল স্থাপন করে ইংরেজি-শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করেন। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রণীত শিক্ষানীতির রূপরেখা অনুসারে ১৮৩৫ সালে সরকারি শিক্ষানীতি গৃহীত হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে রামমোহন রায় ছিলেন প্রগতিবাদী। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাঁর কৃতিত্ব ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে রাজা উপাধিতে অলংকৃত করেন।

ধর্ম-সংস্কার : রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের অনেক সংস্কার সাধন করেন। হিন্দুধর্ম থেকে মূর্তিপূজা, বর্ণভেদ প্রথা এবং অর্থহীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি 'একেশ্বরবাদ'-এ বিশ্বাসী ছিলেন। একেশ্বরবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলায় বেদান্তসূত্রের অনুবাদ করেন ও বেদান্ত কলেজ স্থাপন করেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন।

সমাজ-সংস্কার : সমাজ-সংস্কারে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮২৯ সালে তিনি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ ও বিধবা-বিবাহ প্রচলনের সপক্ষে তিনি জোরালো প্রচার শুরু করেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন পাস করে সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রামমোহন 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এছাড়া তিনি হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যান। তিনি বহুবিবাহের বিরোধী ছিলেন। হিন্দু নারীকে সুশিক্ষা প্রদান, নারীদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিধবাগণ যাতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সে চেষ্টাও তিনি করেছেন। তিনি নিজেই সমুদ্রযাত্রা করে বিলেতে গমন করে সমুদ্রযাত্রা-সম্পর্কিত সামাজিক কুসংস্কার দূর করেন।
শিক্ষা-সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার, সামাজিক-সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে ১৮৩৩ সালে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে রাজা রামমোহন রায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন মানবতাবাদী, পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক। তিনি শিক্ষা এবং সমাজ-সংস্কারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। ১৮২০ সালে ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর জেলায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তিনি কাব্য, ব্যাকরণ, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। উনিশ বছর বয়সে বিশেষ পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের জন্য তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রদান করা হয়। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৮৯১ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তিনি শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারে অমূল্য অবদান রেখে ১৮৯১ সালে পরলোক গমন করেন।


চিত্র ২.৩ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শিক্ষা-সংস্কার : ঈশ্বরচন্দ্র প্রথমে কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হন। সে সময় তিনি সংস্কৃত কলেজের অনেক সংস্কার সাধন করেন। পূর্বে সংস্কৃত কলেজে শুধু ব্রাহ্মণরা পড়াশোনা করত। ঈশ্বরচন্দ্র সকল হিন্দু ছাত্রের জন্য উক্ত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি 'বর্ণমালা', 'কথামালা' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। তিনি নারীশিক্ষা বিস্তারেও ব্রতী হন। তিনি কিছুদিনের জন্য বেথুন কলেজে সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। জনশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষা-পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনের সময়ে তিনি অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি তাঁর জন্মস্থান মেদিনীপুরে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় ও একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজ স্থাপিত হয়। তিনি এই কলেজের অনেক উন্নতি সাধন করেন।

সমাজ-সংস্কার : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক ছিলেন। তিনি বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং বিধবা-বিবাহের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিধবা-বিবাহ বৈধকরণ ও প্রবর্তন তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা আইন পাস হয়। এ আইন প্রবর্তনের ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে বাংলায় প্রথম বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৮৭০ সালে তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র এক বিধবাকে বিয়ে করেন। এ বিয়ের ফলে সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সমাজ অনেক অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের অভিশাপ থেকে মুক্তি পায় এবং আধুনিক মুক্তচিন্তা ও চেতনার জগতে উন্নীত হয়।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন (১৭৩২-১৮১২)

যে দানবীর বাংলার দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও তাদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিপুল সম্পত্তি মুক্তহস্তে দান করেছেন, তিনি হলেন হাজী মুহম্মদ মুহসীন। সততা, সাধুতা, ধর্মপরায়ণতা, কর্তব্যপরায়ণতা, পরোপকারিতা ইত্যাদি ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জন্য তিনি দান করেছেন তাঁর ঐশ্বর্য। দানশীলতার জন্য তিনি 'দানবীর' ও 'বাংলার হাতেমতাই' নামে সুপরিচিত।
১৭৩২ সালে হুগলি জেলার এক সম্ভ্রান্ত ঐশ্বর্যশালী পরিবারে হাজী মুহম্মদ মুহসীন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

ধর্ম ও জ্ঞান অন্বেষণের জন্য হাজী মুহম্মদ মুহসীন ত্রিশ বছর ধরে ইরান, মিসর ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। দেশে ফেরার পথে তিনি পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন।
পিতৃসম্পত্তি ও পরলোকগত বোন মুন্নজানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে মুহসীন প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক হন। বিপুল সম্পদের মালিক হয়েও তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। সমাজের জনহিতকর কাজে তিনি সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ ইমামবাড়া তাঁর জনহিতকর কার্যাবলির অন্যতম নিদর্শন।



চিত্র ২.৪ : হাজী মুহম্মদ মুহসীন

শিক্ষা বিস্তারে দান : বাংলার দরিদ্র মুসলমানদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য মুহসীনের দান অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয়। গরিব মেধাবী মুসলমান ছাত্ররা যাতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে সে জন্য তিনি কলকাতায় ১৮০৬ সালে তাঁর তৎকালীন এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি দিয়ে 'মুহসীন ট্রাস্ট' গঠন করেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে মুহম্মদ মুহসীন 'ট্রাস্ট' গঠন করেছিলেন তা কার্যকর হয়নি। সকল সম্প্রদায়ের ছাত্ররা শিক্ষার জন্য এই অর্থ লাভ করত। অধঃপতিত দরিদ্র মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারের যে উদ্দেশ্যে মুহসীন তাঁর সম্পত্তি দান করেছিলেন তা পূরণ হয়-নি। অবশেষে ১৮৭৩ সালে নওয়াব আব্দুল লতিফ, স্যার উইলিয়াম হান্টার প্রমুখ ব্যক্তিদের আন্তরিক চেষ্টায় 'মুহসীন ট্রাস্টের' অর্থ শুধু বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে এবং গরিব ও মেধাবী মুসলমান ছাত্রদেরকে বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে শত শত দরিদ্র মেধাবী মুসলমান ছাত্র এ ট্রাস্ট থেকে বৃত্তি লাভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়ন করার সুযোগ পায়।

মুসলমানদের শিক্ষার জন্য হাজী মুহম্মদ মুহসীন হুগলি কলেজ ও হুগলি মাদরাসা স্থাপন করেন। এসব প্রতিষ্ঠান মুহসীনের সম্পত্তির আয় দিয়ে পরিচালিত হত। এছাড়া মুহসীন সকল ধর্মের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য করেন।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। এই দানশীল এবং পরোপকারী ব্যক্তি ১৮১২ সালে ইন্তেকাল করেন।

নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় মুসলমানরা তাদের ঐতিহ্য ও গৌরব হারাতে শুরু করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের জায়গায় হিন্দু জমিদারগণ ভূমির মালিকে পরিণত হন। ফারসির বদলে অফিসে-আদালতে ইংরেজি প্রবর্তন হওয়ার ফলে ইংরেজি ভাষা-বিরোধী মুসলমানরা সরকারি চাকরি হতে বঞ্চিত হন।

এছাড়া, ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য মুসলমানদের দায়ী করা হয়। মুসলমানরা সরকারের কোপানলে পড়ে। তাদের পঙ্গু করার জন্য শাসননীতি তৈরি করা হয়। এভাবে ইংরেজদের নীতি ও বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাব মুসলমান সম্প্রদায়কে চরম দুরবস্থায় ফেলে দেয়।

মুসলমান সমাজকে যুগের উপযোগী চিন্তাধারা ও শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে প্রথম এগিয়ে আসেন নওয়াব আব্দুল লতিফ। তিনি মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হন। নওয়াব আবদুল লতিফ অনুধাবন করেন, যদি ভারতীয় মুসলমানরা বিশেষ করে বাংলার মুসলমানরা ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতা না করে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণে পিছিয়ে পড়ে তাহলে বাংলার মুসলমান সমাজ কোনো দিনই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। মুসলমান সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নওয়াব আব্দুল লতিফ কঠোর পরিশ্রম করেন। বাংলার গণমানুষের জন্য তিনি যে সমস্ত সমাজ সংস্কারমূলক ও শিক্ষা বিস্তারমূলক কাজ করেন, সেজন্য তাঁকে বাংলার 'সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।



চিত্র ২.৫ : নওয়াব আব্দুল লতিফ

১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামে নওয়াব আব্দুল লতিফ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা মাদরাসায় আরবি শিক্ষার সাথে ইংরেজি ভাষা শিক্ষালাভ করেন। তিনি ফারসি ও উর্দু ভাষাও শিক্ষালাভ করেন। মাদরাসা শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কিছুদিন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৮৪৯ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬২ সালে বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৮৬৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত হন। ১৮৮৫ সালে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর অবদানের জন্য সরকার তাঁকে 'খান বাহাদুর' উপাধি প্রদান করে। বাংলার এই মনীষী ১৮৯৩ সালের ১০ই জুলাই ইন্তেকাল করেন।

শিক্ষা বিস্তারে অবদান : অধঃপতিত বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রসারে এবং সমাজ-সংস্কারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর চেষ্টায় কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় ইংরেজি ও ফারসি বিভাগ খোলা হয় এবং মাদরাসাকে এক উন্নত ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে মাদরাসা স্থাপিত হয়। এগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাও প্রবর্তন করা হয়। তিনি মুসলমানদেরকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কলকাতার হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং হিন্দু-মুসলিম সকলে সেখানে প্রবেশাধিকার পায়।

'মুহসীন ট্রাস্টের' টাকায় সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ উপকৃত হলেও মুসলমান ছাত্ররা বিশেষ উপকৃত হয়নি। 'মুহসীন ট্রাস্টের' সমুদয় অর্থ শুধু মুসলমান ছাত্রদের জন্য ব্যয় করার প্রস্তাব তিনি সরকারের কাছে পেশ করেন এবং এ ফান্ড পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করেন। নওয়াব আব্দুল লতিফের চেষ্টায় 'মুহসীন ট্রাস্টের' অর্থ শুধু বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে, বিশেষ করে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করার ব্যবস্থা হয়। গরিব ও মেধাবী মুসলমান ছাত্রদেরকে পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদানের জন্য নওয়াব আবদুল লতিফ ধনী মুসলমানদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য সরকার তাঁকে 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা' স্বর্ণপদকে পুরস্কৃত করেন।

মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি

১৮৬৩ সালে নওয়াব আবদুল লতিফ মুসলিম সাহিত্য সমাজ (মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি) প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের পশ্চিমা ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করা, তাদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো এবং তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমিতিতে মুসলমানদের শিক্ষা-সংক্রান্ত, সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যার ওপর আলোচনা হত। এ সমিতি মুসলমানদের ভাবধারার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় সাধনে বিশ্বাসী ছিল।

নওয়াব আবদুল লতিফ অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি দৃঢ় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ-বিদ্বেষ অনেক লাঘব হয়। বাংলার মুসলমানদের পুনর্জাগরণে নওয়াব আবদুল লতিফের ভূমিকা অনন্য।

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)

মুসলমানদের নবজাগরণের ইতিহাসে সৈয়দ আমীর আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ ও সমাজসংস্কারক। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলা সৈয়দ আমীর আলীর উদ্দেশ্য ছিল।

সৈয়দ আমীর আলী ১৮৪৯ সালের ৮ই এপ্রিল হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি হুগলি মাদরাসা ও কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৮৬৭ সালে এম. এ. পাস করেন। ১৮৬৮ সালে তিনি বি. এল. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি লন্ডনের 'লিঙ্কনস ইন' থেকে ১৮৭৩ সালে ব্যারিস্টারি পাস করেন।

দেশে ফিরে সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা শুরু করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে আইন-ব্যবসায় সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৮৭৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হন এবং একই সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৮৯০-১৯০৪ সাল পর্যন্ত সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী ১৯০৯ সালে লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এ পদে আসীন ছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম এ সম্মানের অধিকারী হন।



চিত্র ২.৬ : সৈয়দ আমীর আলী

সৈয়দ আমীর আলী একজন সুসাহিত্যিক ও যশস্বী লেখক ছিলেন। তিনি 'The spirit of Islam, A short History of the Saracens, Life and Teachings of the Prophet' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এসব রচনার উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য জগতের কাছে ইসলামের মূলনীতি ও ইসলামের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ প্রচার এবং ইসলামের অতীত গৌরবের কাহিনী তুলে ধরা। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আত্মচেতনা জাগিয়ে তোলাও এসব গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে ছিল।

সৈয়দ আমীর আলী, সৈয়দ আহমদ খান ও নওয়াব আবদুল লতিফের মতো পাশ্চাত্য-শিক্ষা গ্রহণ ও সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতিতে আস্থাবান ছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় তথা বাংলার মুসলমানরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাদের ন্যায্য অধিকার, দাবিদাওয়া আদায় করতে পারবে না। অধিকার আদায়ের জন্য এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন। এ উদ্দেশ্যে সৈয়দ আমীর আলী ১৮৭৭ সালে কলকাতায় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' (Central National Mohammedan Association) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

অল্প কয়েকবছরের মধ্যে বাংলা, বিহার, যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, চেন্নাই (মাদ্রাজ), মুম্বাই (বোম্বে) প্রভৃতি স্থানে এ সমিতির ৫০টি শাখা স্থাপিত হয়। সৈয়দ আমীর আলী ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমিতি ছিল মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান ত্রিশ বছর যাবৎ মুসলমানদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া সরকারের কাছে পেশ করে। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সৈয়দ আমীর আলী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানান। ১৯০৮ সালে তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের লন্ডন শাখা গঠিত হয়। লন্ডন থেকে তিনি মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবির সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। ১৯১২ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি লন্ডনে ব্রিটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই মহান ব্যক্তি ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ডে ইন্তেকাল করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন–

ক. রাজা রামমোহন রায় খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. নওয়াব আবদুল লতিফ ঘ. সৈয়দ আমীর আলী

২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন–

i. বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা থাকার জন্য
ii. বিশেষ পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের জন্য
iii. সংস্কৃত বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩–৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সতীদাহ প্রথা, শিক্ষা–সংস্কার, বিধবা–বিবাহ প্রথা ও ধর্ম–সংস্কারের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তবে বিধবা–বিবাহ প্রচলনের ক্ষেত্রে নারায়ণচন্দ্রের ভূমিকাও প্রশংসনীয়। রাজা রামমোহন রায় 'একেশ্বরবাদে' বিশ্বাসী ছিলেন।

৩। রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল–

i. ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা
ii. ইংরেজি শিক্ষার প্রসার
iii. সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. ii
গ. i ও ii　　ঘ. ii ও iii

৪। **নারায়ণচন্দ্র বিধবা বিবাহ করেন–**

ক. দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য　　খ. বিধবা–আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য
গ. বাবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য　　ঘ. সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য

৫। **একেশ্বরবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়–**

i. বেদান্তসূত্রের অনুবাদ
i. বেদান্ত কলেজ স্থাপন
iii. ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii
গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

করিম মিয়ার বয়স ৯০ বছর। এখনো যেন স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে সেসব দিনগুলো। তার নাতিরা তার কাছ থেকে সেসময় ইংরেজ–শাসন আমলের শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি এখনো বেশ সাবলীলভাবে নওয়াব আবদুল লতিফ, হাজী মু: মুহসীন ও সৈয়দ আমীর আলীর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন।

৬। **ইংরেজ–শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে–**

i. ভারতীয় মুসলমানরা তাদের ঐতিহ্য ও গৌরব হারায়
ii. মুসলমানদের জায়গায় হিন্দু জমিদারগণ ভূমির মালিকে পরিণত হয়
iii. ফারসির বদলে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন হয়

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii
গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৭। **মুহসীন ট্রাস্টের উদ্দেশ্য ছিল–**

ক. সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিস্তার
খ. দরিদ্র মুসলমান শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিস্তার
গ. ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজি–শিক্ষার সম্প্রসারণ
ঘ. দরিদ্র মেধাবী মুসলমান শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিস্তার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক স্বাধিকার আন্দোলন

১৮৫৭ সালের সংগ্রাম

১৮৫৭ সালের সংগ্রাম উপমহাদেশের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য এটা প্রথম সংগ্রাম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একশ বছরের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এ ছিল এক মহাবিদ্রোহ। তার আগে সংঘটিত ফকির-আন্দোলন, তিতুমীরের সংগ্রাম, ফরায়েজি আন্দোলন এ রকম সর্বভারতীয় রূপ নিতে পারেনি। জনগণের সমর্থনে সিপাহিদের এ মহাবিদ্রোহ ছিল দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটানো ছিল এ মহাবিদ্রোহের উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক কারণে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

রাজনৈতিক কারণ : কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদ নীতি এ সংগ্রামের প্রধান রাজনৈতিক কারণ। এ নীতি উপমহাদেশের সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও ব্যাপক আশঙ্কার সৃষ্টি করে। লর্ড ডালহৌসির স্বত্ব-বিলোপ নীতির ফলে সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এসব রাজ্যের রাজপরিবার, তাঁদের কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ইংরেজবিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ ক্ষমতাচ্যুত হলে তাঁর প্রজাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। কানপুরের নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়। একে একে মুসলিম ও হিন্দু রাজ্যের বিলোপ, উপাধিলোপ, বৃত্তিলোপ, ভারতীয়দের উচ্চ রাজপদ থেকে বিতাড়ন, সম্রাট বাহাদুর শাহকে পৈত্রিক রাজপ্রাসাদ হতে অপসারণ ইত্যাদি কার্যকলাপ এদেশবাসীর মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। দেশীয় রাজা, সিপাহি ও জনসাধারণ সকলেই ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তির সুযোগ খুঁজে। ঝাঁসির রানী ও নানা সাহেব এ সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।

অর্থনৈতিক কারণ : ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে উপমহাদেশের কুটিরশিল্প ধ্বংস হয় এবং অনেক শ্রমিক বেকার হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বহু জমিদার জমির মালিকানা লাভ করলেও সূর্যাস্ত আইন তাদের সর্বনাশ করে। বহু লাখেরাজ সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়। অনেক কৃষক ও বণিক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোম্পানির কর্মচারীদের সীমাহীন দুর্নীতির ফলে সাধারণ মানুষও অসন্তুষ্ট হয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ এ অবস্থার প্রতিকারের প্রত্যাশায় মহাবিদ্রোহে যোগ দেয়। দেশীয় সিপাহি ও ইংরেজ সিপাহিদের মধ্যে বেতনের বৈষম্যের জন্যও দেশীয় সিপাহিরা ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

সামাজিক কারণ : সমাজ-সংস্কার ও ব্রিটিশ সরকারের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে হিন্দু সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারাদি বিলুপ্ত হয়। সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ আইন পাস, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ, শিশুহত্যা নিবারণ ইত্যাদি সংস্কার সনাতন হিন্দুদের মনে তীব্র আঘাত দিয়েছিল এবং কোম্পানির শাসনের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা জন্মেছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ প্রবর্তন প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারমূলক কার্যাবলি ভারতীয়দের সন্দেহের উদ্রেক করে। দেশীয় সৈন্যের নিম্ন বেতন তাদের সামাজিক মর্যাদাক্ষুণ্ন করেছিল। ফারসি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা রাজভাষা হিসেবে প্রবর্তনের ফলে মুসলমানদেরকে সামাজিকভাবে হেয় করা হয়। এসব পরিস্থিতি ভারতীয়দের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং মহাবিদ্রোহের মূলে ইন্ধন যোগায়।

ধর্মীয় কারণ : ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিষ্টান মিশনারিরা প্রকাশ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করে। ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, ইংরেজ সরকার উপমহাদেশের সকল ধর্মের লোককে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করবে। মসজিদ-মন্দিরের খাস জমির ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে হিন্দু-মুসলমানদের মনে ইংরেজ সরকার ভীষণ আঘাত হানে। ১৮৫০ সালে আইন পাস করে ধর্মান্তরকারীদের পৈত্রিক সম্পত্তি লাভ করার অধিকার প্রদান করা হয়। এ সমস্ত কারণে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তীব্রতর হতে থাকে।

সামরিক কারণ : দেশীয় সিপাহিরা বিভিন্ন কারণে কোম্পানি সরকারের ওপর অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বেতন-ভাতা, পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈন্য ও দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বৈষম্য ছিল পর্বতপ্রমাণ। ১৮৫৬ সালে লর্ড ক্যানিং নতুন আইন পাস করেন যে, দেশীয় সিপাহিদের প্রয়োজনে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দূরদেশে যেতে হবে। সিপাহিরা এ আইনকে তাদের ধর্মের ওপর আঘাত বলে গণ্য করে। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইংরেজ সৈন্য সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয় দেশীয় সিপাহিদের অনুপ্রাণিত করেছিল এবং ইংরেজদের অতি সহজেই এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে- এ আত্মবিশ্বাস দেশীয় সিপাহিদের মনে বদ্ধমূল হয়।

আশু বা প্রত্যক্ষ কারণ : ১৮৫৬ সালে 'এনফিল্ড' নামে একপ্রকার বন্দুকের ব্যবহার চালু করা হয়। এ বন্দুকের কার্তুজ দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ব্যবহার করতে হত। গুজব রটে যে; এ কার্তুজ শুয়োর ও গরুর চর্বি দিয়ে তৈরী। হিন্দু মুসলমান সিপাহিদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল যে, তাদের ধর্ম বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য ইংরেজ সরকার এ কার্তুজ প্রচলন করে। এ কারণে সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয় এবং দেশময় স্বাধীনতার সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে।

সংগ্রামের বিস্তার

সংগ্রাম শুরু হয় বাংলায়। ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে সংগ্রাম শুরু হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, বহরমপুরসহ বাংলার বিভিন্ন জায়গায় অভ্যুত্থান ঘটে। বিপ্লব ক্রমে মিরাট, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, ঝাঁসি, বেরেলি, অযোধ্যা, রোহিলাখন্ড প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। গোয়ালিয়র, হায়দারাবাদ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য এ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি, বরং তারা ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিল।

এ সংগ্রাম সিপাহিদের বিদ্রোহ দিয়ে শুরু হলেও এর পেছনে জনসাধারণের সমর্থন ছিল। এ সংগ্রাম রাজনৈতিক স্বাধীনতারও সংগ্রাম ছিল। সৈন্যবাহিনীর বাইরে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন ও সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অযোধ্যা ও বিহারের জনসাধারণ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং অনেকদিন ধরে সংগ্রাম করে। বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন জন সংগ্রামে সক্রিয় হলেও ইংরেজ বিতাড়নে সকলেই একমত ছিল। এ অবস্থায় একে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যায়। প্রথম দিকে এ সংগ্রাম আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এতে ইংরেজ-শাসনের ভিত নড়ে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। এ সংগ্রাম সুপরিকল্পিতভাবে সুযোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়নি। উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, শক্তিশালী সংগঠনের অভাব, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে একতার অভাব, সংহতি ও সর্বভারতীয় আদর্শের অভাব ছিল। বিদ্রোহীরা বহু স্থানে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন হতে বঞ্চিত ছিল। বিদ্রোহীদের তুলনায় ইংরেজ সেনাপতিরা ছিলেন অধিক দক্ষ, রণকুশলী ও নিষ্ঠাবান।

এ সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালের জন্য সকল সংগ্রামের সূচনা হিসেবে এটা কাজ করেছে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের এ ব্যাপক সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা লাভের এ প্রচেষ্টা ১৯৪৭ সালে বাস্তবায়িত হয়।

ঐতিহাসিকদের মতামত

ভারতীয়দের এ স্বাধীনতা সংগ্রামকে কোনো কোনো ইংরেজ ঐতিহাসিক 'সিপাহি বিদ্রোহ' নামে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক জে. বি. নটন, ড: মজুমদার প্রমুখ এ আন্দোলন সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে এটা বিদ্রোহ আকারে শুরু হলেও পরে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। সাভারকর বলেন, '১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় সংগ্রাম'। সুরেন্দ্রনাথ সেন মন্তব্য করেছেন, '১৮৫৭ সালের আন্দোলন প্রথমে সিপাহিদের বিদ্রোহরূপে শুরু হয়েছিল, কিন্তু সর্বত্র এ বিদ্রোহ সিপাহিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না'। ঐতিহাসিক Kaye এবং Malleson বলেন, 'এ বিদ্রোহ ছিল গণবিদ্রোহের প্রতীক'।

সংগ্রামের ফলাফল

এ সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও এটা ভারতের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে। এ সংগ্রামের ফলে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। ভারত ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চলে যায়। ১৮৫৭ সালে ভারত শাসনের জন্য নতুন আইন পাস হয়। গভর্নর জেনারেল, ভাইসরয় উপাধিতে ভূষিত হন। এর ফলে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রসার ঘটে। 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' অ্যাক্ট দ্বারা ভারতীয়দের জন্য সরকারি উচ্চপদ সংরক্ষিত হয়। সবচেয়ে বড় সাফল্য এই যে এ সংগ্রাম ছিল দেশপ্রেম ও প্রগতিশীলতার পরিচায়ক।

সৈয়দ আহমদ খান

স্যার সৈয়দ আহমদ ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক ব্যক্তিত্ব। তিনি চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, ধার্মিক, দেশপ্রেমিক এবং জনদরদী ছিলেন। তিনিও বাংলার নওয়াব আবদুল লতিফের ন্যায় মুসলিম নবজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন। তিনি ছিলেন আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। সৈয়দ আহমদ খান ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের সময় তিনি সরকারের প্রতি অনুগত ছিলেন। তাঁর আনুগত্যের জন্য সরকার তাঁকে পুরস্কৃত করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের দমন ও নির্যাতনে মুসলমান জাতি যখন চরমভাবে নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত তখন তিনি জাতির ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হন।



চিত্র ২.৭ : স্যার সৈয়দ আহমদ

মুসলমান সমাজের দুঃখ, দুর্দশা ও দুর্গতি তাঁকে চরমভাবে ব্যথিত করে। তিনি উপলব্ধি করেন, মুসলমানদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ঘৃণা ও উদাসীনতা তাদের দুঃখ-দৈন্যের কারণ। তিনি বুঝতে পারেন, ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ব্যতীত মুসলমানদের উন্নতির কোনো বিকল্প পথ নেই। পাশ্চাত্য-শিক্ষা ব্যতীত রাজনৈতিক অধিকার লাভ করাও তাদের জন্য সম্ভব নয়। তাই তিনি মুসলমান সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে ব্রতী হন এবং বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

আলীগড় আন্দোলন

শিক্ষাক্ষেত্রে সৈয়দ আহমদের প্রচেষ্টা ছিল মুসলমান সমাজকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামী দূর করে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মুসলমান সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই প্রগতিমূলক ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য সৈয়দ আহমদ যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তা আলীগড় আন্দোলন নামে সুপরিচিত। তিনি মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও পাশ্চাত্য-ভাবধারা প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৮৫৭ সালে আলীগড়ে প্রথমে 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। এ স্কুলের পাঠ্যক্রম কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড কলেজের অনুকরণে প্রণীত হয়েছিল। এ স্কুল ধীরে ধীরে কলেজ এবং কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তিনি 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। এ সংস্থার কাজ ছিল আলীগড় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রচার করা। এভাবে তিনি আলীগড় আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

আদর্শ ও উদ্দেশ্য : আলীগড় আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ :

১। মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো।

২। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত হওয়া এবং সরকারের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা।

৩। মুসলমানদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।

৪। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করা।

৫। বিশ্বসভ্যতায় মুসলমানদেরকে তাদের অবদান সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদেরকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিতেন। সে জন্য ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর কংগ্রেসে যোগ দিতে তাদের নিষেধ করেন।

আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। এ আন্দোলনের ফলে ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ইংরেজি ও পাশ্চাত্য-শিক্ষা গ্রহণ করে সরকারি চাকরির সুযোগ পায়। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও ব্রিটিশ সহযোগিতার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এ আন্দোলন মুসলমান সমাজের মধ্যে ইংরেজ-শাসনের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে এবং কংগ্রেসের প্রভাব থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। এ আন্দোলনের ফলেই মুসলিম লীগ জন্মলাভ করে। এ আন্দোলনই পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতার পটভূমি তৈরি করে। আলীগড় আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ অবদান মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়বোধের বিকাশ ঘটানো।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫)

উনিশ শতকে বাংলা তথা সমগ্র ভারতে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রসারের ফলে একটি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে ওঠে। এ শ্রেণী সভ্যতা ও রাজনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের ফলে তাঁদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হয়। এ শ্রেণী নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অধিকার আদায়, ভারতীয়দের অভাব অভিযোগ, দাবিদাওয়া সরকারের কাছে পেশ করার জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনে অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন, স্বায়ত্তশাসন অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে তারা উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।

এ পরিস্থিতিতে অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত ভারত-দরদী সিভিলিয়ান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর মুম্বাইতে (বোম্বে) বাঙালি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সত্তর জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। এ অধিবেশনে কয়েকটি উদ্দেশ্য স্থির করা হয়-

১। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিকের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সংহতি স্থাপন করা।

২। দেশের স্বার্থে নিবেদিত ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ ও মৈত্রী গঠন করা।

৩। সামাজিক সমস্যাগুলো লিপিবদ্ধ করা এবং

৪। রাজনীতিবিদদের নীতি ও লক্ষ্য স্থির করা।

প্রথমদিকে কংগ্রেসের সদস্যরা ছিলেন মধ্যপন্থী এবং উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করা এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের কাছে দাবি-দাওয়া পেশ করা। পরে এ প্রতিষ্ঠান ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে জাতীয় কংগ্রেস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মুসলিম লীগ (১৯০৬)

পটভূমি : ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা ও ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ের জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু বিক্ষোভ মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। এ সময় কংগ্রেস যে ভূমিকা পালন করে তাতে কংগ্রেস মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে–এ বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়।

১৯০৬ সালে ১লা অক্টোবর ৩৫ জন মুসলিম নেতার সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দল তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিন্টোর সাথে সিমলায় সাক্ষাৎ করেন। এটি সিমলা ডেপুটেশন নামে পরিচিত। এ সাক্ষাৎকারে মুসলমানদের জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে স্বতন্ত্র নির্বাচন এবং সামরিক, বেসামরিক সকল চাকরিতে ব্যাপক হারে মুসলমানদের নিয়োগ করার দাবি জানানো হয়। কিন্তু হিন্দু নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের দাবিগুলোর নিন্দা করে। এই বৈঠকের পর মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন।



চিত্র ২.৮ : নওয়াব সলিমুল্লাহ

১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শেষে নবাব ভিকারুল মূলক- এর সভাপতিত্বে একটি রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণের পর নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রস্তাব করেন যে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ঐদিনই নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ছিল তিনটি।

১। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা ও সরকারের সঙ্গে সকল ভুল-বুঝাবুঝির অবসান করা।

২। মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা এবং মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের কথা সরকারের কাছে ব্যক্ত করা।

৩। মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্ভাব বজায় রাখা। বস্তুত মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যেই মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গ বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ ঘটনা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বাংলা প্রদেশকে ভাগ করে দুইটি আলাদা প্রদেশ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৮৫৪ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর ও আসাম নিয়ে গঠিত হয়েছিল বাংলা প্রেসিডেন্সি। একজন গভর্নরের পক্ষে এত বড় প্রদেশ শাসন করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার ছিল। তাই লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর উত্তর ও পূর্ব বাংলাকে আসামের সাথে যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে এক নতুন প্রদেশ গঠন করেন। নতুন প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। নতুন প্রদেশের প্রথম ছোটলাট হলেন ব্যামফিল্ড ফুলার। অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে অন্য প্রদেশ গঠিত হয়। প্রশাসনিক সুবিধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা বঙ্গভঙ্গের মূল ও প্রাথমিক কারণ। প্রশাসনিক কারণ ছাড়া বঙ্গভঙ্গের পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল।

রাজনৈতিক কারণ : পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রসারের ফলে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। এসব আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। ঢাকাকে রাজধানী করে সরকার এ আন্দোলনকে স্তিমিত করতে সচেষ্ট হয়।

সামাজিক কারণ : স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ব্রিটিশ সরকার এদের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তে বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন দান করে।

অর্থনৈতিক কারণ : প্রাদেশিক রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছিল। শিক্ষা-দীক্ষা, পূর্ববঙ্গে উৎপাদিত পাট দিয়ে পাটকলগুলো স্থাপিত হয়েছিল কলকাতার আশেপাশে। এছাড়া শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সব ক্ষেত্রে বঞ্চিত ছিল পূর্ববঙ্গ। এ প্রদেশের অধিবাসীরা কলকাতার জমিদার, আমলা ও আইনজীবীদের শোষণের শিকার হয়।

এ সমস্ত কারণে লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে প্রদেশটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। নতুন প্রদেশ হলে দুই প্রদেশেরই শিক্ষা, যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। সে জন্য ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়।

ফলাফল

ঢাকা হল নতুন প্রদেশের রাজধানী এবং নতুন প্রশাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। এখানে গড়ে উঠল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাইকোর্ট, অফিস-আদালত, প্রেস ইত্যাদি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাধিত হল অভূতপূর্ব উন্নতি। এ জন্যই বঙ্গভঙ্গকে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজ স্বাগত জানায়। বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরেই ঢাকায় সুরম্য অট্টালিকা, হাইকোর্ট, সেক্রেটারিয়েট, কার্জন হল প্রভৃতি নির্মিত হতে থাকে। নতুন উদ্দীপনায় পূর্ব বঙ্গবাসী নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে ব্রতী হয়।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন : বাঙলার হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গকে সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা শুরু করেন। জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গ রদ করতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিণ পাল প্রমুখ নেতৃবর্গ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। মুসলমানদের শোষণ করা অবসান হয়ে যাবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে ভেবে কলকাতার বণিক, ব্যবসায়ী, জমিদার, আইনজীবী সকল সম্প্রদায়ের লোক হিন্দু নেতৃবৃন্দকে এ আন্দোলনে সমর্থন দেন। ক্রমে ক্রমে এটা সম্প্রদায়িক আন্দোলনে রূপ নেয়। পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা নবগঠিত প্রদেশটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রূপ নেয় ও স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলন : বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন প্রতিবাদের পর্যায় অতিক্রম করে 'বয়কট' আন্দোলনে পরিণত হয়। এ আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রমুখ নেতৃবর্গ অংশগ্রহণ করেন। এ আন্দোলনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, (১) সকল অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট পদত্যাগ করবেন, (২) স্থানীয় সরকারের সকল সদস্য পদত্যাগ করবেন এবং (৩) আগামী এক বছরকাল জাতীয় শোক দিবস পালন করা হবে। বিলেতি পণ্যসামগ্রীর বিরুদ্ধে 'বয়কট' প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কটও শুরু হয়। ধোপা, নাপিত, মুচি প্রভৃতি সমাজসেবীরা ইংরেজদের কোনোরূপ সেবা প্রদান করবে না। এ আন্দোলনে ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল- (১) ম্যাঞ্চেস্টারে প্রস্তুত সুতিবস্ত্র 'বয়কট' করা এবং (২) মৃতপ্রায় শিল্পগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা। এ আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন স্থানে কুটিরশিল্প এবং বৃহদায়তন শিল্প গড়ে ওঠে।

সন্ত্রাসী আন্দোলন : স্বদেশী আন্দোলনের চরমপন্থীদের প্রচেষ্টায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সন্ত্রাসী আন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন পুলিন দাস ও পুতুল গাঙ্গুলী। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সারাদেশে অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ এবং রাজনৈতিক হত্যা। গভর্নর ফুলার সাহেবকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কুমিল্লায় নবাব সলিমুল্লাহর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে প্রহার করা হয়। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদ

অবশেষে বর্ণবাদী ও কায়েমী স্বার্থবাদী হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতা, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় অংশগ্রহণ, স্বদেশী আন্দোলন, উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং সন্ত্রাসবাদীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে বিশাল সাম্রাজ্যবাদী এবং শক্তিশালী ব্রিটিশরাজ হিন্দুদের কাছে নতি স্বীকার করে বঙ্গভঙ্গ রদের পরিকল্পনা রচনা করেন।
বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য স্যার জন জেনকিনস নতুনভাবে বাংলাদেশ পুনর্গঠনের প্রস্তাব করেন। নতুন পরিকল্পনা অনুসারে প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম–এ পাঁচটি বাংলা-ভাষাভাষী বিভাগ নিয়ে বাংলা প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করা হয়। নতুন বাংলা প্রদেশের রাজধানী হয় কলকাতা।

১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্য অভিষেক উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার ফলে ঢাকা শহর হারায় তার রাজধানীর গৌরব। বাংলা-ভাষাভাষী পাঁচটি বিভাগ নিয়ে গঠিত হয় নতুন বাংলা প্রদেশ।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া

বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণায় সকল শ্রেণীর হিন্দুরা খুব উল্লসিত হন। পূর্ব বাংলার মুসলমানেরা হতাশ হয়ে পড়েন এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। পূর্ব বাংলার মুসলমানদেরকে শান্ত করার জন্য বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ আশ্বাস দেন যে, ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি সংস্থা গঠন করেন। বাংলার অনেক হিন্দু এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ দেখা দেয়।

খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯)

বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের মনোভাব প্রবল। ভারতীয় মুসলমানগণ এর ব্যতিক্রম ছিল না। তারা তুরস্কের সুলতানকে খলিফা বলে মান্য করত এবং মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতীক বলে মনে করত। খিলাফতের প্রতি কোনো রকম অবমাননা মুসলমানদের ব্যথিত করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষ নিয়ে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় ভারতীয় মুসলমানরা দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হয়। একদিকে তুরস্কের সুলতানের প্রতি ধর্মীয় আনুগত্য, অপর দিকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার অর্থ তুরস্কের প্রাচীন ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খিলাফত প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা।

ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের মনোভাব উপলব্ধি করে আশ্বাস দিয়েছিল যে, তারা তুরস্কের কোনো ক্ষতি করবে না। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দেওয়া হবে। এসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্রিটিশ সরকার এদেশের মুসলমানের অর্থনৈতিক ও নৈতিক সাহায্য পেয়েছিল।



চিত্র ২.৯ : মাওলানা মুহম্মদ আলী

যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়ের ফলে ব্রিটিশরা তুরস্কের ক্ষতি সাধন করে। তুরস্ককে ভেঙে চুরমার করে মুসলমানদের মনে এক প্রবল আঘাত হানে। এ কারণে তাদের মনে আগুন জ্বলে ওঠে। তুর্কী সাম্রাজ্যের অখন্ডতা এবং খিলাফতের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য ১৯১৯ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতৃবর্গ যে আন্দোলন শুরু করেন তা খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত।

খিলাফতের প্রথম অধিবেশন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে তুরস্কের অখণ্ডতা ও খলিফার মর্যাদা রক্ষার দাবি করা হয়। খিলাফতের দ্বিতীয় অধিবেশন লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা শওকত আলী। এ অধিবেশনে তুরস্ক ও খলিফার ব্যাপারে মুসলমানদের মনোভাব জানাবার জন্য বড়লাট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। খিলাফতের ব্যাপারে বড়লাট তাঁদেরকে কোনোরূপ আশ্বাস দিতে অসমর্থ হন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে খিলাফত প্রতিনিধিগণ ব্যর্থ হন।

তুরস্কের ওপর সেভার্স চুক্তি চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে মুসলমানগণ ৩১শে আগস্ট খিলাফত দিবস পালন করেন। খিলাফত কমিটিতে অসহযোগ কর্মসূচি গৃহীত হয়। খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ সম্মিলিতভাবে আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্বেই কয়েকটি মর্মান্তিক ঘটনার জন্য গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেন। কিন্তু আলী ভ্রাতৃদ্বয় খিলাফত আন্দোলন চালিয়ে যান। অবেশেষ ১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের খিলাফত উঠিয়ে দিয়ে সাধারণতন্ত্র প্রচলন করলে খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

ফলাফল : খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এ আন্দোলন মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করে তোলে। এ আন্দোলন মুসলমানদেরকে গণআন্দোলনের উপায় শিক্ষা দেয়, বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে একতার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। এ আন্দোলন পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তি বৃদ্ধি করে।

অসহযোগ আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধী অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক। এ একটি উল্লেখযোগ্য নিরস্ত্র বা 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন। অসহযোগের মাধ্যমে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে সরকারকে দাবি মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য সর্বপ্রকার অসহযোগিতা করাই এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল।

১৯১৯ সালে 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার আইন' এ দেশবাসী গ্রহণ করেনি। ভারতের সকল রাজনৈতিক দল এ শাসন-সংস্কার আইনকে অসম্পূর্ণ, অসন্তোষজনক এবং নৈরাজ্যজনক বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে 'রাওলাট আইন' নামে এক দমনমূলক আইন বিধিবদ্ধ হয়। এ আইনের ফলে সরকার যেকোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখতে পারতেন। এ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বিভিন্ন স্থানে হরতাল, শোভাযাত্রা, প্রতিবাদ সভা পালিত হয়।



চিত্র ২.১০ : মহাত্মা গান্ধী

এসব পরিস্থিতিতে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯২০ সালে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাব পাস ও অনুমোদিত হয়। প্রথমদিকে গান্ধী এ আন্দোলনে 'সত্যাগ্রহ' নীতি গ্রহণ করেন। হিন্দু-মুসলিম একতাবদ্ধ হয়ে অসহযোগ আন্দোলনকে তীব্র করে তোলে। এ আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সরকারি খেতাব ও অবৈতনিক পদ বর্জন করা, সরকারে বেসরকারি পদগুলো থেকে ইস্তফা দেওয়া, পুলিশ ও সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ এবং খাজনা বন্ধ করা। ছাত্রছাত্রীরা স্কুল, কলেজ বর্জন করেছিল। দেশবাসী বিলেতি দ্রব্যও বর্জন করেছিল। মতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ আইনজীবীগণ আইন-ব্যবসা ত্যাগ করেন।

১৯২১ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন যৌথ আন্দোলনের রূপ নেয়। এ মিলিত আন্দোলন সারা ভারতে এক গণআন্দোলনে পরিণত হয়। উভয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল খেলাফত রক্ষা ও ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলন সশস্ত্র রূপ নেয়। লর্ড রিডিং কঠোর হস্তে এ আন্দোলন দমন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে গুলি ও লাঠি ব্যবহার করেন। এক পর্যায়ে উত্তেজিত জনতা চৌরিচৌরা থানায় আগুন লাগিয়ে ২১ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। এ ঘটনায় গান্ধী মর্মাহত হন এবং অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

এ আন্দোলন দেশপ্রেমের জন্ম দেয়। জনসাধারণের মধ্যে অভাবনীয় জাগরণ সৃষ্টি করে। এ আন্দোলন সকল ধর্মের ভারতবাসীকে একই জাতীয়তাবোধের আদর্শে সংঘবদ্ধ করে।

মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন, ১৯০৯

১৮৫৮ সালের পর থেকে যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আইন প্রবর্তন হয়, তার মধ্যে ১৯০৯ সালের সংস্কার আইন বেশ উল্লেখযোগ্য। এ আইনের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে দেওয়া হল :

১. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৬ থেকে ৬০ জনে উন্নীত করা হয়।

২. গভর্নর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদে চার শ্রেণীর সদস্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়। যথা,

(ক) পদাধিকার বলে সদস্য; (খ) মনোনীত সরকারি সদস্য; (গ) মনোনীত বেসরকারি সদস্য এবং

(ঘ) নির্বাচিত সদস্য।

৩. এ আইনের মাধ্যমে পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।

৪. মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়।

৫. এ আইনের ফলে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থার ধারণা স্বীকৃত হয়।

ভারত শাসন আইন, ১৯১৯

১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনের পর থেকে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস দায়িত্বশীল শাসন কায়েমের ওপর জোরালো দাবি জানায়। ফলে ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড ভারত শাসন-সংস্কার আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

১. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা : এ আইনের মাধ্যমে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ সৃষ্টি করা হয়। উচ্চ পরিষদকে রাষ্ট্রীয় পরিষদ এবং নিম্ন-কক্ষকে ব্যবস্থাপক সভা বলা হয়।

২. প্রদেশে দ্বৈতশাসন : এ আইন দ্বারা প্রদেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে ‘সংরক্ষিত’ ও ‘হস্তান্তরিত’– এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

৩ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন : এ আইনের মাধ্যমে প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়।

৪. পৃথক নির্বাচন : এ আইন দ্বারা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা হয়।

৫. যুক্তরাষ্ট্রীয় : এ আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

৬. আইনসভার সীমাবদ্ধতা : এ আইনের ফলে আইন পরিষদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কর ধার্য ও ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেলের অপরিসীম ক্ষমতা রাখা হয়।

৭. শাসন পরিষদ : গভর্নর জেনারেলকে সহায়তা করার জন্য ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট একটি শাসন পরিষদ গঠন করা হয়।

৮. ক্ষমতা বণ্টন : পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, যোগাযোগ, মুদ্রা ইত্যাদি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। প্রাদেশিক বিষয়ের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা, বিচার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষি বিষয় প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

৯. সংসদীয় সরকার : এ আইনে প্রদেশগুলোতে সীমিত আকারে সংসদীয় সরকার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

১০. হাই কমিশনার পদ : এ আইনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে “ভারতীয় হাই কমিশনার” পদের সৃষ্টি করা হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে দেওয়া হল–

১. **যুক্তরাষ্ট্র গঠন :** ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতের সকল প্রদেশ ও ইচ্ছুক রাজ্যগুলোকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রবর্তনের পরিকল্পনা করা হয়।

২. **প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন :** এ আইনের মাধ্যমে প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়। এর ফলে প্রদেশগুলো সুনির্ধারিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় এবং প্রদেশসমূহে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তিত হয়। প্রাদেশিক সরকার ও পরিষদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ সীমিত করা হয়।

৩. **ক্ষমতা বণ্টন :** এ আইন দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং প্রাদেশিক বিষয়গুলো প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। যুগ্ম বিষয়গুলো কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের শাসনাধীনে আনা হয়।

৪. **দ্বৈত শাসন :** এ আইনে কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করা হয় এবং প্রদেশ থেকে দ্বৈত শাসন বিলোপ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়সমূহ সংরক্ষিত এবং হস্তান্তরিত- এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ধর্মীয় বিষয়সমূহ এবং উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকার শাসনভার সংরক্ষিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অপরপক্ষে আইন-শৃঙ্খলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৫. **দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা :** এ আইনে কেন্দ্রে উচ্চ পরিষদ ও নিম্ন পরিষদ নামে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সভার প্রবর্তন করা হয়। বাংলা, মুম্বাই (বোম্বে), চেন্নাই (মাদ্রাজ), যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও আসাম প্রদেশেও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভার প্রবর্তন করা হয়। অন্যান্য প্রদেশে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা রাখা হয়।

৬. **যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত :** এ আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।

৭. **পৃথক নির্বাচন ও সংরক্ষণ :** এ আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন চালু রাখা হয় এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়।

৮. **গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নর :** এ আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতা একজন গভর্নর জেনারেল এবং প্রাদেশিক সরকারের শাসনক্ষমতা একজন প্রাদেশিক গভর্নরের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

৯. **উপদেষ্টা বোর্ড গঠন :** এ আইনের ফলে ভারত-সচিবের ঐতিহাসিক কাউন্সিলের বিলুপ্তি ঘটে এবং এর স্থলে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করা হয়।

১০. **নতুন প্রদেশ সৃষ্টি :** এ আইন অনুযায়ী সিন্ধু ও উড়িষ্যা নামে দুইটি প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়।

১১. **মায়ানমার (বার্মার) পৃথকীকরণ :** এ আইন দ্বারা মায়ানমার (বার্মা)-কে ভারত থেকে পৃথক করা হয়।

১২. **সংবিধান সংশোধন :** এ আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে ভারতীয় শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

১৩. **শাসন-বিভাগীয় প্রাধান্য :** এ আইনের ফলে শাসন-বিভাগীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রে গভর্নর জেনারেল এবং প্রদেশে প্রাদেশিক গভর্নরের হাতকে শক্তিশালী করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্থ প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। সকল কাজের জন্য প্রাদেশিক শাসন বিভাগ আইনসভার কাছে দায়ী থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে প্রাদেশিক সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা করা হল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমত, সংবিধান অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রদেশ আত্মনির্ভরশীল হবে।

১৯৩৫ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কার্যকারিতা

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বাস্তবে প্রদেশগুলোতে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গভর্নর জেনারেলের আদেশ-নির্দেশ পালনই ছিল প্রাদেশিক গভর্নরের প্রধান কাজ। গভর্নরগণ ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতিনিধি বলে প্রাদেশিক আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না। ভারত সচিব প্রাদেশিক গভর্নরদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। আইনসভার সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সীমিত ছিল। আই. সি. এস (I.C.S) এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের কোনো ক্ষমতা ছিল না। গভর্নরগণ গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। গভর্নর জেনারেল প্রাদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন এবং জরুরি পরিস্থিতিতে প্রদেশে কেন্দ্রীয় আইন জারি করতেন। যেকোনো অজুহাতে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও আইনসভা ভেঙে দিতে পারতেন। বাস্তবক্ষেত্রে এসব পরিস্থিতির জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে প্রবর্তিত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে, ১৯৩৫ সালের আইন প্রদেশে যথেষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

প্রাদেশিক নির্বাচন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ সালে কার্যকর হয়। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান তিনটি দল যথা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টি অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৪০টি আসনে, কৃষক-প্রজা পার্টি ৩৫টি আসনে, স্বতন্ত্র মুসলমান ৪১টি আসনে এবং স্বতন্ত্র হিন্দু ১৪টি আসনে বিজয়ী হয়। স্বতন্ত্র মুসলমান সদস্যের মধ্যে কয়েকজন মুসলিম লীগে ও কয়েকজন কৃষক-প্রজা পার্টিতে যোগ দেন। ফলে মুসলিম লীগের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০টি এবং কৃষক-প্রজা পার্টির আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৫টিতে।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কোনো একক রাজনৈতিক দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এ. কে. ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

কংগ্রেস মুসলিম লীগ অথবা কৃষক-প্রজা পার্টির সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে অসম্মতি জানায়। শেষ পর্যন্ত এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, নবাব হাবিবুল্লাহ, খাজা নাজিমউদ্দীন, মোশারফ হোসেন, স্যার নলিনীরঞ্জন সরকার প্রমুখ সদস্য নিয়ে হক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। হক সাহেব হলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মন্ত্রিত্বকালে বেশ কয়েকটি জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন হয়। ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা বাংলার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। তাঁর নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসন বহুলাংশে কার্যকর হয়।



চিত্র ২.১১ : এ, কে ফজলুল হক

কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য হক মন্ত্রিসভা ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইন প্রণয়ন করে। এ মন্ত্রিসভা প্রায় ৬০ হাজার ঋণ সালিশী বোর্ড স্থাপন করে। এ বোর্ডগুলোর কাজ ছিল ঋণ-খাতকদের সুবিধাজনক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেওয়া। কৃষি-খাতক আইন দ্বারা প্রজাদের ওপর জমিদারের অত্যাচার শোষণ বন্ধ করা হয়। এ আইনের ফলে ভূমিকর বৃদ্ধি করা এবং প্রজার জমি দখল করা বন্ধ হয়ে যায়।

হক মন্ত্রিসভা বঙ্গীয় কুসিদজীবী (Bengal Money Lenders Act) আইন তৈরি করে। এ আইন সুদের ব্যবসা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে কৃষকসমাজ বেশ উপকৃত হয়।

হক মন্ত্রিসভা শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। হক মন্ত্রিসভা মাদরাসা শিক্ষা পুনর্গঠন করে। ফজলুল হক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রত্যেক জেলায় স্কুল বোর্ড স্থাপন করেন। ঢাকার কৃষি কলেজ ও বরিশালের চাখার কলেজ স্থাপন হক সাহেবের কৃতিত্ব। মুসলমানদের নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য ঢাকায় ইডেন গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য ১৯৪০ সালে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা বিল প্রণয়ন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব হতে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ওপর হস্তান্তরিত হলে হিন্দুদের প্রাধান্য নষ্ট হয়ে যাবে, এ অজুহাতে কয়েকজন হিন্দুনেতা শিক্ষা বিলের বিরোধিতা করেন।

হক সাহেব সরকারি চাকরির শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ করেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ ব্যবস্থা তদারক করার জন্য একজন সাম্প্রদায়িক অনুপাত কর্মকর্তা (Communal Ratio Officer) নিয়োগ করা হয়। হিন্দুদের প্রাধান্য হ্রাস করার জন্য ফজলুল হক কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আইন সংশোধন করেন।

হক মন্ত্রিসভার কৃতিত্বের ফলে বাংলার মুসলমানদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। প্রজাগণ জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়। জমির ওপর তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পায়।

এ. কে. ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১ - ১৯৪৩)

১৯৪১ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। এ বছরেই নভেম্বরে তিনি 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি' গঠন করেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি হিন্দু-মুসলিম নেতা ড: শ্যামাপ্রসাদের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভা শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা নামে পরিচিত। শ্যামা-হক মন্ত্রিসভাকে মুসলিম লীগ সুনজরে দেখেনি। এ মন্ত্রিসভা দমনমূলক কতকগুলো বিধি জারি করলে জনপ্রিয়তা হারায়। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুনেতাদের সংকীর্ণতা ও অদূরদর্শিতা শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পতনকে ত্বরান্বিত করে।

এরপর প্রথমে খাজা নাজিমউদ্দীন এবং পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত বিভক্ত হওয়া পর্যন্ত মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন ছিল।

লাহোর প্রস্তাব

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের এক বিশেষ অধিবেশনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন বাংলার কৃতী সন্তান শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। এ প্রস্তাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যেসব স্থানে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম। নব-গঠিত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে। আঞ্চলিক স্বাধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং সার্বভৌমত্ব অর্জনই ছিল লাহোর প্রস্তাবের মূলকথা।

এখানে উল্লেখ্য যে, লাহোর প্রস্তাবে একাধিক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল। পরবর্তীকালে একাধিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে একটি রাষ্ট্র পাকিস্তান স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। লাহোর প্রস্তাবের পূর্বে কবি ও দার্শনিক ড: মুহম্মদ ইকবাল প্রথম স্বতন্ত্র মুসলিম আবাসভূমির কথা বলেছিলেন। ১৯৩৩ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রহমত আলী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকার জন্য পাকিস্তান নামের উদ্ভাবন করেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কার্যকলাপ ও মুসলিম লীগের প্রতি উপেক্ষা ও অসহযোগিতা মুসলমানদের ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং ১৯৩৯ সালে মি: জিন্নাহ তাঁর 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' ঘোষণা করেন। এ পটভূমিতে মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করে।

লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর মুসলিম লীগ আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কংগ্রেস নেতৃবর্গ লাহোর প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন। তাঁরা মুসলমানদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিকে অবাস্তব বলে আখ্যায়িত করেন।

ক্রিপস মিশন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলে জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে এদেশবাসীর সাহায্য সহযোগিতা লাভ করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ১৯৪২ সালে এ উপমহাদেশে প্রেরণ করেন। তিনি ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যে কয়টি প্রস্তাব করেন, তা ক্রিপস প্রস্তাব নামে খ্যাত।

ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ক্রিপস রিপোর্টে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। যুদ্ধের অবসান হলে এদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে এদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নের প্রস্তাবও রাখা হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় যেকোনো প্রদেশের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের প্রশ্নে কংগ্রেস বিরোধিতা করে। স্বাধীনতা প্রদানের কোনো উল্লেখ না থাকায় মুসলিম লীগও ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

ভারত ছাড় (Quit India) আন্দোলন

ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়' দাবিতে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার দমননীতি অবলম্বন করে অনেক কংগ্রেস নেতা ও কর্মীকে বন্দী করে। ফলে উপমহাদেশে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করে।

মন্ত্রী মিশন ১৯৪৬

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এটলী ১৯৪৬ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। নির্বাচনের পর ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার তিন জন সদস্যকে ভারতে প্রেরণ করেন। এ তিন জন মন্ত্রীবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল মন্ত্রী মিশন নামে অভিহিত। এ সময়ে কংগ্রেস অখণ্ড ভারত নীতিতে অটল থাকে, আর মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির ব্যাপারে কোনো রকম আপোস করতে সম্মত হয়নি।

মন্ত্রী মিশনকে পাকিস্তান দাবির যৌক্তিকতা বোঝানোর জন্য ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে জিন্নাহ দিল্লীতে মুসলিম লীগের নির্বাচিত সদস্যদের এক সম্মেলন আহবান করেন। সেখানে ভাবী পাকিস্তানের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয় এবং সদস্যরা পাকিস্তান অর্জনের জন্য তাঁদের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন। বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলো পেশ করেন। এ দিল্লী সম্মেলনেই লাহোর প্রস্তাবের 'রাষ্ট্রসমূহের' স্থলে 'রাষ্ট্র' ব্যবহার করা হয়। মন্ত্রী মিশনকে দৃঢ়ভাবে জানানো হয়, মুসলিম লীগই ভারতের দশ কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। তাদের দাবি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। এছাড়া ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের আর কোনো পথ নেই। মন্ত্রী মিশন মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে আলাদা আলাদাভাবে এবং সম্মিলিতভাবে আলাপ আলোচনা করে। কিন্তু কোনো মতৈক্যে পৌঁছতে পারেনি। ফলে তাঁরা ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তাঁদের নিজস্ব প্রস্তাব ঘোষণা করে।

মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব করে যে, ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে। ফেডারেল সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা। অন্যান্য বিষয় প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলো তিনটি গ্রুপে বিভক্ত থাকবে।

ক) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মুম্বাই (বোম্বাই) ও চেন্নাই (মাদ্রাজ);

খ) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তান;

গ) বাংলা ও আসাম।

তারা নিজ নিজ গ্রুপের সংবিধান রচনা করবে। আইনসভার প্রথম নির্বাচনের পর প্রত্যেক প্রদেশের ফেডারেল ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে আসার অধিকার থাকবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণকে নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠন করার সুপারিশ করা হয়।

মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবগুলোতে স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কথা পরোক্ষভাবে নিহিত ছিল। ফলে মুসলিম লীগ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা প্রস্তাব গ্রহণ করে। কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করতে অসম্মতি জানায়। কিন্তু সংবিধান রচনায় অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়।

মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য লর্ড ওয়াভেলকে চাপ দিতে থাকে। কিন্তু কংগ্রেসের অসহযোগিতার জন্য তিনি তাতে অসম্মত হন। এ চুক্তি ভঙ্গের জন্য মুসলিম লীগের সভাপতি জিন্নাহ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা বাতিল করেন। মুসলিম লীগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ঐ দিন কলকাতায় ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। এ দাঙ্গায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হতাহত হয়। এ হাঙ্গামায় মুসলমানেরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ হাঙ্গামার প্রতিক্রিয়া কয়েক দিনের মধ্যে নোয়াখালি, বিহার, মুম্বাই (বোম্বাই), পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এ দাঙ্গার ফলে দেশ বিভাগ ত্বরান্বিত হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন

মুসলিম লীগের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯৪৬ সালের ২৪শে জুন লর্ড ওয়াভেল মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুসারে জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেন। ১৯৪৬ সালের ২৪শে অক্টোবর অনেক চিন্তাভাবনার পর মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করে। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ভেঙে পড়ায় কোয়ালিশন সরকার কার্যকর হতে পারেনি। ফলে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়ে যায়।

ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা

১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমঝোতা আর সম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক অবস্থার অবনতি এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা দেখে মি: এটলী ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন বলে ঘোষণা করেন। এ ঘোষণা কার্যকর করার জন্য লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও লীগের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারেন ভারত বিভাগ ছাড়া গত্যন্তর নেই। কংগ্রেস ও লীগ নিজ নিজ দাবিতে অটল থাকে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও লীগের দাবি অনুসারে ভারত বিভাগে রাজি হন। তবে তাদের শর্ত মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুযায়ী বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করতে হবে। জিন্নাহ এ প্রস্তাবে রাজি হলে মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগের সুপারিশ করেন।

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগের নীতি ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস করে। ১৪ই আগস্ট করাচিতে পাকিস্তানের হাতে এবং ১৫ই আগস্ট দিল্লীতে ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। এভাবে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুইটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে জন্মলাভ করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু বিক্ষোভ–এর কারণে বৃটিশ ভারতে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠিত হয়; তা হচ্ছে–

ক. খিলাফত আন্দোলন খ. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
গ. মুসলিম লীগ ঘ. জাতীয় কংগ্রেস।

২। বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনভার গ্রহণ করার পর মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। কারণ–

i. ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানদের অনাগ্রহ
ii. মুসলমানদের প্রতি বৃটিশদের অবিশ্বাস
iii. বৃটিশ–বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন অবিভক্ত বাংলায় এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। তিনি একাধিক বার মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার কৃষক ও সাধারণ মানুষের অনেক কল্যাণ সাধন করেন। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা ছাড়াও তিনি কৃষি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশকিছু আইন তৈরি করেন।

৩। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়–

i. মুসলিম রাষ্ট্র
ii. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ
iii. পাকিস্তান রাষ্ট্র

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও iii

৪। এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক প্রণীত ১৯৪০ সালের মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের ব্যাপারে হিন্দুনেতাদের বিরোধিতা করার কারণ–

i. হিন্দুদের প্রাধান্য হ্রাস করার আশংকা
ii. হিন্দু–মুসলিম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবার আশংকা
iii. হিন্দুদের রাজনৈতিক স্বার্থ নষ্ট হবার আশংকা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। লর্ড কার্জন বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ভেঙে দুটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন। এর একটি হল পূর্ববঙ্গ। এ নতুন প্রদেশ গঠিত হওয়ায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উন্নতির সূচনা হয়। কিন্তু কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণে ব্রিটিশ সরকার নতুনভাবে বাংলাদেশকে পুণর্গঠন করেন। ফলে জনগণ বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মনে দারুণ আঘাত হানে। হিন্দু–মুসলিম বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এরূপ বিদ্বেষ আর পারস্পরিক অবিশ্বাস পরবর্তীতে বহু ঘটনাপ্রবাহের জন্ম দেয়।

ক. কোন কোন অঞ্চল নিয়ে পূর্ববঙ্গ নামের নতুন প্রদেশ গঠিত হয়?

খ. বঙ্গভঙ্গের একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. পূর্ববঙ্গের আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিতে বঙ্গভঙ্গের প্রভাব ব্যাখা কর।

ঘ. বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একাধিক পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপনের কথা ছিল। কিন্তু পরে এ প্রস্তাব সংশোধন করে একটিমাত্র রাষ্ট্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ভারতীয় মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্মলাভ হয়। পাকিস্তানের দুইটি অংশ ছিল– পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তানের রাজধানী ছিল করাচি নগরীতে। পরে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়। পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা প্রথম থেকে মুসলিম লীগের একচেটিয়া কর্তৃত্বের অধীনে ছিল। তারা পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোণঠাসা করে রাখে। নিচে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক অবস্থার বিবরণ দেওয়া হল।

রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানে পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা ছিল। তবে কার্যত গভর্নর জেনারেল এবং আমলারাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর অথবা বিধানসভার মতামতের তোয়াক্কা না করে গভর্নর জেনারেল নিজের পছন্দ অনুযায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করতেন। মন্ত্রিসভা তাদের কার্যাবলির জন্য শুধু গভর্নর জেনারেলের নিকট দায়ী থাকতেন। পাকিস্তান নামেমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল একটি আমলাতন্ত্র। বিধানসভা ও মন্ত্রিপরিষদ আমলাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। পাকিস্তানের প্রথম মুখ্য সেক্রেটারি আজিজ আহমদ ছিলেন পাকিস্তানের প্রকৃত শাসক। ১৯৫৫ সালের এক হিসেব থেকে জানা যায়, কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে ১৯ জন সচিবের মধ্যে সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি।

গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। খাজা নাজিমউদ্দীন ও তাঁর সহকর্মীগণ পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের জন্য ছয়টি আসন ছেড়ে দিলে পূর্ব পাকিস্তান তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল জিন্নাহর মৃত্যুর পর খাজা নাজিমউদ্দীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রীয় নীতিমালা বাস্তবায়নে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একাধিপত্য ছিল। গণপরিষদের ৭৯ জন সদস্য তাঁদের নিজেদের মধ্য হতে গভর্নর জেনারেল, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করতেন।

১৯৪৮ সালে খাজা নাজিমউদ্দীনের পর নূরুল আমীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিল দশ জন। একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে পাকিস্তানের লেগেছিল নয় বছর। ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ গৃহীত সংবিধানে বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়নি। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অধিকার দেওয়া হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র নিজেদের আধিপত্য রক্ষার জন্য ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেন। কিন্তু আইয়ুব খান শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি পূরণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। ফলে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করেন। তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনিও তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। বরং তার গৃহীত পদক্ষেপসমূহে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যায়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়যন্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় অল্প সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক উন্নতি হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পাট দিয়ে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হত, তা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়ন হয়। সে অনুপাতে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। নদীতে বাঁধ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হত, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে কোনো নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়নি।

সিন্ধুর মরু অঞ্চলে পানিসেচের ব্যবস্থা করে শস্য উৎপাদন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১৯৪৯-৫০ সালে পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল ৫১ ডলার আর পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল ৪৬ ডলার। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ১৯৫০-১৯৫৪-৫৫ সালে মোট উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা আশি ভাগই ব্যয় করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, আর মাত্র শতকরা বিশ ভাগ ব্যয় করেছিল পূর্ব পাকিস্তানে। পাকিস্তানের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ছিল যথাক্রমে শতকরা ২৬ ভাগ, ৩২ ভাগ এবং ৩৬ ভাগ। ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার হত গড়ে প্রতিবছর দশ শতাংশ। এভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছিল।

সাংস্কৃতিক অবস্থা

কোনো জাতির রাজনৈতিক চেতনা এবং জাতীয়তাবোধ সমূলে ধ্বংস করতে হলে সর্বাগ্রে সে জাতির ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানতে হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী একই উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে। শাসকগোষ্ঠীর প্রাধান্য, প্রতিপত্তি স্থায়ী করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ক্ষেত্রে শোষণের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও শোষণ শুরু করেছিল।

ভাষা আন্দোলন

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়, যার প্রেক্ষিতে সূচিত হয় ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় : ১৯৪৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও আইন-আদালতের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য জোর প্রচারণা চালায়। 'তমদ্দুন মজলিসের' উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে শিক্ষা সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে বাংলাকে অন্যান্য ভাষার সাথে অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবি উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। লিয়াকত আলী খান, নাজিমউদ্দীন প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতা তাঁর প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। ফলে ১৯৪৮ সালে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে বাংলা ভাষার সমর্থনে শ্লোগান দিতে থাকে।

ভাষা আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৪৮ সালে ২রা মার্চ 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে এক সর্বদলীয় পরিষদ গঠিত হয়। এ পরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য একটি প্রস্তাব করে। সরকারি ভাষার তালিকা থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালে ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। দেশের সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় লাঠিচার্জ করে। ফলে অনেকেই আহত এবং গ্রেপ্তার হয়।

১১ই মার্চের পুলিশের জুলুমের প্রতিবাদে ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৩ই মার্চ হতে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দেশের সকল জেলাতেও পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। ১৫ই মার্চে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের পরপর দুইটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর নাজিমউদ্দীন ও সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে ৭ দফাবিশিষ্ট এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিগুলো নিম্নে দেওয়া হল :

১। ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার প্রশ্নে গ্রেপ্তারকৃত সকলকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হবে।
২। পুলিশি অত্যাচারের বিষয়ে তদন্ত করে একটি বিবৃতি প্রদান করা হবে।
৩। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য পরিষদে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।
৪। পূর্ব বাংলায় সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি উঠে যাওয়ার পর বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করতে হবে।
৫। সংবাদপত্রের ওপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।
৬। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।
৭। ২৯শে ফেব্রুয়ারি হতে জারিকৃত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হবে।

১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং ২৪শে মার্চ কার্জন হলে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। তখন থেকেই ছাত্রসমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে এবং 'না, না' বলে তাঁর উক্তির প্রতিবাদ জানায়।

ভাষা আন্দোলনের শেষ পর্যায় : ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করেন, 'উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে'। ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দীনও এক জনসভায় ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ ৩০শে জানুয়ারি প্রতীক ধর্মঘট ও সভা আহবান, ৩১শে জানুয়ারি একটি সর্বদলীয় সভা আহ্বান করে এবং খাজা সাহেবের বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদ করে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' একটি সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী এক সাধারণ ধর্মঘটের এবং ঐ দিন ভাষা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভাষার দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করে।

এ সময়ে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব ও ছাত্রনেতা মহিউদ্দিন আহমেদ 'রাজবন্দীর মুক্তি' ও 'রাষ্ট্রভাষা বাংলার' দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করলে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। অবস্থা অনুধাবন করে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে মিছিল ও গণজমায়েতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এতে উত্তেজনা তীব্রতর হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের মতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারির সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গাণে ছাত্র-ছাত্রী সমবেত হয়। অধিকাংশের সম্মতিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে '১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গাকারী প্রথম দলটি গেট থেকে রাস্তায় বের হয়।

ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গা করলে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে ইটপাটকেল বিনিময় হতে থাকে। পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং ছাত্রদের গ্রেপ্তার করে। বেলা ১২টার দিকে পুলিশের মোটা রশির বাধা পার হয়ে উত্তেজিত ছাত্ররা দলে দলে মেডিকেল কলেজ ও হোস্টেলের দিকে যেতে থাকলে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে পুনরায় ইটপাটকেল বিনিময় শুরু হয় এবং এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্রদের ওপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

এভাবে ছাত্রপুলিশ সংঘর্ষ চলাকালে বেলা ৩ টার দিকে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এ সময় উচ্চপদস্থ পুলিশ ও সরকারি আমলারাও উপস্থিত ছিলেন। তারা ছাত্রদের প্রাদেশিক আইন পরিষদের দিকে যেতে নিষেধ করলে ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পুলিশ প্রথমে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে এবং সে গুলিতে বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার, শফিউর এবং আরো অনেকে শহীদ হন এবং অনেকে হন আহত। এতে সারা পূর্ব বাংলায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

২২শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্র-জনতা শহীদদের স্মৃতি অমর করে রাখার জন্য মেডিকেল কলেজের সামনে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করে। এ মিনারটি উন্মোচন করা হয় শহীদ শফিউর রহমানের পিতাকে দিয়ে।

ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য : ১৯৪৮-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের মনে স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর পুরো পঞ্চাশের দশক ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামের ও চেতনার কাল, আর আইয়ুব খানের দশক ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রস্তুতিকাল।

ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এ আন্দোলন এদেশের মানুষকে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এ আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানিদেরকে ঐক্য ও স্বাধীনতার চেতনা দিয়েছে। একুশের চেতনা আমাদেরকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অপরিমেয় ইন্ধন যুগিয়েছে। এটি ছিল বাঙালিদের মুক্তির প্রথম আন্দোলন। একুশের চেতনা সকল স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভাষা আন্দোলন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক সকল শ্রেণীর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যার পরিণতিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়।

যুক্তফ্রন্ট গঠন (১৯৫৪)

১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজাম-এ-ইসলাম, বামপন্থী গণতন্ত্রী দল– এ চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'যুক্তফ্রন্ট'। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

একুশ দফার প্রধান দফা ছিল পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দফাগুলো ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান, বর্ধমান হাউসকে বাংলা একাডেমীতে রূপান্তর, ভাষা আন্দোলনের শহীদের জন্য শহীদ মিনার নির্মাণ, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, শ্রমিকদের অধিকারের স্বীকৃতি, পাটশিল্প জাতীয়করণ, পাটচাষিদের ন্যায্য মূল্য প্রদান, বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ, সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি।

যুক্তফ্রন্ট- এর নেতৃত্বে ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আতাহার আলী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নির্বাচনী সফরকালে তাঁরা ২১ দফা কর্মসূচি প্রচার করেন এবং জনগণকে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে তোলেন।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন

সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী- এ ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক আইন পরিষদের মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে এককভাবে ২২৩টি আসন লাভ করে। অন্যান্য আসনগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ৯টি আসন, নির্দলীয় সদস্যগণ ৪টি এবং খেলাফত রাব্বানী ১টি আসন লাভ করে। এ নির্বাচনে ৭২টি আসন অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

নির্বাচনের তাৎপর্য

১। এ নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ নির্বাচনে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।
২। এ নির্বাচন ছিল মূলত পূর্ব বাংলার জনতার বিজয়। তাদের এ জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার ফলে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়।
৩। এ নির্বাচন প্রমাণ করেছে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণই এ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে।
৪। এ নির্বাচনে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই ঐক্যবদ্ধ ছিল।
৫। এ নির্বাচন পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের শাসনের অবসান ঘটায়।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা

নির্বাচনের পর ২৫শে মার্চ পূর্ব বাংলায় গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। ২রা এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পরে তা সম্প্রসারিত হয়। এর সর্বমোট সদস্যসংখ্যা ছিল ১৪ জন। হক সাহেব হলেন মুখ্যমন্ত্রী। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং মন্ত্রিত্ব নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। তদুপরি মুসলিম লীগের চক্রান্তে যুক্তফ্রন্ট বেশি দিন টিকতে পারেনি।

১৯৫৪ সালের মে মাসে ফজলুল হক কলকাতা ভ্রমণে গিয়ে অসতর্কভাবে এমন সব বক্তব্য রাখেন যা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ইতিমধ্যে আদমজি জুট মিলস এবং চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে বাঙালি ও বিহারি শ্রমিকদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। এতে বহু শ্রমিক নিহত হয়।
এ অজুহাতে ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা করে। এভাবে পূর্ব বাংলায় সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান হয়।

পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন

১৯৫৪ সালে মে মাসে ৯২-ক ধারা অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন জারি করা হয় এবং মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠানো হয়। হক সাহেব নিজ বাড়িতে অন্তরীণ হন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ প্রায় ১৬শ নেতা-কর্মী ও সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৫৪ সালের ২৪শে অক্টোবর এক ঘোষণায় গোলাম মোহাম্মদ গণপরিষদ বাতিল করে দেন। আবার তিনিই ১৯৫৫ সালে জুন মাসে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন গণপরিষদ গঠন করতে বাধ্য হন।

১৯৫৫ সালের ৬ই জুন তারিখে ৯২-ক ধারা প্রত্যাহার করা হলে ফজলুল হকের মনোনীত প্রার্থী আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে নতুন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এ মন্ত্রিসভা একুশ দফা বাস্তবায়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল।
মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট মিলিতভাবে চৌধুরী মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে ১৯৫৫ সালের ১১ই আগস্ট নতুন কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে।

ইস্কান্দার মির্জা ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকারের পতন হয়।

১৯৫৬ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে রিপাবলিকান- আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এ সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যুক্ত নির্বাচন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করে। ১৯৫৭ সালের ১৬ই অক্টোবর তাঁর সরকারের পতন হয়।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সংকটকে কেন্দ্র করে আবু হোসেন সরকারের পতন হলে ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর আতাউর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয়।

১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রিগড়-এর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ-রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। চুন্দ্রিগড় প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের পর পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। পরে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন।

অতঃপর ফিরোজ খান নুনের নেতৃত্বে রিপাবলিকান দল কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন ১৯৫৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত দিনতারিখ ঘোষণা করেন। পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতি দিন দিন ঘোলাটে হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটির পর একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটতে লাগল।

১৯৫৮ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক পরিষদে তুমুল ঝগড়া ও মারামারিতে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল

ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর মৃত্যুর পর ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা দেশের শাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা এবং আইন পরিষদ বাতিল করেন। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন।

১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে অপসারণ করে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থামূলক ভোটে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হন।

১৯৬২ সালে তিনি পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান প্রণয়ন করেন। এ সংবিধান মতে সমস্ত ক্ষমতাই ন্যস্ত থাকে প্রেসিডেন্টের হাতে।

১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে কেন্দ্র করে আইয়ুব-বিরোধী জোট গড়ে ওঠে। কিন্তু আইয়ুব খান জয়ী হয়।

১৯৬৫ সালে কাশ্মীরের অধিকার নিয়ে পাকিস্তানের সাথে ভারতের যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধের পর আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ছয়-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের চাপে আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে বিদায় নেন।

পাকিস্তানি আমলে বাংলাদেশের প্রতি বৈষম্য

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানিদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করতে দেওয়া হয়নি। বরং রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল।

রাজনৈতিক বৈষম্য

পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গের বিরোধিতার জন্য গণতন্ত্র উত্তরণের কোনো প্রচেষ্টা করা হয়নি। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা সমগ্র পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন হওয়া সত্ত্বেও এ অঞ্চল হতে জনসংখ্যা অনুপাতে কেন্দ্রীয় আইনসভা ও শাসন-ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়া হয়নি। ১৯৪৭-৫৮ সাল পর্যন্ত ৪ জন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের এবং তিনিও ছিলেন উর্দুভাষী। এ সময়ে ৭ জন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ৩ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের এবং এদের মধ্যে ১ জন ছিলেন উর্দুভাষী। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু নানান অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানে হক সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শাসন চালু করা হয়। ১৯৫৬ সালে যে শাসনতন্ত্র চালু হয়েছিল তা ১৯৫৮ সালে বাতিল করে সামরিক শাসন জারি করা হয়।

১৯৬২ সালে আইয়ুব খান রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার প্রবর্তন করে সারাদেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালির মুক্তির সনদ ছয়-দফা দাবি উত্থাপন করেন। সর্বস্তরের জনগণ ছয়-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করে দেশকে এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়।

প্রশাসনিক বৈষম্য

পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানিদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। সামরিক, বেসামরিক ও অন্যান্য চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে বৈষম্য ব্যাপক ছিল। নিচে বৈষম্যের কিছু চিত্র তুলে ধরা হল :

বিভিন্ন বিভাগ	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস	৮৪%	১৬%
ফরেন সার্ভিস	৮৫%	১৫%
বিদেশে মিশন প্রধান (সংখ্যা)	৬০	৯
সৈন্যবাহিনী	৯৫%	৫%
প্রধান সারির সেনা অফিসার (সংখ্যা)	১৬ জন	১জন
পাইলট	৮৯%	১১%
আর্মডফোর্স (সংখ্যা)	৫০,০০০	২০,০০০
পাকিস্তান এয়ার লাইন্স (সংখ্যা)	৭০০	২৮০
পি, আই, এ পরিচালক সংখ্যা	৯	এক জন মাত্র
পি, আই, এ আঞ্চলিক ম্যানেজার সংখ্যা	৫	কেউ ছিল না
রেলওয়ে বোর্ড পরিচালক	৭	এক জন মাত্র
উৎস : Bangladesh Documents Part 1, Ministry of External Affairs, পৃষ্ঠা - ২০		

১৯৬৬ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রশাসন ব্যবস্থায় পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

শ্রেণী	মোট	পশ্চিম পাকিস্তানের	পূর্ব পাকিস্তানের	শতকরা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের
১ম শ্রেণী	২,৮১৬ জন	২,১০৪ জন	৭১২ জন	২৩%
২য় শ্রেণী	৫,৯৫১ জন	৪,৭১১ জন	১,২৪০ জন	২৬%
৩য় শ্রেণী	৭০,০০০ জন	৫০,৭০০জন	১৯,৩০০ জন	২৭%
৪র্থ শ্রেণী	২৬,০০০ জন	১৮,০০০ জন	৮,০০০ জন	৩০%

১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত বেসামরিক খাতে পাকিস্তানে মোট ব্যয় হয়েছিল ৭১৮ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়েছিল ১৮৪ কোটি টাকা মাত্র।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে তুলা উৎপাদনের কোনো চেষ্টা করা হয়নি। মুদ্রা ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছিল। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্টেট ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় অর্থ পাচার হত অবাধ গতিতে। উদ্বৃত্ত আর্থিক সঞ্চয় পশ্চিম পাকিস্তানে জমা থাকত। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়ে উঠতে পারেনি। পাকিস্তানের ১৯৪৭-৭১ সালের আর্থিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে নিম্নলিখিত চিত্র দৃষ্ট হয় :

১। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে।
২। পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ আয় করত, সে পরিমাণ ব্যয় করতে পারত না।
৩। পূর্ব পাকিস্তানের পাট দিয়ে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হত, তা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হত। পাট থেকে মোট বৈদেশিক মুদ্রার তিন ভাগের দুইভাগ অর্জিত হত।
৪। মোট বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের শতকরা ১০ ভাগ থেকে ১৫ ভাগ মাত্র খরচ হত পূর্ব পাকিস্তানে।

৫। মোট রাজস্বের শতকরা ৯৪ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হত, বিদেশি মিশনসমূহ পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের আয় বেড়েই চলছিল।
৬। পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়ের দ্বিগুণ।
৭। পূর্ব পাকিস্তানে যেসব কলকারখানা তৈরি হয়েছিল তাদের মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। এ খাত থেকে যে আয় হত, তাও ব্যয় হত পশ্চিম পাকিস্তানে।

সামরিক বৈষম্য

প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। দেশরক্ষা বাহিনীর চাকরিগুলো ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের একচেটিয়া অধিকারে। পূর্ব পাকিস্তানে কোনো অস্ত্রাগার তৈরি হয়নি। সামরিক বাহিনীতে শেষ পর্যন্ত যেসব পূর্ব পাকিস্তানি যোগদান করেছিল, তাদের সংখ্যা শতকরা দশের বেশি হয়নি।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করতে পাকিস্তান শাসকচক্র তৎপর হয়ে ওঠে। এ সম্বন্ধে ভাষা আন্দোলনে আলোচনা হয়েছে।
এছাড়া পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে শিক্ষা, কৃষি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোষণ করেছিল।

ছয়-দফা আন্দোলন

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক বৈষম্য সৃষ্টির পারিপ্রেক্ষিতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি-সংবলিত এক কর্মসূচির কথা ব্যক্ত করেন। এ কর্মসূচি ঐতিহাসিক ছয়-দফা নামে পরিচিত। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়-দফা কর্মসূচি পেশ করেন। ছয়-দফা কর্মসূচি নিম্নে দেওয়া হল :

১। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন রূপে গড়তে হবে। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।
২। দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র এ দুটো বিষয় থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। বাকি বিষয়গুলোতে অঙ্গরাজ্যের পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।
৩। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটো আলাদা অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। দুটি অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট ব্যাংক' থাকবে।
৪। সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আদায়কৃত রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।
৫। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে। এর নির্ধারিত অংশ কেন্দ্রকে দেবে। তারা বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে আলাপ আলোচনা ও চুক্তি করতে পারবে।
৬। পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা নিজস্ব গণবাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করা হবে।

ছয়-দফার তাৎপর্য

ছয়-দফা ছিল বাঙালিদের মুক্তির সনদ। বস্তুতপক্ষে, ছয়-দফা পরিণত হয়েছিল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে

এবং এর প্রতি জনসমর্থন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণার বিকাশ ঘটাতে ছয়-দফার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ছয়-দফার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল। ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে যেমন ম্যাগনা কার্টা অধিকার বিল, ঠিক তেমনি বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি হল ছয়-দফা কর্মসূচি। তাই এর গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

ছয়-দফা কর্মসূচি বাঙালিদের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এর পক্ষে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ছয়-দফাকে পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ মনে করে। তারা একে রাষ্ট্রবিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনরূপে অভিহিত করে। সরকার ভীতসন্ত্রস্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, অন্যান্য নেতা ও কর্মী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ছয়-দফা কর্মসুচিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে ৩৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে একটি মামলা দায়ের করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

এগার দফা

আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়। এ আন্দোলনকে ব্যাপক, সর্বাত্মক এবং অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামে রূপ দেবার জন্য ১৯৬৯ সালের ৬ জানুয়ারি 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এগার দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগের ছয়-দফা কর্মসূচি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগার দফার প্রধান দফাগুলো ছিল শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা, স্বায়ত্তশাসনের দাবি, ব্যাংক, বীমা, পাট-ব্যবসাসহ সকল বৃহদায়তন শিল্পের জাতীয়করণ, সেন্টো, সিয়াটো চুক্তি প্রত্যাহারসহ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের দাবিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে ছাত্রসমাজের এগার দফা দাবি পেশ পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও বৈষম্যনীতির প্রতি তীব্র অসন্তোষেরই প্রকাশ। ঐ বছরের প্রথম দিকের ধারাবাহিক ঘটনাবলি ১৯৬৯ সালের আন্দোলনকে একটি গণঅভ্যুত্থানে রূপ দেয়। এ আন্দোলনে–

১। ১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন,

২। ১৯৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হক সামরিক হাজতে নিহত হন এবং

৩। ১৯৬৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি ড. শামসুজ্জোহা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সামরিক অফিসার কর্তৃক নিহত হন।

এসব ঘটনার ক্রমপুঞ্জিত প্রভাবে চলমান আন্দোলন দুর্বার ও মারমুখী হয়ে ওঠে। সকল সরকারি অফিস এবং রাজপথ ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় প্রাদেশিক প্রশাসন কার্যত ভেঙে পড়ে। ২১ থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকায় প্রতিদিন মিছিল হয়েছে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় ছাত্র মতিয়ুর এবং শ্রমিক রুস্তম।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেন। ফলে শেখ মুজিবুরসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল আসামি মুক্তিলাভ করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ আগরতলা মামলার সব আসামিকে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক গণ-সংবর্ধনা দান করে। ঐদিন তদানীন্তন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ জনতার পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে ভূষিত করেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে। ঐদিনই তিনি ঘোষণা করেন, ছাত্রদের এগার দফা ও আওয়ামী লীগের ছয়-দফার ভিত্তিতে দেশের সমস্যা সমাধান করতে হবে।

অতঃপর আইয়ুব খান এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু এ বৈঠকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি না মানায় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। ফলে বেসামরিক (সিভিল) সমাজ অস্থির, উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জনতার দাবির মুখে পাক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে অপসারণ করে ২১শে মার্চ ড. এম. এন. হুদাকে নতুন গভর্নর নিযুক্ত করেন। ২৫শে মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ঐদিনই পাকিস্তানে জারি করা হয় সামরিক শাসন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান

জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল করেন। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদও বাতিল করেন।

১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। এ উদ্দেশ্যে একটি আইনগত কাঠামো জারি করেন। এর বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

১। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

২। ১৯৭০ সালে 'এক ব্যক্তি– এক ভোট'– এ নীতিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে।

৩। জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা হবে ৩১৩টি। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান পাবে ১৬৯টি। প্রত্যেক প্রদেশের আসন সংখ্যা হবে ৩০০টি।

৪। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন হতে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা করতে হবে।

৫। সংবিধান ইসলামি নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে রচনা করতে হবে।

৬। ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারি হতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হবে।

সত্তরের সাধারণ নির্বাচন

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর এবং ১৭ই ডিসেম্বর যথাক্রমে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়।

আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ

১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। আওয়ামী লীগ ছয় দফা ও ছাত্রদের এগার দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচি জনগণের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের হাত থেকে মুক্তিলাভের আশায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল।

নির্বাচনের তাৎপর্য

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন বাঙালিদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ছিল তাদের স্বাধিকার ও মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। আওয়ামী লীগকে জনগণ দেশ শাসনের ভার প্রদান করে। আওয়ামী লীগই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় প্রমাণ করে ছয়-দফার প্রতি ছিল জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন। এ নির্বাচনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এবং পিপলস পার্টি পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোনো আসন লাভ করেনি। দুদলেরই ছিল আঞ্চলিক প্রাধান্য। এ নির্বাচন প্রমাণ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র গড়ে তুলতে আগ্রহী। ১৯৭০-এর নির্বাচনে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের আস্থা শেষ হয়ে পড়ে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে।

৭ই মার্চের ভাষণ ও অসহযোগ আন্দোলন

নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগেরই সরকার গঠনের কথা। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি নেতৃত্বকে মেনে নিতে পারেনি। পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরামর্শে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পয়লা মার্চ এক ঘোষণায় ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সর্বস্তরের জনগণ রাজপথে নেমে আসে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২রা ও ৩রা মার্চ হরতাল পালনের আহ্বান জানান। তিনি ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক নীতিনির্ধারণী ভাষণ দেন।

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় তিনি তাঁর ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। উপস্থিত জনতার সম্মুখে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা করেন, '...... ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। উক্ত সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত কর্মসূচি এবং আহ্বানের প্রতি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে প্রশাসনের সকল স্তরের জনসাধারণ সাড়া দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের সকল অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, যানবাহন, কলকারখানা কার্যত অচল হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করতে। আসলে গোপনে তিনি আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র আনার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। ১৬ই মার্চ থেকে ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় বসেন।



চিত্র : ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ

কিন্তু ছাত্র-জনতা ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। ২৩শে মার্চ নেতৃবৃন্দের আহ্বানে 'পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবস'- এ বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত পতাকা সর্বত্র ওড়ানো হয়। ২৫শে মার্চ কোনো প্রকার ঘোষণা না দিয়েই ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। তার নির্দেশে বাঙালিদের আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য পাকিস্তানি সেনাবহিনী ঢাকা এবং অন্যান্য শহরে নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বেই মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। তিনি ঢাকায় দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং ওয়্যারলেসযোগে চট্টগ্রামের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পৌঁছে দিয়ে তা প্রচারের নির্দেশ দেন আওয়ামীলীগ নেতা এম. এ. হান্নানকে। চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র থেকে ২৬শে মার্চ ঘোষণাটি বঙ্গবন্ধুর নামে প্রচার করেন। একই দিনে চট্টগ্রামের কয়েকজন বেতারকর্মী ও শিল্পী কালুরঘাটে অস্থায়ী বেতারকেন্দ্র চালু করেন। ২৭শে মার্চ সন্ধ্যাবেলায় উক্ত বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা এবং সরকার গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগরে (মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে) বাংলাদেশের স্বাধীনতার সনদ এবং একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে আওয়ামী লীগের গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করা হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার অর্পিত হয় সৈয়দ নজরুল ইসলামের ওপর। অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হলেন তাজউদ্দিন আহমদ। পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব পেলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, অর্থ দপ্তর পেলেন এম মনসুর আলী এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বে রইলেন এ এইচ এম কামরুজ্জামান। মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী হলেন মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। এ সরকার গঠিত হলে মানুষ দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে থাকে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলসমূহ আওয়ামী লীগের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে।

মুক্তিবাহিনী

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ, আনসার, ছাত্র, যুবক প্রভৃতি নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়। নতুন সরকার অনুধাবন করেছিলেন যে, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে আমাদের মুক্তিবাহিনীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সরকার মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পসমূহে মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। তবে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা দেশকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে মৃত্যুবরণ করার জন্যই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, তাই তারা ছিলেন দেশপ্রেমিক, অসীম সাহসী এবং আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ যোদ্ধা। ফলে মাত্র কয়েক সপ্তাহের প্রশিক্ষণে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা রণকৌশলে দক্ষ হয়ে ওঠেন। মুক্তিযোদ্ধাদের ভারত ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহ করে।

সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। প্রত্যেক সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন একজন সেক্টর কমান্ডার। জুন মাসের শেষের দিকে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয় এবং তখন থেকেই গেরিলা ও সম্মুখ তৎপরতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। অক্টোবর-নভেম্বরে সমগ্র দেশব্যাপী মুক্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতা ভীষণ আকার ধারণ করে। পাকবাহিনীকে জলে-স্থলে পর্যুদস্ত করে ফেলে। এতদসত্ত্বেও পাকবাহিনী সর্বত্র ধ্বংসলীলা চালিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ছিলেন মূলত দেশের কৃষক, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার সাধারণ মানুষ।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার মুজিব বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি আরো উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক রন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই পি আরো-এর

বাঙালি সৈনিকসহ শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনী গঠন করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১১টি সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর পাশে থেকে বিভিন্ন জেলায় আক্রমণ পরিচালনা করে। নৌ-বাহিনীর বহু অফিসার ও নাবিককে নিয়ে নৌ-কমান্ডো গঠন করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা অনন্যসাধারণ ইতিহাস সৃষ্টি করে। তারা চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, বরিশাল, চালনা প্রভৃতি বন্দরে সফল অভিযান পরিচালনা করে। তারা আগস্ট থেকে নভেম্বরের মধ্যে শত্রু-পক্ষের বহুসংখ্যক জাহাজ নিমজ্জিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং বেশ কয়েকটি শত্রু-নৌযান দখল করতে সক্ষম হয়। এয়ার কমোডোর এ. কে. খোন্দকার বিমান বাহিনী পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। তার নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী ও নিয়মিত বাহিনীর সমর্থনে বিমান বাহিনী কয়েকটি সাফল্যজনক অভিযান চালায়। ৩রা ডিসেম্বর থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে যে সকল বিমান আক্রমণ পরিচালনা করা হয়েছিল তার প্রথম আক্রমণের কৃতিত্ব বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যাত্রা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই শুরু হয়।

বি এল এফ (মুজিব বাহিনী)

ছাত্রনেতা শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী এবং শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে বি এল এফ (বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট) নামে একটি রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে ওঠে। বি এল এফ পরে মুজিব বাহিনী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মুজিব বাহিনীর সদস্যদের মূলত গেরিলা যুদ্ধের ওপর বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা দেশের অভ্যন্তরে পাক হানাদারদের যাতায়াত ও রসদ সরবরাহ বন্ধ করাসহ ঘাঁটিগুলোর ওপর গেরিলা কায়দায় আক্রমণ চালিয়ে তাদের বিপর্যস্ত করে তোলে।

নভেম্বরের প্রথম দিকে মুক্তিযুদ্ধের গতি তীব্রতর হয়। এ মাসের মাঝামাঝি সময়ে সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর, যশোর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি সীমান্তবর্তী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল শত্রুমুক্ত হয় এবং আস্তে আস্তে কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, খুলনা ও রাজশাহীর মুক্তাঞ্চলে বাংলাদেশ সরকারের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যান্য বাহিনী

মুক্তিবাহিনী এবং মুজিব বাহিনী ছাড়াও টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে কাদেরিয়া বাহিনী এবং বরিশাল ও ফরিদপুর অঞ্চলে হেমায়েত উদ্দীনের নেতৃত্বে হেমায়েত বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনী এবং ই পি আর মিলিয়ে ২৫,০০০ সৈন্য ও অফিসার মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। মোট কথা, বাংলাদেশের আপামর জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণের ফলেই স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়েছিল।

স্বাধীনতার জন্য আন্তর্জাতিক আবেদন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৮ই এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছাত্র-শিক্ষকদের গণহত্যার একটি বিবরণ বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তিনি মুজিবনগর সরকারের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডনে অফিস নিয়ে যুদ্ধের বাকি সময় জোর তৎপরতা চালান।

শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের অবদান

যদিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ, তারপরও এই যুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদান ছিল প্রশংসনীয়। শিল্পীগণ গণসংগীত ও দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে দেশের জনসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছেন। লেখকগণ পত্রপত্রিকায় ও স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে লেখনী দ্বারা বাংলাদেশের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের গতি, প্রকৃতি, মানুষের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে উজ্জীবিত করেছিলেন। তাঁরা লেখনীর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে মানসিক ও নৈতিকভাবে বলীয়ান করেছিলেন, সাহস যুগিয়েছিলেন। জনগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় করে রেখেছিলেন।

প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাঙালিরা অর্থ সংগ্রহ করেন। এছাড়াও তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের জন্য কাজ করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবদান

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এক মস্তবড় অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছিল। এ বেতারকেন্দ্র থেকেই মানুষ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা শুনতে পায়। যুদ্ধ শুরু হলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন রণাঙ্গনের খবরাখবর জানানো ছাড়াও চরমপত্র, দেশাত্মবোধক গান, নাটক, কথিকা ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ড গঠন

১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ড গঠন করা হয়। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমন করলে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীকে যৌথ কমান্ডের অধীনে আনা হয়। বাংলাদেশ বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ এয়ার কমোডোর এ কে খোন্দকার ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

চূড়ান্ত বিজয় ও স্বাধীনতা অর্জন

১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু তাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকার স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় এবং ভারতীয় বাহিনী মিত্রবাহিনী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ঐদিনই বাংলাদেশে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী তাদের সবগুলো বিমান হারায়। ইতিমধ্যে সাতক্ষীরা, টঙ্গী, জামালপুর, যশোর ক্যান্টনমেন্ট, সিলেট এবং আরো অনেক অঞ্চল মুক্ত হয়। যৌথবাহিনী এ সময় চারদিক থেকে ময়নামতি সেনানিবাস ঘিরে ফেলে এবং ধীরে ধীরে ঢাকা অবরোধের চেষ্টা চালায়।

বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ভাষণ দেন। ৯ই ডিসেম্বরের মধ্যে মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ যৌথবাহিনীর দখলে আসে। ১০ই ডিসেম্বর সর্বপ্রকার বিমান হামলা বন্ধ রাখা হয়। কেননা এ সময় বিদেশি নাগরিকদের ঢাকা ত্যাগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। ভৈরব শহর মুক্ত হলে সেখান থেকে চূড়ান্তভাবে আক্রমণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ১২ ও ১৩ই ডিসেম্বর যথাক্রমে কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল মুক্ত হয়। ১০ থেকে ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আরেক দফা গণহত্যা সংঘটিত হয়। ওই সময় আল-বদর ও আল-শামস বাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যায় সহায়তা করে।

১৪ই ডিসেম্বর যৌথবাহিনী ঢাকার খুব নিকটে চলে আসে। যৌথবাহিনীর দুর্বার আক্রমণে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রসহ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় সূচিত হয়। আমাদের দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন চারদিকে ছিল স্বজন হারানোর বেদনা, কান্না, হাহাকার আর ধ্বংসযজ্ঞ। অসংখ্য রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, কলকারখানা, নৌবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত, রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল অর্থশূন্য। আমাদের ছিল না কোনো সামরিক-বেসামরিক বিমান। ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, গ্রামে-গঞ্জের লক্ষ লক্ষ বাড়িঘর পুনঃনির্মাণ এবং সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের চাহিদা মিটিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েই যাত্রা শুরু হয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় কোন তারিখে ?

ক. ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ
খ. ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ
গ. ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ
ঘ. ১৯৭১ সালের ২৮শে মার্চ

২। ১৯৭১ সালে ১১ই এপ্রিল মুজিবনগরে গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়–

i. বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুর্ণবাসন
ii. মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান
iii. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা বিধান

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের টেবিলে পাকিস্তান আমলের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হল। উক্ত পরিসংখ্যান ব্যবহার করে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিভাগ	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
সিভিল সার্ভিস	৮৪%	১৬%
ফরেন সার্ভিস	৮৫%	১৫%
মিলিটারি সার্ভিস	৯৫%	৫%
পাইলট	৮৯%	১১%

৩। উপরের সারণি থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়–

i. রাজনৈতিক
ii. প্রশাসনিক
iii. অর্থনৈতিক

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii

৪। সরকারি চাকরিতে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দু অঞ্চলের মধ্যে ব্যবধানের পেছনে কাজ করেছে–

ক. পূর্ব পাকিস্তানিরা শিক্ষা–দীক্ষায় অনগ্রসর ছিল।
খ. পূর্ব পাকিস্তানিরা দূরবর্তী কর্মস্থলে ভ্রমণে অনাগ্রহী ছিল।
গ. নিয়োগের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রাধান্য দেয়া হতো।
ঘ. পূর্ব পাকিস্তানিরা উর্দু ভাষা জানত না।

সৃজনশীল প্রশ্ন

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। এ আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানিদেরকে ঐক্য ও স্বাধীনতার চেতনা দিয়েছে। যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবোধ। এ জাতীয়তাবোধ এবং ছয়দফা আন্দোলন স্বাধিকার আন্দোলনে অপরিমেয় শক্তি যুগিয়েছে। আর তাতে বলীয়ান হয়ে এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-জনতা সকলে ঐক্যবদ্ধ এক সশস্ত্র মুক্তির সংগ্রামে অংশ নেয়। যার সফল সমাপ্তি ঘটে স্বাধীনতা ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মের মধ্য দিয়ে ।

ক. জাতীয়তাবোধ কী?

খ. ভাষা আন্দোলনকে কেন বাঙালিদের মুক্তির প্রথম আন্দোলন বলা হয়?

গ. ভাষা আন্দোলন কীভাবে স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ লাভ করে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছয় দফা আন্দোলন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে কী ভূমিকা রেখেছিল তা বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ
মানচিত্র

ভূগোল এই বিশাল বিচিত্র পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের প্রাকৃতিক অবস্থা, জলবায়ু, কৃষি, জনসংখ্যা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অবস্থান, জলবায়ু, প্রাকৃতিক অবস্থা ইত্যাদি তথ্যের সঙ্গে যদি মানচিত্র ব্যবহার করা না হয়, তাহলে পৃথিবী সম্পর্কে ঠিক ধারণা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। মানচিত্র ভূগোল বিষয়ের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

মানচিত্র

পৃথিবী অথবা পৃথিবীর যেকোনো অংশের প্রতিকৃতি, অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা এবং সাংকেতিক চিহ্নসহ সুনির্দিষ্ট স্কেল অনুসারে অঙ্কন করলে তাকে মানচিত্র বলে। কোনো কোনো ভূগোলবিদ মানচিত্রকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করেছেন, 'প্রচলিত সাংকেতিক চিহ্ন, ক্ষুদ্র স্কেল ও অভিক্ষেপের সাহায্যে সমতল কাগজের ওপর অঙ্কিত সমগ্র পৃথিবী বা এর অংশবিশেষের প্রতিরূপকে মানচিত্র বলে।'

মানচিত্রের শ্রেণীবিভাগ

মানচিত্রকে (১) আকার ও স্কেল অনুসারে এবং (২) ব্যবহারিক বিশেষত্ব ও বিষয়বস্তু অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

আকার ও স্কেল অনুসারে মানচিত্র বিভিন্ন রকম হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মৌজা মানচিত্র, ভূসংস্থানিক মানচিত্র, দেওয়াল মানচিত্র ইত্যাদি।

ব্যবহারিক বিশেষত্ব ও বিষয়বস্তু অনুসারে মানচিত্রকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। উল্লেখযোগ্য শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে প্রাকৃতিক মানচিত্র, জলবায়ু মানচিত্র, রাজনৈতিক মানচিত্র, অর্থনৈতিক মানচিত্র, জনসংখ্যা মানচিত্র, যাতায়াত মানচিত্র প্রভৃতি।

মানচিত্র অঙ্কনের কৌশল

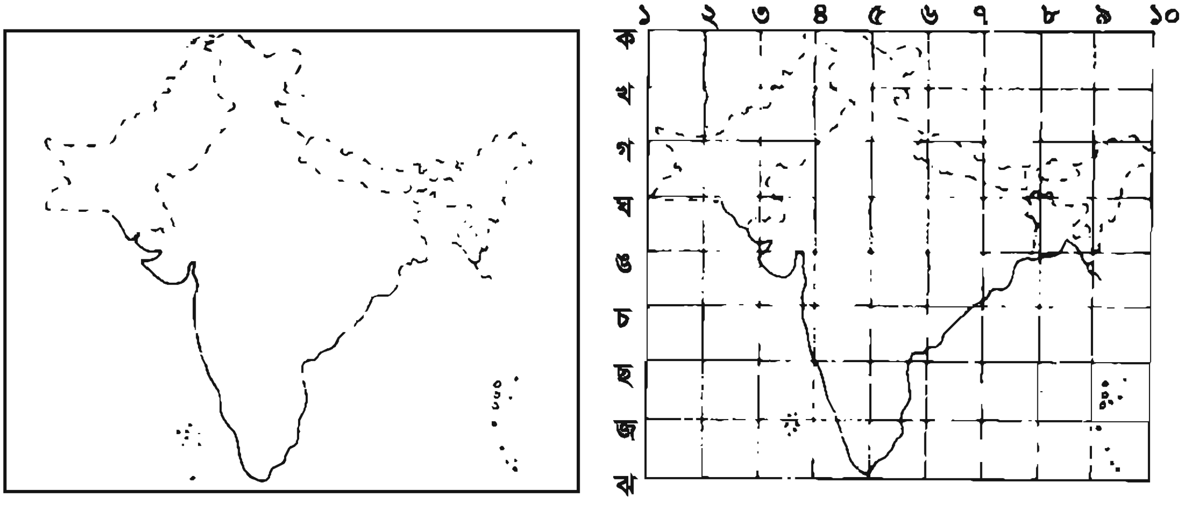
মানচিত্রের ওপর ট্রেসিং পেপার রেখে একটি মানচিত্র থেকে আরেকটি মানচিত্র অনুলেখ বা ট্রেসিং করে অঙ্কন করা যায়। এটি হচ্ছে ট্রেসিং পদ্ধতিতে মানচিত্র অঙ্কন।

ট্রেসিং টেবিল ব্যবহার করেও মানচিত্র অনুলেখ করে অঙ্কন করা যায়।

তবে সবসময় মানচিত্র ট্রেসিং করে আঁকলে হয় না। ট্রেসিং ব্যতীত গ্রিড বা ছক পদ্ধতিতেও মানচিত্র আঁকা যায়।

যে দেশের মানচিত্র আঁকতে হবে আগে থেকে সে দেশের সীমারেখা ও অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে সুপরিচিত হতে হয়। পাক-ভারত-বাংলাদেশ এই উপমহাদেশের একটি মানচিত্র অঙ্কন করতে হলে এই মানচিত্রের ওপর একটি ট্রেসিং পেপার রেখে এর ওপর দেশগুলোর সীমারেখা এঁকে নিতে হবে।

সীমারেখা বরাবর একটি ক্ষেত্র এঁকে নিয়ে অঙ্কিত ঐ ক্ষেত্রের ওপর উলম্ব এবং অনুভূমিক রেখা টেনে বর্গক্ষেত্রের ছক আঁকতে হবে।

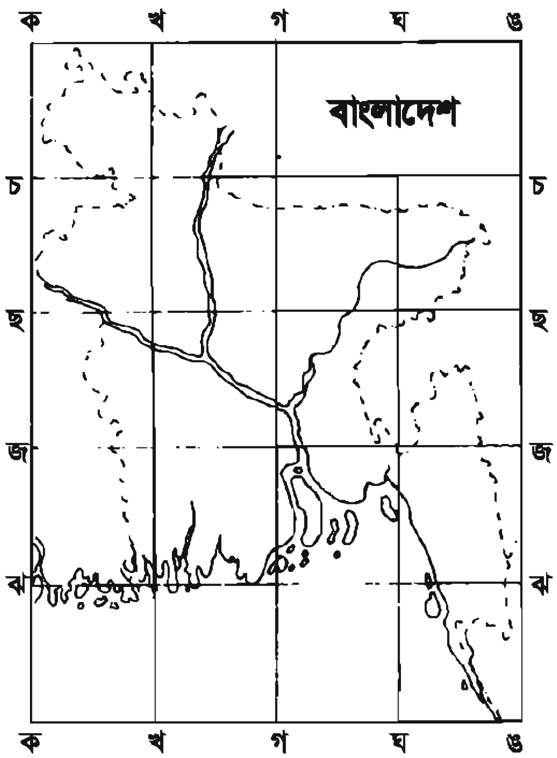


চিত্র ৩.১ : ভারত

ছকের রেখাগুলোর ওপরে এবং পাশের সংখ্যা দ্বারা চিত্র চিহ্নিত করতে হবে। তারপর ঘরের প্রতিটি ছকের নদী, সীমারেখা, শহর ইত্যাদির অবস্থান ঠিকভাবে দেখাতে হবে। সীমারেখা কোন ঘরের কোন স্থান দিয়ে গেছে, সেসব খুব যত্ন করে লক্ষ করতে হবে।

এই পদ্ধতিতে মুক্তহস্তে পুনঃপুন আঁকার অভ্যাস করলে ট্রেসিং না করে বা কোনো মানচিত্র না দেখেও স্মৃতি থেকে এই মানচিত্র আঁকা যাবে। এভাবে দেশের যেকোনো স্থানের মানচিত্র অঙ্কন করা যায়। প্রয়োজনমতো ছক ছোট বা বড় করে মানচিত্র ছোট বা বড় করা যায়।

পাশে গ্রিড পদ্ধতিতে বাংলাদেশের একটি মানচিত্র আঁকা আছে। ছকের বিভিন্ন ঘরের কোথায় বাংলাদেশের সীমানা কিভাবে গেছে দেখে শিক্ষার্থীরা মুক্তহস্তে মানচিত্রটি আঁকা অনুশীলন করবে।



চিত্র ৩.২ : বাংলাদেশ

মানচিত্র অঙ্কনের যন্ত্রপাতি

সাধারণত মানচিত্র আঁকার জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল।

(১) ট্রেসিং পেপার
(২) ট্রেসিং টেবিল
(৩) স্কেল
(৪) পেনসিল ও রবার
(৫) সেট স্কোয়ার
(৬) কাগজ/আর্ট পেপার

ট্রেসিং পেপার খুব পাতলা স্বচ্ছ কাগজ। এটি মানচিত্রের ওপর স্থাপন করলে এর ভেতর দিয়ে মানচিত্র দেখা যায়। ট্রেসিং টেবিলে বালবের সাহায্যে মানচিত্র অনুলেখ করা হয়। ট্রেসিং টেবিল বাক্স আকারের একটি টেবিল যার ওপরের অংশটি কাচের হয় টেবিলের ভেতরে বৈদ্যুতিক বালব থাকে। যার ওপর মানচিত্রটি স্থাপন করলে বৈদ্যুতিক আলোকে মানচিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ মানচিত্রের ওপর ট্রেসিং পেপার স্থাপন করে মানচিত্রটি অনুলেখ করা হয়। ছক কাটার জন্য ও পরিমাপের জন্য স্কেল ও সেট স্কোয়ার ব্যবহার করা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মানচিত্র আঁকার জন্য প্রধান উপকরণ হচ্ছে–

ক. আর্ট পেপার খ. টেবিল

গ. কল্পনা ঘ. ভূ-গোলক

২। মানচিত্র হচ্ছে–

i. পৃথিবী বা এর কোনো অংশের প্রতিকৃতি

ii. অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা সম্বলিত

iii. সুনির্দিষ্ট স্কেল অনুসারে সাংকেতিক চিহ্ন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩–৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

ফাহিমকে তার স্কুলে নিজ গ্রামের একটি মানচিত্র অঙ্কন করতে বলায় সে চিন্তা করছিল কোন ধরনের মানচিত্র সে আঁকবে। কারণ তাদের গ্রামে বিভিন্ন পেশার লোক বাস করে। শহর থেকে বাস, টেক্সি আবার নদীপথেও সে গ্রামে যাওয়া যায়। তাদের গ্রামে সব ধরনের ফসলও উৎপাদিত হয়।

৩। ফাহিমের গ্রামে যে পথে যাওয়া যায় তা আঁকতে হলে কোন মানচিত্র আঁকতে হবে ?

i. অর্থনৈতিক মানচিত্র

ii. যাতায়াত মানচিত্র

iii. মৌজা মানচিত্র

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. ii ও iii

৪। ফাহিমদের গ্রামের বিভিন্ন পেশার লোক বাস করার ক্ষেত্রে কোন মানচিত্র প্রয়োজন?

ক. জনসংখ্যা মানচিত্র খ. অর্থনৈতিক মানচিত্র

গ. ভূ–সংস্থানিক মানচিত্র ঘ. প্রাকৃতিক মানচিত্র

৫। ফাহিমকে তার গ্রামের মানচিত্র আঁকতে হলে প্রথমেই জানতে হবে

ক. বাংলাদেশের মানচিত্র

খ. তার জেলার মানচিত্র

গ. নিজ এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানের চিত্র

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

রাসু ৯ম শ্রেণীতে পড়ে। তার শ্রেণীশিক্ষক একটি ভূচিত্রাবলি থেকে ছকের সাহায্যে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে নিয়ে আসতে বলে। বাড়ির কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য সে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের দেয়ালে ঝুলানো মানচিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করে। তাতে সে বুঝতে পারে মানচিত্র বিভিন্ন প্রকারের এবং একটি দেশের মানচিত্র আঁকতে হলে সে দেশের সীমারেখা ও অন্যান্য বিবরণ জানতে হয়।

ক. আকার ও স্কেল অনুসারে উল্লেখযোগ্য একটি মানচিত্রের নাম লেখ।

খ. ব্যবহারিক বিশেষত্ব ও বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বিভক্ত একটি মানচিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

গ. ছক পদ্ধতিতে পাক– ভারত উপমাহাদেশের মানচিত্র অঙ্কন কর।

ঘ. ''একটি দেশের মানচিত্র অঙ্কনের জন্য সেই দেশের সীমারেখা ও অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে সুপরিচিত হতে হয়'' উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সৌরজগৎ

সূর্য থেকে আমাদের এ পৃথিবী, গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। সূর্য সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। সূর্য ও তার গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত হয়েছে। সৌরজগতে ৯টি গ্রহ, ৪৯টি উপগ্রহ, হাজার হাজার গ্রহাণুপুঞ্জ ও লক্ষ লক্ষ ধূমকেতু রয়েছে। গ্রহ ও উপগ্রহসমূহ সূর্য এবং নিজেদের পারস্পরিক মহাকর্ষণ শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নির্দিষ্ট কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করছে। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে সৌরজগৎ বলে।

সূর্য

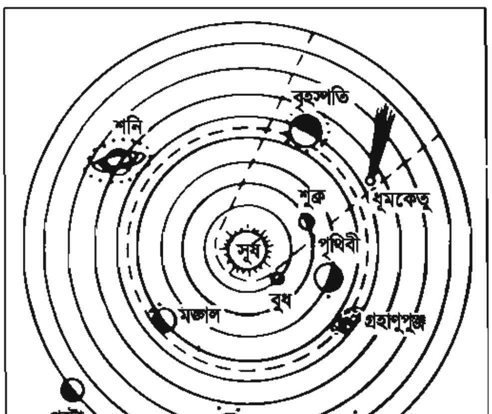
সূর্য একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কারণ সূর্য থেকেই পৃথিবীর উৎপত্তি। সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা ১৩ লক্ষ গুণ বড়। পৃথিবী থেকে সূর্য প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এর ব্যাস প্রায় ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিলোমিটার। সূর্যের উপরিভাগের উষ্ণতা ৫৭,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিরাট দূরত্বের জন্য সূর্যের অতি সামান্য তাপ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। এ সামান্য তাপ ও আলো দ্বারাই পৃথিবীর জীবজগতের সকল প্রয়োজন মিটে। সূর্যে কোনো কঠিন বা তরল পদার্থ নেই। শতকরা ৫৫ ভাগ হাইড্রোজেন, শতকরা ৪৪ ভাগ হিলিয়াম এবং শতকরা ১ ভাগ অন্যান্য গ্যাসে সূর্য গঠিত। সূর্যের মধ্যে মাঝে মাঝে যে কালো দাগ দেখা যায় তাকে সৌরকলঙ্ক বলে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে সৌরকলঙ্কে উত্তাপ কিছু কম।

আণবিক শক্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সূর্যে অনবরত হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম এবং হিলিয়াম থেকে শক্তি তৈরি হচ্ছে। সূর্য প্রায় ২৫ দিনে নিজ অক্ষের (Axis) ওপর এক বার আবর্তন করে এবং বৃহৎ বৃত্তাকার পথে প্রায় ২০ কোটি বছরের ব্যবধানে আপন গ্যালাক্সির চারদিকে পরিক্রমণ করে।

গ্রহ

সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা ৯টি। যথা- **(১) বুধ, (২) শুক্র, (৩) পৃথিবী, (৪) মঙ্গল, (৫) বৃহস্পতি, (৬) শনি, (৭) ইউরেনাস, (৮) নেপচুন ও (৯) প্লুটো।**

বুধ (Mercury) : বুধ সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম এবং সূর্যের নিকটতম গ্রহ। এর ব্যাস ৪,৮৫০ কিলোমিটার এবং ওজন পৃথিবীর ৫০ ভাগের ৩ ভাগের সমান। সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করতে এর ৮৮ দিন সময় লাগে। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব ৫.৮ কোটি কিলোমিটার। বুধের কোনো উপগ্রহ নেই। সূর্যের নিকটতম গ্রহ বলে এর তাপমাত্রা অত্যধিক।



চিত্র ৩.৩ : সৌরজগৎ

শুক্র (Venus) : সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে শুক্রের অবস্থান দ্বিতীয় এবং এটি পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। সূর্য থেকে শুক্র গ্রহের দূরত্ব ১০.৮ কোটি কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৪.৩ কোটি কিলোমিটার। একে সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে আমরা সন্ধ্যাতারা রূপে এবং ভোরে পূর্ব আকাশে শুকতারা রূপে দেখতে পাই। সূর্যকে এক বার পরিক্রমণ করতে এর সময় লাগে ২২৫ দিন। শুক্রের কোনো উপগ্রহ নেই। পৃথিবীর মতো শুক্রের একটি বায়ুমণ্ডল রয়েছে কিন্তু এতে অক্সিজেন নেই। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৯৬ ভাগ।

পৃথিবী (Earth) : পৃথিবী সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ। পৃথিবীর আয়তন ৫১০,১০০,৪২২ বর্গ কিলোমিটার। পূর্ব-পশ্চিমে এর ব্যাস ১২,৭৫২ কিলোমিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ১২,৭০৯ কিলোমিটার। সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার। পৃথিবী ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করে। এ গ্রহে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন রয়েছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ১৩.৯০° সেলসিয়াস। ভূত্বকে প্রয়োজনীয় পানি রয়েছে। গ্রহগুলোর মধ্যে একমাত্র পৃথিবীই জীবজন্তু ও উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য আদর্শ গ্রহ।

চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের গড় দূরত্ব ৩,৮১,৫০০ কিলোমিটার। এটি ২৯ দিন ১২ ঘণ্টায় পৃথিবীকে এক বার পরিক্রমণ করে।

মঙ্গল (Mars) : সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে পৃথিবীর পরেই মঙ্গলের স্থান। সূর্য থেকে গড় দূরত্ব ২২.৮ কোটি কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে ৭.৮ কোটি কিলোমিটার। মঙ্গল গ্রহের ব্যাস ৬,৭৮৭ কিলোমিটার এবং ওজন পৃথিবীর প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ। সূর্যকে পরিক্রমণ করতে মঙ্গল গ্রহের লাগে ৬৮৭ দিন এবং নিজ অক্ষে এক বার আবর্তন করতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট। মঙ্গলের দুইটি উপগ্রহ আছে। ডিমোস ও ফেবোস। এখানে জীবন ধারণ অসম্ভব। বায়ুমণ্ডলে শতকরা ৩ ভাগ নাইট্রোজেন ও শতকরা ২ ভাগ আরগন গ্যাস আছে। পানির পরিমাণ খুবই কম। পৃথিবীর তুলনায় অনেক ঠাণ্ডা, গড় উত্তাপ হিমাঙ্কের অনেক নিচে।

গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids) : মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ একত্রে পুঞ্জীভূত হয়ে পরিক্রমণ করছে। এই পরিসরের মধ্যে আর কোনো গ্রহ নেই। ৮০৫ কিলোমিটার থেকে ১.৬ কিলোমিটার-এর কম ব্যাসসম্পন্ন এসব জ্যোতিষ্ককে গ্রহাণু বলে। একত্রিতভাবে এসব গ্রহাণুকে গ্রহাণুপুঞ্জ বলে।

বৃহস্পতি (Jupiter) : সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতি। সূর্য থেকে বৃহস্পতি গ্রহের অবস্থান পঞ্চম স্থানে। এর আয়তন পৃথিবীর প্রায় ১,৩০০ গুণ। এর ব্যাস ১,৪২,৮০০ কিলোমিটার। এটি সূর্য থেকে প্রায় ৭৭.৮ কোটি কিলোমিটার দূরে। বৃহস্পতি ১২ বছরে এক বার সূর্যকে এবং ৯ ঘণ্টা ৫৩ মিনিটে নিজ অক্ষে এক বার আবর্তন করে। এ গ্রহে গভীর বায়ুমণ্ডল আছে। এর ১৬টি উপগ্রহ রয়েছে। এদের মধ্যে লো, ইউরোপা, গ্যানিমেড ও ক্যালিস্টো প্রধান।

শনি (Saturn) : শনি সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে শনির দূরত্ব ১৪৩ কোটি কিলোমিটার। শনি ২৯ বছর ৫ মাসে সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করে এবং ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে নিজ অক্ষে এক বার আবর্তন করে। শনি পৃথিবী থেকে প্রায় ৯ গুণ বড় এবং খালি চোখে এটি দেখা যায়। তিনটি উজ্জ্বল বলয় শনিকে বেষ্টন করে আছে। শনির ২২টি উপগ্রহের মধ্যে ক্যাপিটাস, টেথিস, হূয়া, টাইটান প্রধান।

ইউরেনাস (Uranus) : ইউরেনাস তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ২৮৭ কোটি কিলোমিটার। ৮৪ বছরে এটি সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করে। এর গড় ব্যাস প্রায় ৪৯,০০০ কিলোমিটার। এর আয়তন পৃথিবীর প্রায় ৬৪ গুণ এবং ওজন পৃথিবীর মাত্র ১৫ গুণ। এর ৫টি উপগ্রহ রয়েছে। ইউরেনাসেরও শনির মতো বলয় আবিষ্কৃত হয়েছে। মিরিন্ডা, এরিয়েল, ওবেরন, আম্ব্রিয়েল, টাইটানিয়া প্রভৃতি ইউরেনাসের উপগ্রহ।

নেপচুন (Neptune) : নেপচুনের গড় ব্যাস ৪৮,৪০০ কিলোমিটার এবং সূর্য থেকে দূরত্ব ৪৫০ কোটি কিলোমিটার। নেপচুন ১৬৫ বছরে সূর্যকে এক বার পরিক্রমণ করে। এর উপগ্রহ ২টি- ট্রাইটন ও নেরাইড। নেপচুন অত্যন্ত শীতল।

প্লুটো (Pluto) : সৌরজগতের নবম এই গ্রহটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এর ব্যাস ৫,৯১০ কিলোমিটার। প্লুটো ২৪৮ বছরে সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করে এবং সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। এর ১টি উপগ্রহ রয়েছে যার নাম ক্যারন (Charon)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানুপুঞ্জ ও ধূমকেতু নিয়ে গঠিত–

ক. মহাশূন্য　　খ. সৌরজগত
গ. পৃথিবী　　ঘ. বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

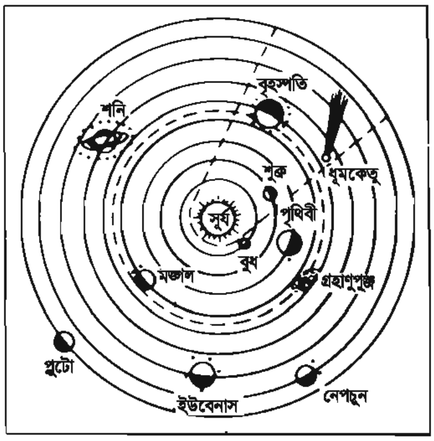
২। পৃথিবীই উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর বসবাসের উপযোগী, কারণ–

i. বায়ুমণ্ডলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন আছে
ii. বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের তুলনায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি
iii. বায়ুমণ্ডলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও তাপমাত্রা আছে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও iii

নিচের চিত্র থেকে ৩–৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৩। চিত্রটি–

i. পৃথিবীর
ii. মহাশূন্যের
iii. সৌরজগতের

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

৪। কোন গ্রহকে পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যাতারা আর পূর্ব আকাশে শুকতারা রূপে দেখা যায় ?

ক. শুক্র　　খ. শনি
গ. বুধ　　ঘ. বৃহস্পতি

৫। মঙ্গল গ্রহ বসবাসের তখনই উপযোগী হবে যখন–

ক. গড় উত্তাপ হিমাঙ্কের নিচে থাকবে
খ. গড় উত্তাপ হিমাঙ্কের সমান থাকবে
গ. গড় উত্তাপ হিমাঙ্কের উপরে থাকবে
ঘ. গড় উত্তাপের সাথে অক্সিজেনের সামঞ্জস্য থাকবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভূপৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়

পৃথিবীপৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য স্থানটি নিরক্ষরেখা থেকে কত উত্তরে বা দক্ষিণে এবং মূল মধ্যরেখা থেকে কত পূর্বে বা পশ্চিমে এই দুই পরিমাপ জানা দরকার। পৃথিবীর আকার যদি সমতল হত তবে ঐ দূরত্ব মিটার, গজ ইত্যাদিতে প্রকাশ করা যেত; কিন্তু গোলাকার বলে এই দূরত্ব কৌণিক মাপে প্রকাশ করা অধিকতর সুবিধাজনক।

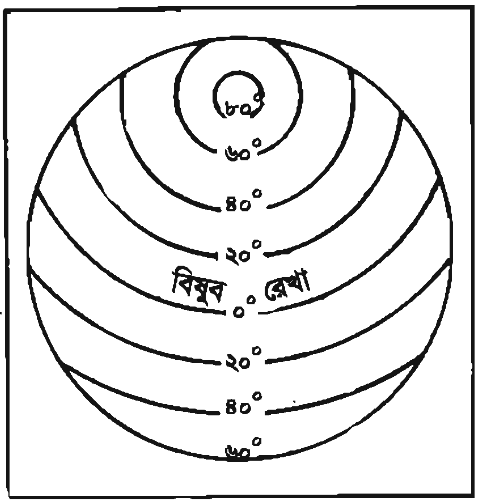
অক্ষ : পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভূকেন্দ্রকে ছেদ করে সরাসরি উত্তর-দক্ষিণে যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে অক্ষ (Axis) বা মেরুরেখা বলে। অক্ষের উত্তর-প্রান্ত বিন্দুকে উত্তর মেরু (North Pole) বা সুমেরু ও দক্ষিণ-প্রান্ত বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু (South Pole) বা কুমেরু বলে।

সমাক্ষরেখা : অক্ষাংশ

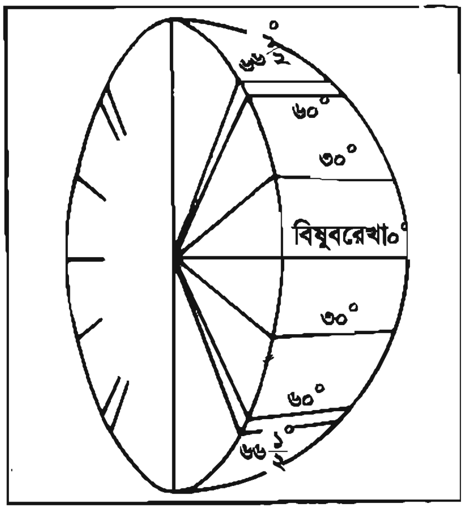
দুই মেরু থেকে সমান দূরে ভূগোলকের ওপর পূর্ব-পশ্চিমে যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা বলে। এই রেখা পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে পূর্ণবৃত্তরূপে বেষ্টন করে আছে। পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টনকারী বৃত্তসমূহের মধ্যে নিরক্ষরেখা সর্ববৃহৎ বলে একে মহাবৃত্ত বা গুরুবৃত্ত বলে। নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি সমান ভাগে ভাগ করেছে। উত্তর ভাগের নাম উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ ভাগের নাম দক্ষিণ গোলার্ধ।

নিরক্ষরেখার সমান্তরালে নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে অনেকগুলো রেখা কল্পনা করা হয়েছে এগুলোকে সমাক্ষরেখা বা অক্ষরেখা বলে। সমাক্ষরেখাগুলো পূর্ব-পশ্চিমে পৃথিবীকে বেষ্টনকারী একেকটি পূর্ণবৃত্ত। উত্তর-দক্ষিণে এদের পরিধি কমতে কমতে মেরুদ্বয়ে বিন্দুতে পরিণত হয়।

নিরক্ষরেখা ও উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরুর মধ্যে কৌণিক দূরত্ব পৃথিবীর মোট পরিধির এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৩৬০° এর ৪ ভাগের ১ ভাগ = ৯০° বা এক সমকোণ। নিরক্ষরেখাকে কেন্দ্র করে উত্তরে বা দক্ষিণে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের অক্ষাংশ বলে। নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ ০°। জ্যামিতির কোণের ন্যায় অক্ষাংশের পরিমাপের একককে ডিগ্রি (°) বলে। এর ভগ্নাংশকে যথাক্রমে মিনিট (′), সেকেন্ড (″)



চিত্র ৩.৪ : সমাক্ষরেখা



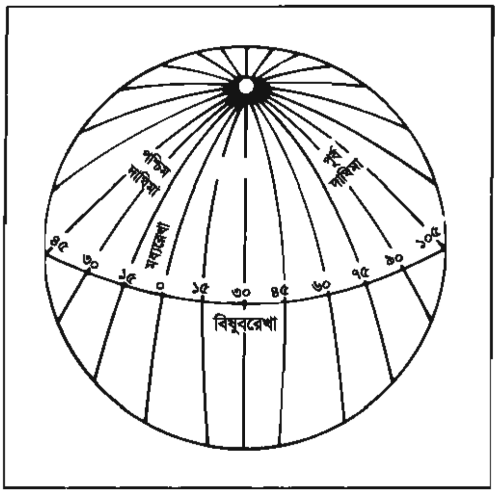
চিত্র ৩.৫ : অক্ষাংশ

ইত্যাদিতে প্রকাশ করা হয়। নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী অক্ষাংশসমূহকে নিম্ন অক্ষাংশ এবং মেরুদেশীয় অক্ষাংশসমূহকে উচ্চ অক্ষাংশ বলে। বিষুবরেখা থেকে ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশকে কর্কটক্রান্তি রেখা ও ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশকে মকরক্রান্তি রেখা বলে। নিরক্ষরেখা থেকে ৯০° দক্ষিণ অক্ষাংশকে দক্ষিণ মেরু বলে।

উত্তর গোলার্ধের যেকোনো স্থানের অক্ষাংশ আকাশে ধ্রুবতারার অবস্থান থেকে নির্ণয় করা যায়। কিন্তু দিনে অথবা দক্ষিণ গোলার্ধে ধ্রুবতারার সাহায্যে অক্ষাংশ নির্ণয় সম্ভব নয়। সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে মধ্যাহ্ন সূর্যের অবস্থান থেকে পৃথিবীর যেকোনো স্থানের অক্ষাংশ নিরূপণ করা যায়।

মধ্যরেখা : দ্রাঘিমা

সমাক্ষরেখা থেকে অবস্থান জানার জন্য পৃথিবীর দুই মেরুকে সংযুক্ত করে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত অনেকগুলো রেখা কল্পনা করা হয়েছে, এগুলোকে দ্রাঘিমারেখা বা মধ্যরেখা বলে। লন্ডন শহরের নিকটবর্তী গ্রিনিচ মান মন্দিরের ওপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যে রেখা কল্পনা করা হয়েছে তাকে মূল মধ্যরেখা বলে। মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্বে বা পশ্চিমে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের দ্রাঘিমা বলে। মূল মধ্যরেখার মান ০°। পূর্বে ১৮০° দ্বারা পৃথিবীর পরিধিকে দুইটি সমান অংশে ভাগ করা হয়েছে। এর ফলে ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা ও ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা মূলত একই মধ্যরেখায় পড়ে।



চিত্র ৩.৬ : দ্রাঘিমারেখা

নিরক্ষরেখার ওপর এক এক ডিগ্রি অন্তর দ্রাঘিমারেখাগুলো এক একটি অর্ধবৃত্ত। প্রতিটি দ্রাঘিমারেখা নিরক্ষরেখাকে লম্বভাবে ছেদ করেছে। গিনি উপসাগরের কোনো এক স্থানে মূল মধ্যরেখা ও নিরক্ষরেখা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করেছে। এ স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা উভয়ই ০°। মধ্যরেখাগুলো একে অন্যের সমান। কিন্তু সমান্তরাল নয়।

স্থানীয় সময় ও গ্রিনিচের সময় থেকে কোনো স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যায়। পৃথিবীর ৩৬০° আবর্তন করতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। সুতরাং এটি প্রতি ঘণ্টায় ১৫°, প্রতি ৪ মিনিটে ১° এবং প্রতি ৪ সেকেন্ডে ১ মিনিট পথ অতিক্রম করে।

পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে বলে পূর্বে অবস্থিত স্থানসমূহে আগে সূর্যোদয় হয়। কোনো স্থানের সময় বেলা ২টা হলে তার ১° পূর্বের স্থানে সময় বেলা ২টা ৪ মিনিট এবং ১° পশ্চিমের স্থানে বেলা ১টা ৫৬ মিনিট হবে। গ্রিনিচে যখন মধ্যরাত্রি তখন কোনো স্থানে বিকাল ৪টা হলে উক্ত স্থানের দ্রাঘিমা ৬০° পশ্চিম হবে। কারণ দুই স্থানের ৪ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানের জন্য দ্রাঘিমার ব্যবধান ৪ X ১৫° = ৬০°। আবার গ্রিনিচের চেয়ে স্থানটির সময় কম বলে সেটা পশ্চিম দ্রাঘিমায় অবস্থিত। দ্রাঘিমার অবস্থান থেকে সময় ও সময়ের অবস্থান থেকে দ্রাঘিমা নির্ণয়ের উদাহরণ পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

১। ঢাকা ও চেন্নাইয়ের দ্রাঘিমা যথাক্রমে ৯০° এবং ৮০°১৫ পূর্ব। ঢাকায় যখন মধ্যাহ্ন চেন্নাইয়ের স্থানীয় সময় তখন কত ?

ঢাকা ও চেন্নাইয়ের মধ্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য, ৯০° - ৮০°১৫° = ৯°৪৫

৯°৪৫ দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হবে,

১° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট।

অতএব, ৯° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৯° × ৪′ = ৩৬ মিনিট।
১′ দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ সেকেন্ড
সুতরাং, ৪৫′ দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪৫′ × ৪″ = ১৮০ সেকেন্ড = ৩ মিনিট।
সুতরাং, ৯°৪৫′ দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৩৬ মিনিট + ৩ মিনিট = ৩৯ মিনিট।
চেন্নাই ঢাকার পশ্চিমে অবস্থিত (চেন্নাইয়ের দ্রাঘিমা কম) সেজন্য চেন্নাইয়ের সময় কম।
সুতরাং, ঢাকায় যখন মধ্যাহ্ন অর্থাৎ দুপুর ১২টা তখন চেন্নাইয়ের স্থানীয় সময় হবে, ১২টা - ৩৯ মিনিট = সকাল ১১টা ২১ মিনিট।
উত্তর : চেন্নাইয়ের স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ২১ মিনিট।

২। ঢাকা ও সিউলের সময়ের ব্যবধান ২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট। ঢাকার দ্রাঘিমা ৯০° পূর্ব হলে সিউলের দ্রাঘিমা কত (সিউল ঢাকার পূর্বে অবস্থিত) ?

সিউল ঢাকার পূর্বে অবস্থিত হওয়ায় এর দ্রাঘিমা বেশি হবে।
ঢাকা ও সিউলের সময়ের ব্যবধান ২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট = ১৫২ মিনিট।
৪′ সময়ের ব্যবধানে দ্রাঘিমার ব্যবধান হয় ১°
সুতরাং, ১′ সময়ের ব্যবধানে দ্রাঘিমার ব্যবধান হয় $(\frac{১}{৪})°$
সুতরাং, ১৫২′ সময়ের ব্যবধানে দ্রাঘিমার ব্যবধান হয় $(\frac{১ \times ১৫২}{৪})° = ৩৮°$
অতএব, সিউলের দ্রাঘিমা ৯০° + ৩৮° = ১২৮°
উত্তর : সিউলের দ্রাঘিমা ১২৮° পূর্ব।

স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময়

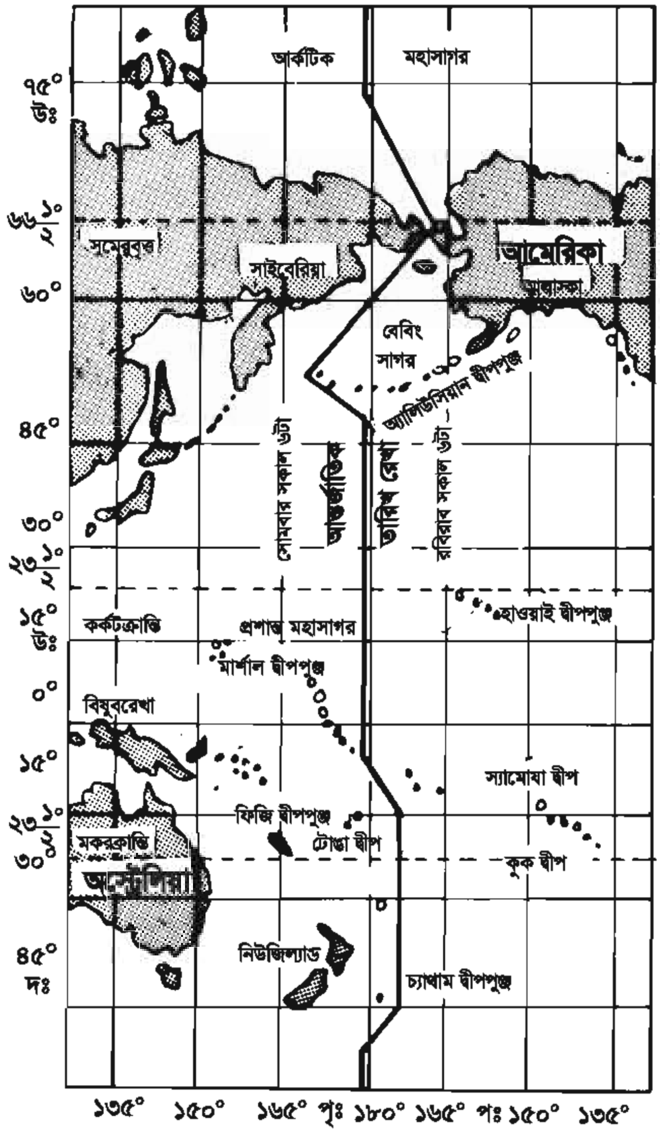
স্থানীয় সময় : আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের অবস্থান দেখে যে সময় নির্ণয় করা হয় তাকে স্থানীয় সময় বলে। কোনো স্থানে সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর আসে, তখন সেখানে বেলা ১২টা ধরে যে সময় গণনা করা হয় তা ঐ স্থানের স্থানীয় সময়।

প্রমাণ সময় : একই দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত সকল স্থানের স্থানীয় সময় এক। কিন্তু একই অক্ষরেখায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থানের স্থানীয় সময় এক হয় না। ফলে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বড় বড় দেশে যদি প্রত্যেক গ্রাম বা শহর আপন আপন স্থানীয় সময় ব্যবহার করে তাহলে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সময়ের পার্থক্যের জন্য আন্তর্জাতিক সময়সূচিতে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। যাতায়াত ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। কাজেই দেশের সকল স্থানে সময়ের সমতা রক্ষার জন্য দেশের মধ্যবর্তী কোনো স্থানের বা কোনো প্রসিদ্ধ শহরের স্থানীয় সময় সারাদেশের জন্য ব্যবহারিক সময়রূপে নির্দিষ্ট করা হয়। এ সময়কে ঐ দেশের প্রমাণ সময় বলে। ৯০° দ্রাঘিমারেখা বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত, এ কারণে ঐ দ্রাঘিমার স্থানীয় সময়কে বাংলাদেশের প্রমাণ সময়রূপে ধরা হয়। বাংলাদেশের প্রমাণ সময় গ্রিনিচ সময় অপেক্ষা ৬ ঘণ্টা অগ্রবর্তী।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

প্রতি ১৫° দ্রাঘিমার ব্যবধানের জন্য ১ ঘণ্টা সময়ের পার্থক্য ঘটে। এ হিসেব অনুযায়ী মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হলে সময় বাড়ে এবং পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে সময় কমে। সুতরাং, গ্রিনিচে যখন রবিবার সকাল ৬টা তখন ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমাতে সন্ধ্যা ৬টা। আবার সে সময়ে ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমায় স্থানীয় সময় হবে পূর্ববর্তী দিন অর্থাৎ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা। কিন্তু ১৮০° পূর্ব এবং ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা মূলত একই রেখা। একই মধ্যরেখায় একই সঙ্গে শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ও রবিবার সন্ধ্যা ৬টা হতে পারে না। এ অসুবিধা দূর করার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর ১৮০° মধ্যরেখা বরাবর একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এই রেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করলে পূর্বগামী জাহাজ বা বিমান স্থানীয় সময়ের সঙ্গে মিল রাখার জন্য তাদের বর্ধিত সময় থেকে এক দিন বিয়োগ করে এবং পশ্চিমগামী জাহাজ বা বিমান তাদের কম সময়ের সঙ্গে এক দিন যোগ করে তারিখ গণনা করে থাকে। স্থলভাগের ওপর দিয়ে এ রেখা অতিক্রম করলে একই দেশে দুই রকম বার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ কারণে স্থলভাগ পরিহার করে রেখাটি এঁকে বেঁকে জলভাগের ওপর দিয়ে গেছে।



চিত্র ৩.৭ : আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। **অক্ষাংশ পরিমাপের একক–**

ক. ডিগ্রি　　খ. মিনিট

গ. সেকেন্ড　　ঘ. বিন্দু

২। **পৃথিবীপৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য জানা দরকার–**

i. নিরক্ষরেখা থেকে স্থানটি কত পূর্বে বা পশ্চিমে

ii. নিরক্ষরেখা থেকে স্থানটি কত উত্তরে বা দক্ষিণে

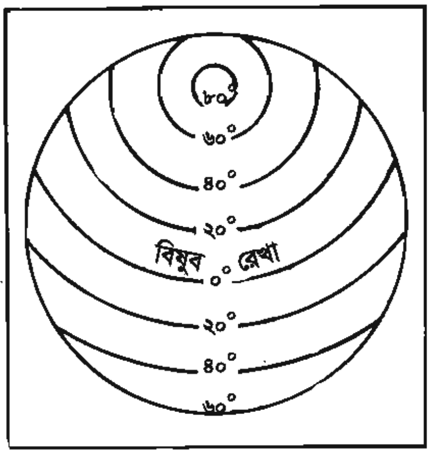
iii. মূল মধ্যরেখা থেকে স্থানটি কত পূর্বে বা পশ্চিমে

নিচের কোনটি সঠিক ?

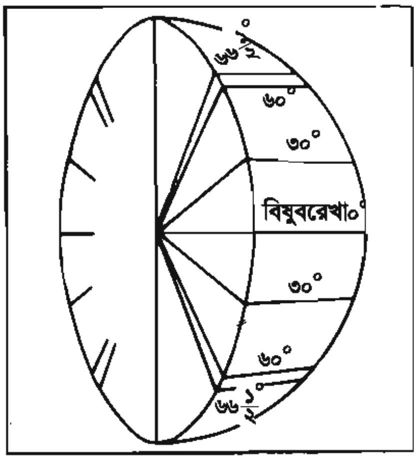
ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে ৩–৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



চিত্র ৩.৪ : সমাক্ষরেখা



চিত্র ৩.৫ : অক্ষাংশ

৩। চিত্রে আমরা কোন বিষয়টি দেখতে পাই–

ক. বিষুবরেখা মেরুরেখার সাথে ০° কোণ উৎপন্ন করে

খ. বিষুবরেখা মেরুরেখার সাথে ৫° কোণ উৎপন্ন করে

গ. উভয় রেখা সমান্তরাল

ঘ. বিষুবরেখা একেবেঁকে অতিক্রম করেছে

৪। চিত্রে দেখতে পাই–

i. মেরুরেখা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে সংযুক্ত করেছে

ii. মেরুরেখা বিষুবরেখাকে ছেদ করেছে

iii. মেরুরেখা ও বিষুবরেখা সমান্তরাল

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৫। উত্তর গোলার্ধে বিষুবরেখা

i. উত্তর দিকে

ii. উপরের দিকে

iii. দক্ষিণ দিকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পৃথিবীর গতি

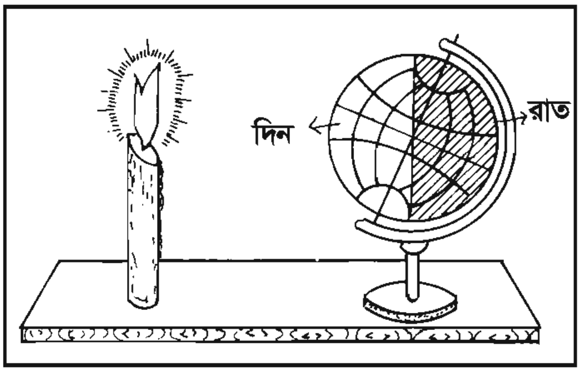
পৃথিবী গতিশীল। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পৃথিবী নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করছে। এছাড়া পৃথিবী নিজ অক্ষে সর্বদা আবর্তন করছে। পৃথিবী নিজ অক্ষে আবর্তনের সাথে সাথে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। এটিই পৃথিবীর গতি। পৃথিবীর গতি দুই প্রকার (১) আহ্নিক গতি ও (২) বার্ষিক গতি।

আহ্নিক গতি

পৃথিবী নিজ অক্ষে বা মেরুরেখায় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে। এভাবে এক বার আবর্তন করতে পৃথিবীর প্রায় ২৪ ঘণ্টা বা একদিন সময় লাগে। ঠিক হিসেবে এ সময় হল ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড। পৃথিবীর এই গতিকে আহ্নিক গতি (Diurnal Motion) বা দৈনিক গতি এবং এ সময়কে সৌরদিন বলা হয়। নিরক্ষরেখায় পৃথিবীর পরিধি সবচেয়ে বেশি তাই এখানে আহ্নিক গতির বেগ কম। পক্ষান্তরে মেরুদ্বয়ের দিকে পরিধি ক্রমশ কমতে থাকে বলে গতিও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

আহ্নিক গতির ফলাফল

(১) আহ্নিক গতির ফলে দিন ও রাত হয়। পৃথিবীর নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়। পৃথিবী গোলাকার বলে সূর্যের আলো একই সময়ে ভূপৃষ্ঠের সকল অংশে পড়ে না। আবর্তনের সময় যে অংশে আলো পড়ে সেখানে দিন এবং যে অংশ অন্ধকারে থাকে সেখানে রাত হয়।



চিত্র ৩.৮ : দিন রাত্রি সংঘটন

পরীক্ষা : একটি অন্ধকার ঘরে টেবিলের ওপর জ্বলন্ত মোমবাতিকে সূর্য এবং ভূগোলককে পৃথিবী ধরে জ্বলন্ত মোমবাতির সামনে ভূগোলকটিকে ঘুরালে দেখা যাবে বাতির সম্মুখের অংশ আলোকিত এবং তার বিপরীত অংশ অন্ধকার থাকে। আলোকিত অংশে দিন ও অন্ধকার অংশে রাত হয়। পৃথিবীর আলোকিত ও অন্ধকার অংশের মধ্যবর্তী বৃত্তাকার অংশকে ছায়াবৃত্ত বলে। সূর্যোদয়ের এবং সূর্যাস্তের অব্যবহিত আগের ও পরের সময়কে যথাক্রমে ঊষা ও গোধূলি বলে।

(২) আহ্নিক গতি সমুদ্রস্রোত ও বায়ুপ্রবাহের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তনের জন্য সমুদ্রস্রোত ও বায়ুপ্রবাহ সোজা উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত না হয়ে ফেরেলের সূত্র অনুসারে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়।

(৩) আহ্নিক গতির ফলে সময় গণনা করা যায়। পূর্ণ আবর্তনকে ২৪ ঘণ্টা ধরে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডে বিভক্ত করে সময় গণনা করা হয়।

(৪) আহ্নিক গতির জন্য পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের দিকে থাকে, চাঁদের আকর্ষণে সেখানের জলভাগে জোয়ার হয়।

(৫) আহ্নিক গতি না থাকলে পৃথিবীর অর্ধাংশে চিরকাল দিন ও বিপরীত অর্ধাংশে চিরকাল রাত থাকত।

বার্ষিক গতি

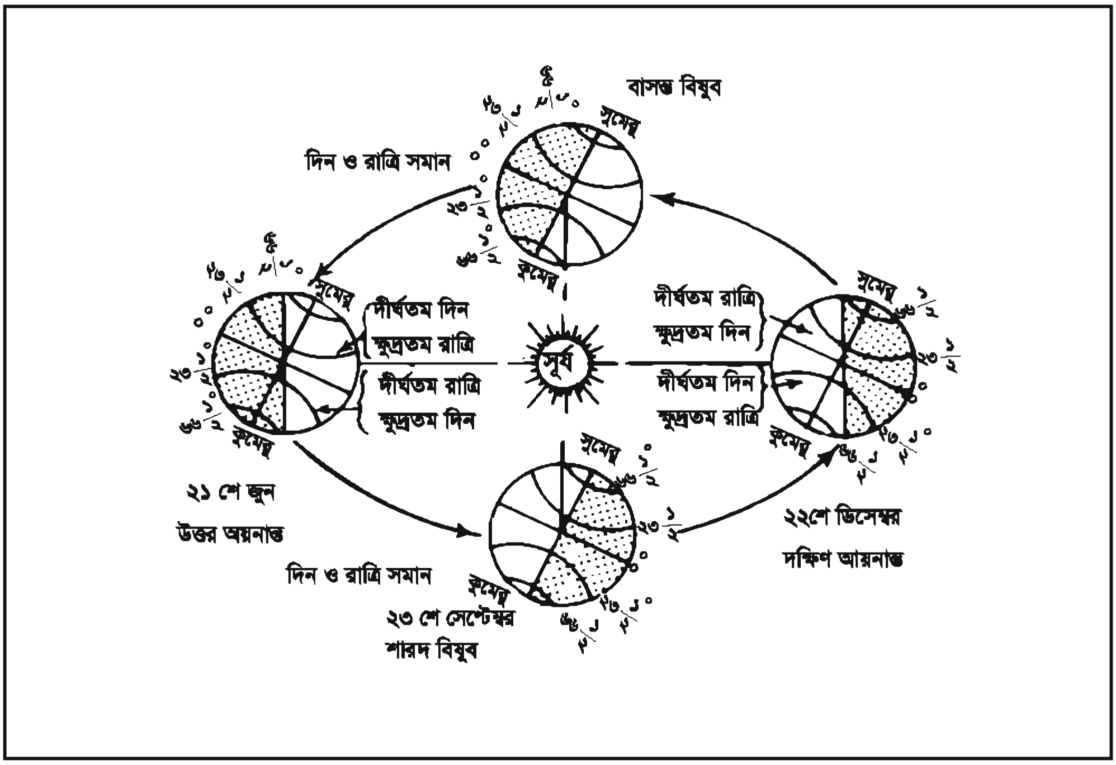
পৃথিবী নিজ অক্ষে অবিরাম ঘুরতে ঘুরতে একটি নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে, নির্দিষ্ট দিকে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করছে। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পৃথিবীর এ পরিক্রমণকে বার্ষিক গতি (Annual Motion) বলে। পৃথিবীর সূর্যকে পরিক্রমণ করতে এক বছর সময় লাগে। এ সময়কে সৌরবছর বলা হয়। এ গতির বেগ প্রতি সেকেন্ডে ২৯.৭৬ কিলোমিটার। বার্ষিক গতিতে পৃথিবী যে পথ অতিক্রম করে তার দৈর্ঘ্য ৯৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৫১ হাজার ৮২৭ কিলোমিটার এবং সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। প্রতি ৪ বছরে একদিন বাড়িয়ে ৩৬৬ দিনে বছর গণনা করা হয়। সে বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনের পরিবর্তে ২৯ দিনে ধরা হয়। এরূপ বছরকে অধিবর্ষ বা Leap Year বলে।

বার্ষিক গতির ফলাফল : বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীতে দিনরাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

দিনরাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ : (১) পরিক্রমণকালে পৃথিবীর মেরুরেখা ধ্রুবতারাভিমুখী হয়ে কক্ষতলের সঙ্গে সর্বদাই প্রায় ৬৬.৫° কোণে হেলে থাকে। (২) নিরক্ষরেখার সমতল কক্ষতলের সঙ্গে সর্বদাই ২৩.৫° কোণে হেলে থাকে। (৩) পৃথিবীর অক্ষরেখা সকল অবস্থানেই পরস্পর সমান্তরাল থাকে।

প্রক্রিয়া : সূর্যকে পরিক্রমণকালে কক্ষপথে পৃথিবীর চারটি অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যথা- ২১শে জুন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২২শে ডিসেম্বর ও ২১শে মার্চ।

২১শে জুন : পৃথিবী সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণকালে ২১শে জুন কক্ষপথে এমন এক অবস্থানে পৌঁছে যেখানে উত্তর মেরু সূর্যের দিকে সর্বাপেক্ষা বেশি (২৩.৫°) ঝুঁকে থাকে এবং দক্ষিণ মেরু সূর্য থেকে সর্বাপেক্ষা দূরে সরে পড়ে। এই দিন মধ্যাহ্নে ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশে (কর্কটক্রান্তি রেখায়) সূর্যকিরণ লম্বভাবে (৯০° কোণে) পড়ে। এ দিন উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় এবং রাত্রি সবচেয়ে ছোট হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে বিপরীত অবস্থা বিরাজ করে। সুমেরুবৃত্ত (৬৬.৫° উত্তর) থেকে উত্তরে উত্তর মেরু পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা দিন ও কুমেরুবৃত্ত (৬৬.৫° দক্ষিণ)



চিত্র ৩.৯ : দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি

থেকে দক্ষিণে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা রাত থাকে। এই দিন সূর্য উত্তরায়ণের শেষ সীমায় পৌঁছে বলে এই দিনকে সূর্যের উত্তর অয়নান্ত বলে।

২৩শে সেপ্টেম্বর : ২১শে জুনের পর উত্তর মেরু সূর্য থেকে দূরে সরতে থাকে এবং দক্ষিণ মেরু নিকটে আসতে থাকে। এতে উত্তর গোলার্ধে ক্রমশ দিন ছোট ও রাত বড় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় ও রাত ছোট হতে থাকে। ২৩শে সেপ্টেম্বর পৃথিবী এমন এক স্থানে অবস্থান করে যখন উভয় মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে। এই দিন সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখায় ৯০° কোণে, সুমেরুবৃত্তে ও কুমেরুবৃত্তে ৬৬.৫° কোণে এবং মেরুদ্বয়ে ০° কোণে পতিত হয়। তাই এই দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয় এবং এই দিনকে শারদ বিষুব বলে। ২১শে মার্চ থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাস উত্তর মেরুতে অবিরত দিন ও দক্ষিণ মেরুতে অবিরত রাত থাকে।

২২শে ডিসেম্বর : ২৩শে সেপ্টেম্বরের পর উত্তর মেরু সূর্য থেকে আরো দূরে সরতে থাকে এবং দক্ষিণ মেরু অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী হয়। ফলে উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ কমতে থাকে এবং রাত্রি বড় হতে থাকে। এভাবে ২২শে ডিসেম্বর পৃথিবী এমন এক অবস্থানে পৌঁছে যখন দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে সবচেয়ে বেশি হেলে থাকে (২৩.৫°)। এই দিন সূর্যকিরণ মকরক্রান্তি রেখায় লম্বভাবে (৯০° কোণে) পতিত হয়। এ তারিখে দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় এবং রাত সবচেয়ে ছোট হয়। উত্তর গোলার্ধে এর বিপরীত অবস্থা বিরাজ করে। দক্ষিণায়নে এটি সূর্যের শেষ অবস্থান। একে দক্ষিণ অয়নান্ত বলে। এই দিন ৬৬.৫° উত্তর অক্ষাংশ থেকে উত্তরে উত্তর মেরু পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা রাত্রি এবং ৬৬.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা দিন হয়।

২১শে মার্চ : ২২শে ডিসেম্বরের পর পৃথিবী আপন কক্ষপথে আরো অগ্রসর হলে উত্তর মেরু ক্রমশ সূর্যের নিকটে আসে এবং দক্ষিণ মেরু দূরে সরে যায়। এতে উত্তর গোলার্ধে দিন বড় এবং রাত ছোট হতে থাকে। অবশেষে ২১শে মার্চ পৃথিবী আপন কক্ষপথের এমন এক স্থানে পৌঁছে যেখানে উভয় মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে। এই দিন ২৩শে সেপ্টেম্বরের মতো দিনরাত্রি সমান হয়। পৃথিবীর এ অবস্থাকে বাসন্ত বিষুব বলে। ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাস উত্তর মেরুতে অবিরত রাত এবং দক্ষিণ মেরুতে অবিরত দিন থাকে। ২১শে মার্চের পর পৃথিবী আপন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে পুনরায় ২১শে জুনের অবস্থায় ফিরে যায়। এভাবে পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য দিনরাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

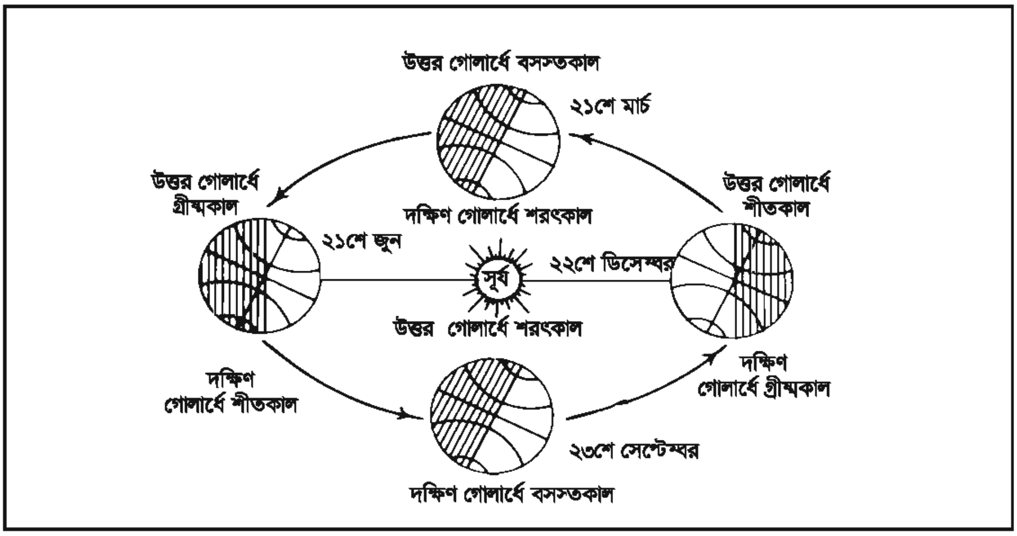
ঋতু পরিবর্তন

বার্ষিক গতির জন্য সূর্যরশ্মি কোথাও লম্বভাবে আবার কোথাও তির্যকভাবে পতিত হয় এবং দিনরাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। লম্বভাবে পতিত সূর্যরশ্মি কম বায়ুস্তর ভেদ করে আসে বলে ভূপৃষ্ঠকে অধিক উত্তপ্ত এবং তির্যকভাবে পতিত সূর্যরশ্মি যে কেবল অধিক বায়ুস্তর ভেদ করে আসে তা নয়, এটি লম্বভাবে পতিত রশ্মি অপেক্ষা অধিক স্থানব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে লম্বভাবে পতিত রশ্মি অপেক্ষা তির্যকভাবে পতিত রশ্মি এলাকায় উত্তাপের পরিমাণ কম হয়। আবার কোনো স্থানে রাত অপেক্ষা দিন বড় হলে সে স্থানে বায়ুমণ্ডল অধিক উত্তপ্ত হয়। এতে বছরের বিভিন্ন সময়ে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র তাপের তারতম্য হয় এবং ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

প্রক্রিয়া : সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবীর চারটি অবস্থান থেকে ঋতু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল : ২১শে জুন সূর্যের উত্তরায়ণের শেষ দিন। এই দিন সূর্যরশ্মি কর্কটক্রান্তির ওপর লম্বভাবে পতিত হয়। ফলে এখানে ঐ দিন দীর্ঘতম দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি হয়। ২১শে জুনের দেড় মাস পূর্ব থেকে দেড় মাস পর পর্যন্ত মোট তিন মাস উত্তর গোলার্ধে উত্তাপ বেশি থাকে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। এ সময়ে সূর্যের তির্যক কিরণের জন্য দক্ষিণ গোলার্ধে দিন ছোট ও রাত বড় হয় বলে সেখানে তখন শীতকাল।

উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল : ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার ওপর লম্বভাবে পড়ে এবং সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়। সেজন্য এ তারিখের দেড় মাস পূর্বে ও দেড় মাস পরে উত্তাপ মধ্যম রকমের হয়ে থাকে। এসময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল।



চিত্র ৩.১০ : ঋতু পরিবর্তন

উত্তর গোলার্ধে শীতকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল : ২২শে ডিসেম্বর সূর্যের দক্ষিণায়নের শেষ দিন অর্থাৎ এই দিন সূর্য মকরক্রান্তির ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে এখানে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়। এ তারিখের দেড় মাস পূর্বে ও পরে দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং বিপরীত কারণে উত্তর গোলার্ধে শীতকাল থাকে।

উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল : ২১শে মার্চ তারিখে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে। এই দিন সূর্য নিরক্ষরেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়। ২১শে মার্চের দেড় মাস পূর্ব থেকে দেড় মাস পর পর্যন্ত এই তিন মাস উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল।

পৃথিবীতে প্রধানত চারটি ঋতু দেখা যায়। তবে জলবায়ুর বিশেষত্বের জন্য ঋতুর সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে। যেমন, আমাদের দেশে শীতের প্রথম ভাগকে হেমন্তকাল ও গ্রীষ্মের শেষ ভাগকে বর্ষাকাল বলে। আবার নিরক্ষরেখায় ঋতু পরিবর্তন হয় না। এখানে সর্বত্র দিনরাত্রি সমান। গ্রীষ্ম ঋতু এখানকার বৈশিষ্ট্য।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পৃথিবী নিজ অক্ষে কোন দিকে আবর্তন করে?

ক. পূর্ব থেকে পশ্চিমে
খ. পশ্চিম থেকে পূর্বে
গ. উত্তর থেকে দক্ষিণে
ঘ. দক্ষিণ থেকে উত্তরে

২। ২১ শে জুনে পৃথিবীর অবস্থা হচ্ছে–

i. দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে থাকে
ii. উত্তর মেরু সূর্যের দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে থাকে
iii. উভয় মেরু সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটে থাকে।

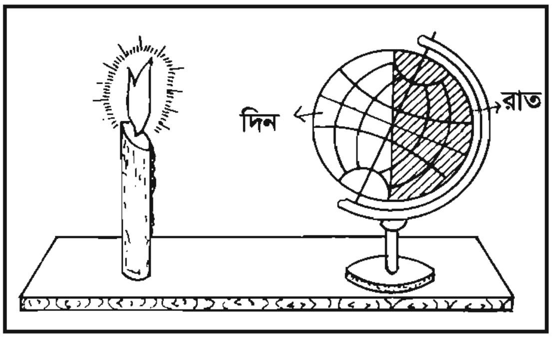
নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

৩। কোন সময়ে উত্তর মেরুতে অবিরত ছয়মাস দিন থাকে ?

ক. ২১শে জুন থেকে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত
খ. ২২শে ডিসেম্বর থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত
গ. ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে মার্চ পর্যন্ত
ঘ. ২১শে মার্চ থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

নিচের চিত্রের আলোকে ৪–৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



দিন রাত্রি সংঘটন

৪। উপরে চিত্রটি কীসের ফলাফল দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে?

ক. বার্ষিক গতির খ. সমুদ্রস্রোতের
গ. আহ্নিক গতির ঘ. বায়ুপ্রবাহের

৫। 'ছায়াবৃত্ত' বলতে বুঝায়–

i. পৃথিবীর আলোকিত বা অন্ধকার অংশের বিপরীত অংশকে
ii. পৃথিবীর আলোকিত ও অন্ধকার অংশের মধ্যবর্তী বৃত্তাকার অংশকে
iii. পৃথিবীর আলোকিত ও অন্ধকার সমন্বয়ে গঠিত বৃত্তাকার অংশকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৬। চিত্রে প্রদর্শিত পৃথিবীর আবর্তন না থাকলে ফলাফল কী হত?

ক. সারা পৃথিবী চিরকাল দিন থাকত
খ. সারা পৃথিবী ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত থাকত
গ. সারা পৃথিবী চিরকাল রাত থাকত
ঘ. অর্ধেক পৃথিবী চিরকাল রাত ও বিপরীত অর্ধেক চিরকাল দিন থাকত

৭। সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরের সময়কে বলে–

ক. সন্ধ্যা খ. রাত
গ. গোধূলি ঘ. নিশি

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাংলাদেশের দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির তথ্য নিচের সারণিতে দেখানো হল :

সময়	দিবারাত্রির তথ্য
২১শে মার্চ	দিন এবং রাত্রি সমান
২১শে জুন	দিন বড় এবং রাত্রি ছোট
২৩শে সেপ্টেম্বর	দিন ও রাত্রি সমান
২২শে ডিসেম্বর	দিন ছোট এবং রাত্রি বড়

ক. দিবা–রাত্রি সংঘটনের কারণ কী?
খ. দিবা–রাত্রি হ্রাসবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যাখা কর।
গ. সারণিতে বর্ণিত সময়ে পৃথিবী পরিক্রমণের চিত্র অঙ্কন কর ।
ঘ. একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর পরিক্রমণের ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভূত্বক

পৃথিবীর ওপরের কঠিন আবরণকে ভূত্বক বলে। ভূত্বক অশ্মমণ্ডলের উপরিভাগ। ভূত্বকের গড় গভীরতা প্রায় ১৭ থেকে ৪৮ কিলোমিটার। ভূত্বকের যে অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপরে রয়েছে তা স্থলভাগ। স্থলভাগের অনেক নিচে এবং সমুদ্রের তলদেশের নিচেও ভূত্বক বিস্তৃত। প্রাকৃতিক কারণে ভূত্বকের সর্বাধিক পরিবর্তন ঘটে। ভূত্বক বিভিন্ন প্রকার শিলা দ্বারা গঠিত।

ভূত্বকের গঠন

পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে সূর্য থেকে। প্রথম দিকে পৃথিবী সূর্যের মতো একটি জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ছিল। কোটি কোটি বছরের ঘূর্ণনের মধ্য দিয়ে তাপ বিকিরণ করতে করতে পৃথিবী শীতল ও ঘনীভূত হতে থাকে। এভাবে পৃথিবীর চারপাশে কঠিন আবরণের সৃষ্টি হয়। এ কঠিন আবরণই ভূত্বক। এ ভূত্বক সৃষ্টি হতে বহু বছর লেগেছে। পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন হলেও অভ্যন্তর ভাগ উত্তপ্ত ও গলিত অবস্থায় রয়েছে। উত্তপ্ত পদার্থ শীতল হলে সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে ভূত্বক উঁচুনিচু, বন্ধুর হয়। ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে অনেক ফাঁকও রয়ে যায়। ভূত্বকের অনেক অংশ এই ফাঁকে পড়ে বসে যায়। কোথাও তরল পদার্থ বেরিয়ে আসার চেষ্টায় ভূত্বককে স্ফীত করে তোলে। ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বে ভূপৃষ্ঠকে ঘিরে গ্যাস বায়ুমণ্ডল গঠন করে। ভূত্বকের অবনমিত অংশ সাগর ও মহাসাগরের সৃষ্টি করে। জলের ওপরের অংশ হয় মহাদেশ।

ভূত্বকের উপাদান

ভূত্বক **অক্সিজেন** (শতকরা ৪৭ ভাগ), **সিলিকন** (শতকরা ২৮ ভাগ), **অ্যালুমিনিয়াম** (শতকরা ৮ ভাগ), **লোহা** (শতকরা ৫ ভাগ), **ক্যালসিয়াম** (শতকরা ৩.৫ ভাগ), **সোডিয়াম** (শতকরা ২.৫ ভাগ), **পটাসিয়াম** (শতকরা ২.৫ ভাগ), **ম্যাগনেসিয়াম** (শতকরা ২.২ ভাগ) এই আটটি উপাদান দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন স্থানের উপাদানের মধ্যে পার্থক্য আছে। এ বিভিন্ন জাতীয় উপাদানের মিশ্রণে তৈরি হয় শিলা। শিলা কেবল কঠিন পাথর নয়। মার্বেল, চুনাপাথরের মতো কঠিন পাথর, কাঁকর, বালির মতো ক্ষুদ্র কণা, কাদার মতো নরম মাটিও শিলার অন্তর্ভুক্ত।

ভূত্বকের উপরিভাগ থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রায় ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত অশ্মমণ্ডল। এর প্রধান উপাদান সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম। অশ্মমণ্ডলের পরে অধিকতর ভারি পদার্থ সিলিকন ও ম্যাগনেসিয়াম দ্বারা গঠিত গুরুমণ্ডল। গুরুমণ্ডলের পরে কেন্দ্রমণ্ডল। কেন্দ্রমণ্ডলে অতি উত্তাপে এর উপাদান গলিত হলেও ওপরের চাপে শক্ত অবস্থায় আছে। কেন্দ্রমণ্ডলে লোহা ও নিকেলই প্রধান।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ভূত্বকের উপাদান–

ক. অক্সিজেন খ. নাইট্রোজেন
গ. কার্বন ডাই অক্সাইড ঘ. ম্যাংগানিজ।

২। অশ্মমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি আছে–

i. সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম
ii. সিলিকন ও ম্যাগনেশিয়াম
iii. সিলিকন ও নাইট্রোজেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

পৃথিবীর উপরের কঠিন আবরণকে ভূত্বক বলে। পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে সূর্য থেকে। বহু বছরের ঘূর্ণনের মধ্য দিয়ে তাপ বিকিরণ করতে করতে পৃথিবী শীতল ও ঘনীভূত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। লক্ষ করা গেছে যে, ভূত্বকের কোথাও কোথাও উঁচুনিচু ও বন্ধুর। ভূত্বকের অবনমিত অংশ সাগর ও মহাসাগরের সৃষ্টি করে।

৩। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ–

i. উত্তপ্ত ও গলিত
ii. উত্তপ্ত ও সংকুচিত
iii. শীতল ও ঘনীভূত

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

৪। ভূত্বক স্ফীত হয়–

i. তরল পদার্থ বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে
ii. শিলাস্তরে চ্যুতি ঘটলে
iii. তরল পদার্থ জমাট বাঁধলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৫। পৃথিবীর কোথাও পাহাড়, কোথাও সমতল ভূমি। এর কারণ হচ্ছে–

i. পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ উত্তপ্ত ও গলিত বলে
ii. পৃথিবীর অভ্যন্তরে অনেক ফাঁক আছে বলে
iii. উত্তপ্ত পদার্থ শীতল হয়ে সংকুচিত হয় বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিলা

ভূত্বক নানাজাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। এদের মধ্যে পাথর, নুড়ি, কাঁকর, বালি, খড়ি, কাদা প্রভৃতি প্রধান। ভূত্বক গঠনকারী ঐ সকল উপাদান নানা প্রকার খনিজের সংমিশ্রণে গঠিত। কাজেই আমরা বলতে পারি বিভিন্ন প্রকার খনিজ প্রাকৃতিক উপায়ে একত্রিত হয়ে যে পদার্থ গঠন করে, তাকে শিলা বলে। গ্রানাইটের মতো শক্ত বা কাদার মতো নরম যেমনই হোক না কেন সবই শিলা। অর্থাৎ ধূলিকণা থেকে নরম কাদা, কঠিন পাথর সবই শিলার অন্তর্ভুক্ত।

শিলার শ্রেণীবিভাগ

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের শিলা দেখা যায়। সব শিলা একভাবে সৃষ্টি হয় না। বিভিন্ন শিলা বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হয়।

উৎপত্তি অনুসারে শিলাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (১) **আগ্নেয় শিলা**, (২) **পাললিক শিলা** ও (৩) **রূপান্তরিত শিলা**।

আগ্নেয় শিলা

সৃষ্টির গোড়ার দিকে পৃথিবী উত্তপ্ত ছিল। এই উত্তপ্ত পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়। বিভিন্ন মিশ্রিত খনিজ পদার্থ গলিত অবস্থা থেকে তাপ বিকিরণ করে জমাট বেঁধে সরাসরি যে শিলায় পরিণত হয়েছে তাকে আগ্নেয় শিলা (Igneous Rock) বলে। অগ্নিময় অবস্থা থেকে এ শিলা সৃষ্টি হয়েছে বলে এর নাম আগ্নেয় শিলা।

আবার পৃথিবীর প্রথম পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে বলে এ শিলাকে প্রাথমিক শিলাও বলে। এ শিলায় কোনো স্তর ও জীবাশ্ম নেই বলে এর অপর নাম অস্তরীভূত শিলা। গ্রানাইট, ব্যাসল্ট, সিয়েনাইট, গ্যাব্রো, ডায়োরাইট ইত্যাদি এ শিলার অন্তর্ভুক্ত।

গঠন অনুসারে আগ্নেয় শিলা দুই প্রকার যথা– অন্তঃজ আগ্নেয় শিলা ও বহিঃজ আগ্নেয় শিলা।

অন্তঃজ আগ্নেয় শিলা : ভূগর্ভের তরল ম্যাগমা ভূঅভ্যন্তরে থেকেই যদি কঠিন শিলায় পরিণত হয় তবে একে অন্তঃজ আগ্নেয় শিলা বলে। যেমন, গ্রানাইট।

বহিঃজ আগ্নেয় শিলা : অভ্যন্তরীণ ম্যাগমা যদি ফাটল দিয়ে লাভা আকারে বেরিয়ে এসে ঠাণ্ডা হয়ে শিলায় পরিণত হয় তবে একে বহিঃজ আগ্নেয় শিলা বলে। যেমন, ব্যাসল্ট।

পাললিক শিলা

আগ্নেয় শিলা প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কাঁকর, কাদা, ধুলা, বালি ইত্যাদিতে পরিণত হয়। এরূপে ক্ষয়িত শিলাকণা নদীস্রোত, বায়ু ও হিমবাহ দ্বারা পরিবাহিত হয়ে পলল বা তলানিরূপে ক্রমান্বয়ে কোনো নিম্নভূমি, হ্রদ বা সাগরের তলদেশে জমাট বেঁধে শিলায় পরিণত হয়। পলি দ্বারা গঠিত হয় বলে এ শিলাকে পাললিক শিলা (Sedimentary Rock) বলে। স্তরে স্তরে জমা হয় বলে এর অপর নাম স্তরীভূত শিলা। চুনাপাথর, বেলেপাথর, কয়লা, জিপসাম, লোয়েস ইত্যাদি পাললিক শিলার উদাহরণ।

পাললিক শিলা তিনটি উপায়ে গঠিত হয়। প্রাকৃতিক উপায়ে গঠিত পাললিক শিলা হচ্ছে বেলেপাথর, কর্দম ইত্যাদি। চুনাপাথর, প্রবাল ইত্যাদি হচ্ছে জৈবিক উপায়ে গঠিত পাললিক শিলা। রাসায়নিক উপায়ে গঠিত পাললিক শিলা হচ্ছে জিপসাম, সৈন্ধব লবণ ইত্যাদি।

রূপান্তরিত শিলা

আগ্নেয় এবং পাললিক এই উভয় প্রকার শিলা অত্যধিক তাপ, প্রচণ্ড চাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হয়ে নতুন একপ্রকার শিলায় পরিণত হয়। এই নতুন শিলাকে রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত শিলা (Metamorphic Rock) বলে। যেমন, রূপান্তরিত হয়ে চুনাপাথর মার্বেলে, কর্দম স্লেটে, কয়লা গ্রাফাইটে, বেলেপাথর কোয়ার্টজাইটে, গ্রানাইট নিসে পরিণত হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন শিলাকে প্রাথমিক শিলা বলা হয় ?

ক. আগ্নেয় শিলা খ. স্তরীভুত শিলা
গ. পাললিক শিলা ঘ. রূপান্তরিত শিলা

২। প্রবাল গঠিত হয়–

ক. যান্ত্রিক উপায়ে খ. রাসায়নিক উপায়ে
গ. জৈবিক উপায়ে ঘ. জৈব রাসায়নিক উপায়ে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

শায়লা তার বান্ধবী শিখাকে নিয়ে যমুনা সেতু দেখতে যায়। সেতু দেখার সময় সে শিখাকে প্রশ্ন করে সেতু কী দিয়ে তৈরী? উত্তরে শিখা জানায় সিমেন্ট, ইট এবং রড দিয়ে। সে আরো জানায় সিমেন্ট চুনাপাথর থেকে তৈরী।

৩। সিমেন্ট কোন শ্রেণীর শিলা–

ক. আগ্নেয় শিলা খ. পাললিক শিলা
গ. রূপান্তরিত শিলা ঘ. অন্তঃজ আগ্নেয় শিলা

৪। যমুনা সেতু তৈরিতে যে শিলার প্রাধান্য পরিলক্ষিত–

i. আগ্নেয় শিলা
ii. পাললিক শিলা
iii. রূপান্তরিত শিলা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নবম শ্রেণীর ছাত্র সমীর তার মায়ের সাথে যমুনা সেতু দেখতে গিয়ে তার মাকে জিজ্ঞেস করে সেতু কী দিয়ে তৈরী। তার মা তাকে জানায় যে, সেতু তৈরী করার জন্য ইট, বালু, সিমেন্ট এবং রডের প্রয়োজন হয়। সমীর তার মাকে আবার জিজ্ঞেস করে সিমেন্ট তৈরী করার জন্য কীসের প্রয়োজন। মা তাকে জানায় যে সিমেন্ট একটি শিলা।

ক. শিলা কী?
খ. আগ্নেয় শিলা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
গ. পাললিক শিলার ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে জিনিসের নতুনত্ব সৃষ্টি হয় বুঝিয়ে লিখ।
ঘ. আগ্নেয় ও পাললিক শিলা কীভাবে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয় তা বিশ্লেষণ কর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভূত্বকের আকস্মিক পরিবর্তন

ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন

ভূপৃষ্ঠ বিভিন্ন রকম শিলায় গঠিত। ভূপৃষ্ঠ পরিবর্তনশীল। ভূগর্ভ যতই ঠাণ্ডা হচ্ছে সেখানকার পদার্থের আয়তন ততই হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে ভূগর্ভে সর্বদাই একটা আলোড়ন চলছে। আর সে কারণেই ভূপৃষ্ঠ কোথাও নেমে যাচ্ছে আবার কোথাও নিচের শিলাস্তর অনেকখানি ফেটে গিয়ে ভূগর্ভে বসে যাচ্ছে। এই আলোড়নের ফলেই সর্বদা ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন হচ্ছে। ভূগর্ভের তাপ, চাপ ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবে এ পরিবর্তন ঘটছে। এসব কারণে ভূত্বক কোথাও উত্থিত হচ্ছে কোথাও অবনমিত হচ্ছে। কোথাও সংকুচিত আবার কোথাও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ভূপৃষ্ঠের এই পরিবর্তন দুই প্রকারে সংঘটিত হয়। যথা– (১) আকস্মিক পরিবর্তন ও (২) ধীর পরিবর্তন। আকস্মিক পরিবর্তন দুই উপায়ে হয়ে থাকে– একটি হচ্ছে ভূমিকম্প ও অন্যটি অগ্ন্যুৎপাত।

ভূমিকম্প

প্রাকৃতিক কারণবশত পৃথিবীর কঠিন ভূত্বকের কোনো কোনো অংশ সময়ে সময়ে ক্ষণিকের জন্য কেঁপে ওঠে। এই কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। এই কম্পন প্রচণ্ড বা মৃদু হতে পারে।
ভূঅভ্যন্তরে যে স্থানে ভূকম্পনের উৎপত্তি হয় তাকে কেন্দ্র (Centre বা Focus) বলে। কেন্দ্রের সোজা ওপরে ভূপৃষ্ঠস্থ বিন্দুর নাম উপকেন্দ্র (Epicentre)। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ভূঅভ্যন্তরের প্রায় ৩২ কিলোমিটার-এর মধ্যে অবস্থিত থাকে। কম্পনের বেগ উপকেন্দ্রে সর্বাপেক্ষা বেশি। আর এই বেগ উপকেন্দ্র থেকে ধীরে ধীরে চারদিকে কমে যায়। সীসমোগ্রাফ (Seismograph) যন্ত্রের সাহায্যে ভূকম্পনের গতি ও তীব্রতা পরিমাপ করা যায়।

ভূমিকম্পের কারণ

(১) কোনো কারণে পাহাড় ও পর্বত থেকে বৃহৎ শিলাখণ্ড ভূত্বকের ওপর ধসে পড়লে ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

(২) কোনো কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বড় রকমের শিলাচ্যুতি হলে বা শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি হলে ভূমিকম্প হয়।

(৩) তাপ বিকিরণের ফলে ভূগর্ভ সংকুচিত হলে ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরে ভারের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে যে পরিবর্তন ঘটে, তাতে ভূপৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে।

(৪) ভূগর্ভে সঞ্চিত বাষ্পের চাপ অধিক হলে তা ভূত্বকের নিম্নভাগে ধাক্কা দেয় ফলে ভূমিকম্প হয়।

(৫) এছাড়া ভূগর্ভস্থ চাপের হ্রাস, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ওপরের প্রবল চাপ, গুহার ভাঙন, খনির ভাঙন, হিমবাহের প্রভাব ও ভূঅভ্যন্তরে ভূপৃষ্ঠের পানি প্রবেশ প্রভৃতি কারণেও ভূমিকম্প হয়।

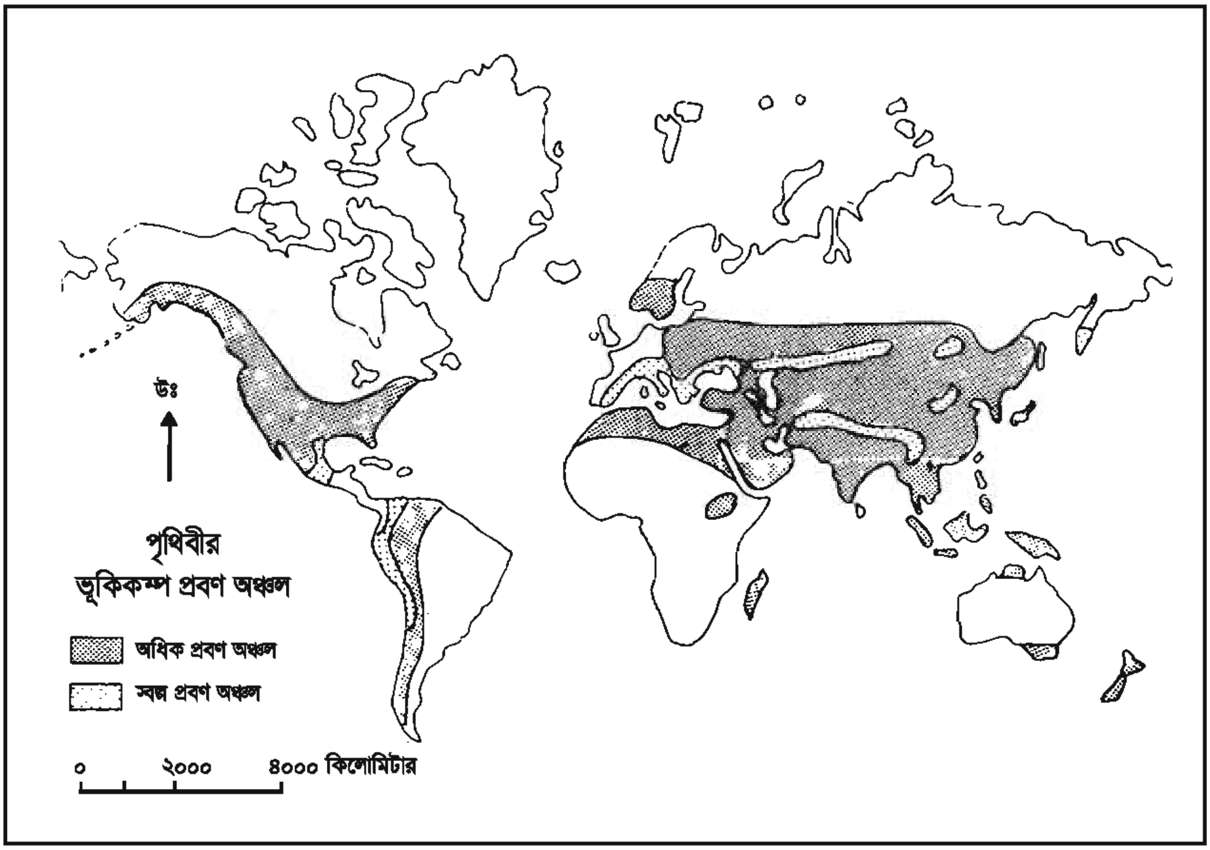
ভূমিকম্পের ফলাফল

ভূমিকম্পের ফলে ভূত্বকে অসংখ্য ফাটল ও চ্যুতির সৃষ্টি হয়। শিলাস্তরে ভাঁজ (Fold) পড়ে। কখনো সমুদ্রতলের অনেক স্থান উপরে উত্থিত হয়ে দ্বীপের সৃষ্টি হয়। আবার কখনো স্থলভাগের অনেক স্থান বসে যায় ও জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। নদীর ওপর ভূমিকম্পের প্রভাব ব্যাপক। ভূমিকম্পের ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে নদী শুকিয়ে যায়।

ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে পর্বতগাত্র থেকে হিমানিসম্প্রপাত (Avalanche) ও শিলাপাত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ফলে বন্যা দেখা দেয়। ভূমিকম্পের ফলে অগণিত মানুষ, জীবজন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অসংখ্য ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বৃক্ষাদি নষ্ট হয়।

ভূমিকম্প-প্রবণ অঞ্চল

ভূতাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক কারণে কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলকে পৃথিবীর ভূমিকম্পমণ্ডলরূপে বিবেচনা করা হয়। এগুলো হল হিমালয়, আল্পস, রকি, আন্দিজ প্রভৃতি ভঙ্গিল পর্বতের পাদদেশ, জাপান, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দ্বীপের খাড়া দুর্বল অংশ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমভাগ, প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল, ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী তুরস্ক এবং পামীর মালভূমি। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের তলদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও আসামে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়।



চিত্র ৩.১১ : পৃথিবীর ভূমিকম্প-প্রবণ অঞ্চল

পৃথিবীর ভূমিকম্প-প্রবণ জায়গাগুলো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল জুড়ে আছে। প্রধান অঞ্চলটি দক্ষিণ আমেরিকার চিলি থেকে উত্তরে কানাডার উত্তর-পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর উপকূল দিয়ে জাপান ও মধ্য এশিয়া অতিক্রম করে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এসে শেষ হয়েছে। জাপান থেকে আরেকটি শাখা অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনি পর্যন্ত গেছে।

অগ্ন্যুৎপাত

ভূপৃষ্ঠে দুর্বল ফাটল থাকলে, ওপরের চাপ কমে গেলে কিংবা ভূগর্ভের চাপ বেড়ে গেলে অভ্যন্তরের উত্তপ্ত গলিত পদার্থ প্রবলবেগে নির্গত হওয়াকে অগ্ন্যুৎপাত (Eruption) বলে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়। আগ্নেয়গিরির মুখকে জ্বালামুখ ও জ্বালামুখ দিয়ে নির্গত পদার্থকে লাভা বলে।

ভূপৃষ্ঠের দুর্বল ফাটল বা ছিদ্র দিয়ে ভূগর্ভস্থ ধূম, গ্যাস, লাভা, ধুলি, ভস্ম, উত্তপ্ত পাথরখণ্ড, কাদা এবং বিবিধ তরল বা কঠিন ধাতব পদার্থ নির্গত হয়ে ফাটল বা ছিদ্রমুখের চারদিকে জমাট বেঁধে উঁচু মোচাকৃতি যে পর্বতের সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয়গিরি বলে।

আগ্নেয়গিরিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

সক্রিয় আগ্নেয়গিরি : যেসব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এখনো বন্ধ হয়নি, তাদেরকে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি বলে। যেমন, লিপারি দ্বীপের স্ট্রম্বোলি ও ইতালির ভিসুভিয়াস।



চিত্র ৩.১২ : আগ্নেয়গিরি

সুপ্ত আগ্নেয়গিরি : যেসব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত অনেককাল আগে বন্ধ হয়ে গেছে; কিন্তু যেকোনো সময় আবার অগ্ন্যুৎপাত শুরু হতে পারে তাকে সুপ্ত বা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি বলে। যেমন, জাপানের ফুজিয়ামা।

মৃত আগ্নেয়গিরি : যেসব আগ্নেয়গিরি দীর্ঘকাল ধরে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে এবং ভবিষ্যতেও অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা নেই, সেগুলোকে মৃত আগ্নেয়গিরি বলে। মায়ানমারের পোপা এবং দক্ষিণ আমেরিকার চিম্বোরাজো মৃত আগ্নেয়গিরি।

অগ্ন্যুৎপাতের কারণ

(১) **ভূত্বকে দুর্বল স্থান বা ফাটলের অবস্থান :** ভূত্বকের সর্বত্র একইরূপ কঠিন নয়। কোনো কোনো স্থানে ফাটল বা দুর্বল শিলা থাকে। এই সব দুর্বল অংশে সহজেই সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়ে অগ্ন্যুৎপাত হয়।

(২) **ভূআন্দোলন :** অনেক সময় ভূঅভ্যন্তরে ভূআন্দোলনের ফলে ভূত্বক সংকুচিত হয় ও শিলাস্তর স্থানচ্যুত হলে ভূত্বকের চাপ কমে যায়। ফলে ফাটল ও গর্তের সৃষ্টি হয় এবং অভ্যন্তরস্থ আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হয়।

(৩) **ভূপৃষ্ঠের চাপের হ্রাস :** প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থান ব্যাপকভাবে ক্ষয় হলে সেখানে চাপ হ্রাস পায়। ফলে সেখানকার শিলা কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পরিণত হয় এবং ফাটল বা ছিদ্রপথে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়।

(৪) **ভূপৃষ্ঠের তাপ বিকিরণ :** ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করে শীতল ও সংকুচিত হচ্ছে। এতে কোনো কোনো সময় শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি হয় এবং ভূত্বক ফেটে অগ্ন্যুৎপাতের সূচনা হয়।

(৫) **ভূগর্ভস্থ তাপ বৃদ্ধি :** ভূঅভ্যন্তরে রাসায়নিক উপায়ে সৃষ্ট গ্যাস ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারা তাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে পদার্থসমূহ আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে বেরিয়ে আসতে চায় এবং অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়।

অগ্ন্যুৎপাতের ফলাফল

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়।

(১) নিক্ষিপ্ত লাভা সঞ্চিত হয়ে পর্বত, মালভূমি ও উপত্যকার সৃষ্টি করে।

(২) সাগরতলায় অবস্থিত আগ্নেয়গিরির লাভা সঞ্চিত হয়ে দ্বীপ সৃষ্টি করে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

(৩) অনেক সময় বহু সমৃদ্ধ নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পেই নগরী লাভার নিচে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

(৪) মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে হ্রদের সৃষ্টি হয়।

(৫) ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত লাভা আগ্নেয় সমভূমি সৃষ্টি করে এবং সমভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

(৬) পৃথিবীর বহু মূল্যবান খনিজ দ্রব্য ও আগ্নেয় শিলা অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ওপরে উঠে আসে।

(৭) অগ্ন্যুৎপাতের ফলে অনেক সময় নদীর তলায় লাভা জমে নদীর গতি পরিবর্তিত হয়।

(৮) অধিকাংশ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূমিকম্প হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গত ১২ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে ৩০ সেকেন্ড স্থায়ী এক কম্পনে হামজারবাগে একটি দোতলা দালানে ফাটল ধরে। এ কম্পনকে কী বলে?

ক. অগ্ন্যুৎপাত   খ. ভূমিকম্প
গ. আকস্মিক পরিবর্তন   ঘ. ধীর পরিবর্তন

২। সীসমোগ্রাফের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়–

i. ভূমিকম্পের গতি ও তীব্রতা
ii. ভূমিকম্পের পরিমাণ
iii. ভূমিকম্পের কেন্দ্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii
গ. iii   ঘ. i ও ii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩–৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

রফিক উচ্চশিক্ষা গ্রহণে জাপান সরকারের বৃত্তির জন্য মনোনীত হয়। কিন্তু সেদেশের প্রাকৃতিক অবস্থার কথা ভেবে সে পিছিয়ে যায়। বিশেষ করে সে অগ্ন্যুৎপাতকে বেশি ভয় পায়।

৩। জাপান যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ–প্রবণ দেশ–

i. ভূমিকম্প-প্রবণ
ii. বন্যা-প্রবণ
iii. ঝড়ঝঞ্ঝা-প্রবণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii
গ. iii   ঘ. i ও iii

৪। অগ্ন্যুৎপাতের কারণ হচ্ছে –

i. ভূত্বকে দুর্বল স্থান বা ফাটলের অবস্থান
ii. ভূঅভ্যন্তরে ভূ-আন্দোলন
iii. ভূপৃষ্ঠের তাপ বিকিরণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

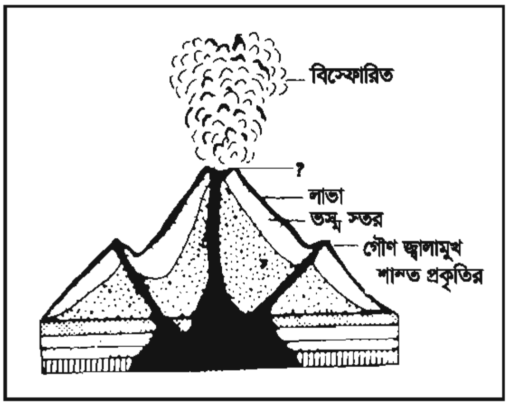
৫। অগ্ন্যুৎপাতের পরিণাম হচ্ছে–

i. ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত লাভা আগ্নেয় সমভূমি সৃষ্টি করে
ii. মূল্যবান খনিজদ্রব্য ও আগ্নেয়শিলা উপরে উঠে আসে
iii. অনেক সময় বহু সমৃদ্ধ নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন



আগ্নেয়গিরি

যে দুই উপায়ে ভূ–পৃষ্ঠের আকস্মিক পরিবর্তন হয় তার একটি হচ্ছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। ভূত্বকের দুর্বল অংশে সহজেই সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়ে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। এ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নদীর তলায় লাভা জমে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। এমনকি অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূমিকম্প পর্যন্ত দেখা দেয়। ভূমিকম্পের ফলে অতীতে ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যমুনা নদীতে রূপ নিয়েছে।

ক. চিত্রে ? চিহ্নিত স্থানটি কী?
খ. অগ্ন্যুৎপাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. ঢাকা মহানগরীতে ভূমিকম্প হলে পরিবেশের কী পরিবর্তন ঘটবে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে নদী-তীরবর্তী এলাকার জনজীবনে কীরূপ প্রভাব পড়েছে তা বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভূমিরূপ

ভূপৃষ্ঠের গঠন সর্বত্র একরকম নয়। স্থলভাগের কোথাও সুউচ্চ ভূমি, কোথাও বিশাল বিস্তৃত সমভূমি আবার কোথাও বিস্তৃত উচ্চ সমতলভূমি রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের এই উঁচুনিচু প্রাকৃতিক রূপকে ভূমিরূপ বলে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে বিভিন্ন রকমের ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়।

স্থলভাগের ভূমিরূপকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা (১) পর্বত, (২) মালভূমি ও (৩) সমভূমি।

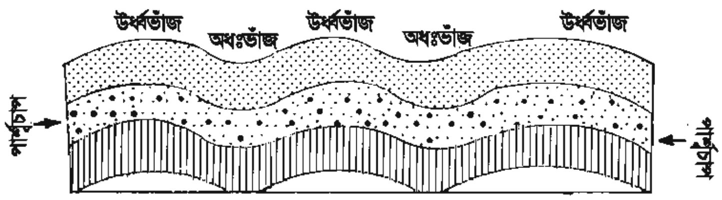
পর্বত

ভূপৃষ্ঠের অতি উচ্চ, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত (Mountain) বলে। সাধারণত পর্বত বলতে ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে উচ্চভূমিগুলোকে বোঝায়। কমপক্ষে ৬০০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট ভূমিকে পর্বত এবং তার চেয়ে কম উচ্চতা সম্পন্নউচ্চভূমিকে পাহাড় বলে। একই অঞ্চলে অনেকগুলো পর্বত পাশাপাশি থাকলে তাকে পর্বতশ্রেণী বলা হয়।

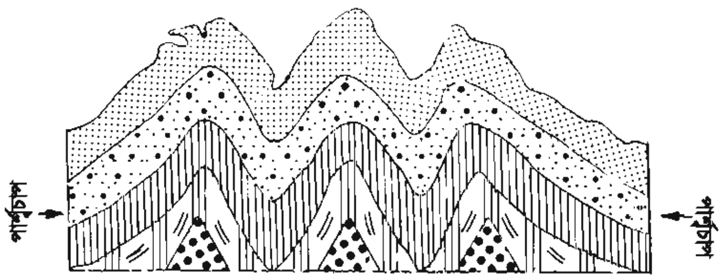
শ্রেণীবিভাগ

গঠনবৈশিষ্ট্য অনুসারে পর্বতকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা– (১) ভঙ্গিল পর্বত, (২) স্তূপ পর্বত, (৩) আগ্নেয় বা সঞ্চয়জাত পর্বত ও (৪) ল্যাকোলিথ পর্বত।

(১) ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountain) : কোমল পাললিক শিলাস্তরে প্রচণ্ডভাবে পার্শ্বচাপ পড়লে ভাঁজের সৃষ্টি হয়। ভাঁজগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে সুউচ্চ পর্বতের সৃষ্টি হলে তাকে ভঙ্গিল পর্বত বা ভাঁজ পর্বত বলে। ভঙ্গিল পর্বতের দুই ভাঁজের মধ্যবর্তী অবনত স্থানকে পার্বত্য উপত্যকা বলে। ভঙ্গিল পর্বতের উত্থিত উঁচু জায়গাকে উর্ধ্বভাঁজ ও নিচের দিকে বসে যাওয়া অংশকে অধঃভাঁজ বলে। হিমালয়, আল্পস, রকি, আন্দিজ প্রভৃতি ভঙ্গিল পর্বত।



ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা



চিত্র ৩.১৩ : ভঙ্গিল পর্বত

(২) স্তূপ পর্বত (Block Mountain) : স্তূপ পর্বত সাধারণত কঠিন শিলাস্তরে গঠিত হয়। ভূআলোড়নের ফলে ভূত্বকের শিলাস্তর কখনো কখনো খাড়াভাবে ফেটে যায় এবং একদিকের অংশ বিচ্যুত হয়ে ভূগর্ভে বসে যায়। এই অবনত অংশকে চ্যুতি বলে। চ্যুতি থেকে যে উপত্যকার সৃষ্টি হয় তাকে স্রস্ত উপত্যকা (Rift Valley) বলে। স্রস্ত উপত্যকার উভয় পার্শ্বের উচ্চ শিলাস্তূপকে স্তূপ পর্বত বলে। জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট স্তূপ পর্বতের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

(৩) আগ্নেয় বা সঞ্চয়জাত পর্বত (Volcanic Mountain or Mountain of Accumulation) : আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা লাভা ক্রমে শীতল হয়ে কঠিন শিলায় পরিণত হয়। এভাবে বার বার অগ্ন্যুৎপাতের ফলে জ্বালামুখের নিকটে আগ্নেয় পদার্থসমূহ সঞ্চিত ও স্তূপীকৃত হয়ে উচ্চভূমির সৃষ্টি করে এবং মোচাকৃতি পর্বতের মতো হয়। একে আগ্নেয় বা সঞ্চয়জাত পর্বত বলে। ইতালির ভিসুভিয়াস, আফ্রিকার কিলিমানজারো, হাওয়াই দ্বীপের মনালোয়া, লিপারি দ্বীপপুঞ্জের স্ট্রম্বোলি প্রভৃতি আগ্নেয় পর্বত এরূপে গঠিত হয়েছে।



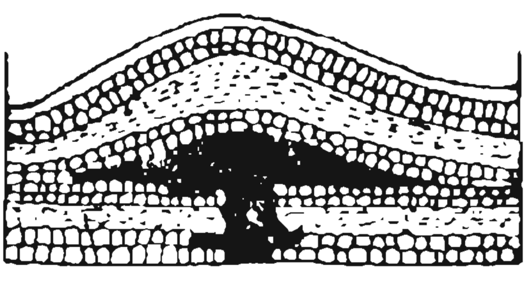
চিত্র ৩.১৪ : স্তূপ পর্বত



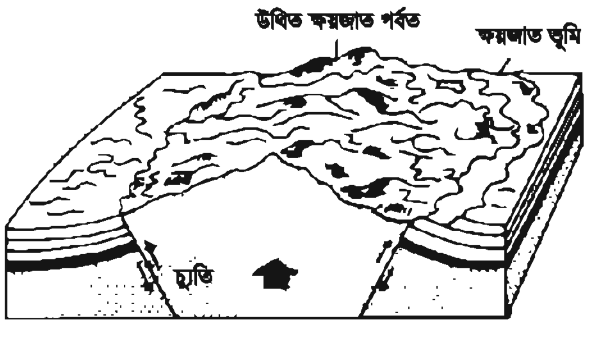
চিত্র ৩.১৬ : ল্যাকোলিথ পর্বত

(৪) ল্যাকোলিথ পর্বত (Laccolith Mountain) : পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গলিত শিলা বা ম্যাগমা কখনো কখনো বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু ভূত্বক কঠিন হওয়ায় এবং দুর্বল ফাটল না পেয়ে এগুলো ভূত্বকের নিচে একস্থানে জমাট বেঁধে স্ফীত হয়ে পর্বতের আকার ধারণ করে। এগুলো দেখতে অনেকটা গম্বুজের মতো। এজন্য এভাবে যে পর্বতের সৃষ্টি হয় তাকে ল্যাকোলিথ বা গম্বুজ পর্বত বলে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্ল্যাক হিলস এবং হেনরি এ জাতীয় পর্বতের উদাহরণ।

ওপরে বর্ণিত চার প্রকার পর্বত যেমন, ভঙ্গিল, স্তূপ, আগ্নেয় ও ল্যাকোলিথ পর্বত এবং সুউচ্চ মালভূমি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মূল পর্বতের এবং মালভূমির যে অংশ দীর্ঘকাল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পর্বতরূপে দণ্ডায়মান থাকে তাকে ক্ষয়জাত পর্বত বলে। আফ্রিকার কং, আমেরিকার ক্যাটস্কিট, ভারতের বিন্ধ্য ও আরাবল্লী প্রভৃতি ক্ষয়জাত পর্বত।



চিত্র ৩.১৫ : আগ্নেয় পর্বত

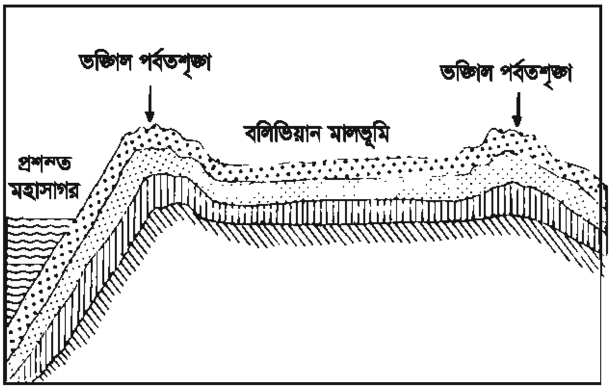


চিত্র ৩.১৭ : ক্ষয়জাত পর্বত

মালভূমি

সমুদ্র-সমতল থেকে অতিউচ্চ বিস্তীর্ণ ভূমিকে মালভূমি বলে। মালভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েকশ' মিটার থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল মহাদেশেই মালভূমি আছে। মালভূমি সাধারণত তিন প্রকার, যথা– **(১) পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি, (২) পাদদেশীয় মালভূমি ও (৩) মহাদেশীয় মালভূমি।**

(১) পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি : যে সকল মালভূমি পর্বত দ্বারা বেষ্টিত থাকে সেগুলোকে পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি বলে। এদের উৎপত্তি পর্বতের উৎপত্তির সঙ্গে জড়িত। পর্বতের সঙ্গে এদের একমাত্র প্রভেদ এই যে, মালভূমিগুলো বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রশস্ত ভূমির ন্যায় হয়ে থাকে। তিব্বতের মালভূমি পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বলিভিয়া এবং মেক্সিকো মালভূমিও পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি।



চিত্র ৩.১৮ : পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি

(২) পাদদেশীয় মালভূমি : বৃষ্টি, নদী, হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা পর্বতগাত্র ব্যাপকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলো পর্বতের পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে যে মালভূমির সৃষ্টি হয় তাকে পাদদেশীয় মালভূমি বলে। এ জাতীয় মালভূমির একপ্রান্তে সাধারণত সমতলভূমি বা সাগর থাকে। উত্তর আমেরিকার কলোরাডো ও দক্ষিণ আমেরিকার **পাতাগোনিয়া** পাদদেশীয় মালভূমির উদাহরণ।

(৩) মহাদেশীয় মালভূমি : কোনো সমতলভূমি অথবা কোনো সমুদ্রতীর থেকে সরাসরি খাড়াভাবে অবস্থিত বিস্তীর্ণ উচ্চভূমিকে মহাদেশীয় মালভূমি বলে। এ ধরনের মালভূমি সাধারণত সাগর অথবা নিম্নভূমি দ্বারা বেষ্টিত থাকে। পর্বতের সঙ্গে এদের কোনো সংযোগ থাকে না। স্পেন, আরব, গ্রীনল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশীয় মালভূমির উদাহরণ।

সমভূমি

সমুদ্রপৃষ্ঠের সঙ্গে প্রায় সম-উচ্চতায় অবস্থিত সুবিস্তৃত স্থলভাগকে সমভূমি বলে। সমভূমির উপরিভাগ প্রায় সমান বা অল্প উঁচুনিচু থাকে। সাধারণত সমভূমিতে কোনো বিশাল উচ্চ বা নিম্নভূমি থাকে না।

প্রকারভেদ : গঠনবৈশিষ্ট্য অনুসারে সমভূমি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। নিচে বিভিন্ন ধরনের সমভূমি নিয়ে আলোচনা করা হল।

উপকূলীয় সমভূমি : ভূ-আলোড়নের ফলে অনেক সময় সমুদ্রে নিমজ্জিত উপকূলসংলগ্ন এলাকা ওপরে উঠে যায়। আবার কখনো তলানি জমে সমুদ্র উপকূলের অগভীর এলাকা ভরাট হয়ে যায়। এভাবে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে উপকূলীয় সমভূমি বলে। যেমন, মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলীয় সমভূমি।

প্লাবন সমভূমি : নদীবাহিত পলি, বালি, কাঁকর প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে যে সমভূমি গঠিত হয় তাকে পলল বা প্লাবন সমভূমি বলে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, হোয়াংহো এসব নদী প্লাবন সমভূমি সৃষ্টি করেছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমির উল্লেখ করা যেতে পারে।

বদ্বীপ সমভূমি : নদীর মোহনায় পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে মাত্রাহীন 'ব' আকারের যে সমভূমি সৃষ্টি করে তাকে বদ্বীপ সমভূমি বলে। পদ্মা, নীল এসব নদীর বদ্বীপ সমভূমি রয়েছে।

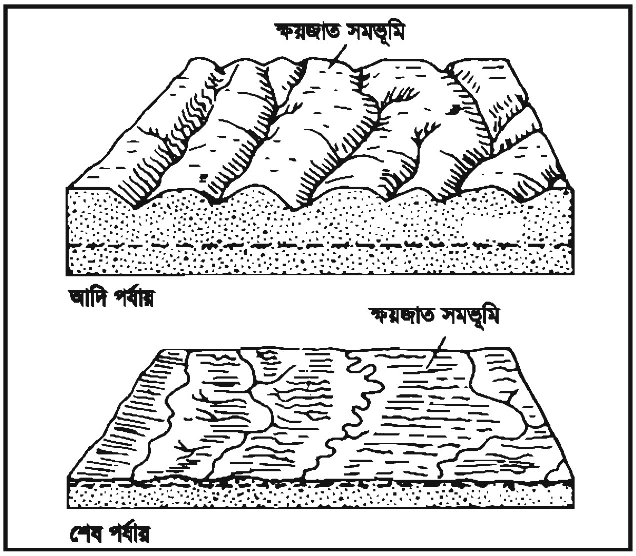
হ্রদ সমভূমি : নদীবাহিত তলানি কোনো হ্রদে জমে যে সমভূমির সৃষ্টি করে তাকে হ্রদ সমভূমি বলে। কানাডার ম্যানিটোবা এরূপে গঠিত সমভূমি।

হিমবাহ সমভূমি : হিমবাহের গ্রাবরেখা সঞ্চয়ের ফলে গঠিত সমভূমিকে হিমবাহ সমভূমি বলে। যেমন, কানাডার প্রেইরি অঞ্চল।

লোয়েস সমভূমি : বায়ু দ্বারা পরিবাহিত ধুলিকণা ও বালিরাশির সাহায্যে লোয়েস সমভূমি গঠিত হয়। মধ্য চীন ও ফ্রান্সে এরূপ সমভূমি আছে।

লাভা সমভূমি : লাভা সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি গঠিত হয় তাকে লাভা সমভূমি বলে। দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণ মৃত্তিকার সমভূমি এ জাতীয়।

ক্ষয়জাত সমভূমি : বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পর্বত, মালভূমি প্রভৃতি উচ্চতা হারিয়ে সমভূমিতে পরিণত হলে তাকে ক্ষয়জাত সমভূমি বলে। যেমন, সাইবেরিয়ার সমভূমি।



চিত্র ৩.১৯ : ক্ষয়জাত মালভূমি

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আফ্রিকার কিলিমানজারো কোন শ্রেণীর পর্বত ?

ক. আগ্নেয় পর্বত খ. ক্ষয়জাত পর্বত
গ. স্তূপ পর্বত ঘ. ভাঁজ পর্বত।

২। পার্বত্য উপত্যকা বলতে বুঝায়–

i. উচ্চ পর্বতের পাদদেশ
ii. ভঙ্গিল পর্বতের দুইভাঁজের মধ্যবর্তী অবনত স্থান
iii. চ্যুতি থেকে সৃষ্ট নিম্ন উপত্যকা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii এবং iii

প্রদত্ত পরিচ্ছেদ থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গলিত শিলা বা ম্যাগমা ভূত্বক কঠিন হওয়ায় এবং ফাটল না পাওয়ায় ভূত্বকের নিচে একস্থানে জমাট বেঁধে স্ফীত হয়ে পর্বতের আকার ধারণ করে যা দেখতে অনেকটা গম্বুজের মতো।

৩। পৃথিবীর অভ্যন্তরে গলিত শিলা ও ম্যাগমা জমাট বেঁধে সৃষ্টি করে–

ক. আগ্নেয় পর্বত খ. স্তূপ পর্বত
গ. ল্যাকোলিথ পর্বত ঘ. ভঙ্গিল পর্বত

৪। ল্যাকোলিথ পর্বতের উদাহরণ–

i. যুক্তরাষ্ট্রের ব্ল্যাক হিলস
ii. লিপারি দ্বীপপুঞ্জের স্ট্রম্বোলি
iii. জার্মানির ব্লাক ফরেস্ট

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নবম পরিচ্ছেদ

বায়ুমণ্ডল

পৃথিবীর চারদিক নানা প্রকার গ্যাসীয় উপাদান দ্বারা বেষ্টিত। অদৃশ্য এই গ্যাসীয় আবরণ যা পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে, তাই বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য এই মণ্ডলটি পৃথিবীর সঙ্গে লেগে আছে আর পৃথিবীর সঙ্গে আবর্তিত হচ্ছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের গভীরতা প্রায় ১,৬১০ কিলোমিটার।

বায়ুমণ্ডলের উপাদান

বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন গ্যাস এবং অসংখ্য ধুলিকণার সংমিশ্রণে গঠিত। শতকরা হিসেবে বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের মোটামুটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

নাইট্রোজেন	৭৮.০২
অক্সিজেন	২০.৭১
আরগন	০.৮০
জলীয়বাষ্প	০.৪১
কার্বন ডাইঅক্সাইড	০.০৩
সাধারণ গ্যাসসমূহ	০.০২
ধুলিকণা ও উদ্ভিদকণা	০.০১
	১০০.০০

বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের প্রাধান্য রয়েছে। সকল প্রাণীর জন্য অক্সিজেন অত্যাবশ্যকীয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়া অন্যান্য উপাদান বায়ুতে মোটামুটি অপরিবর্তনীয় পরিমাণে থাকে। তবে ধুলি, ধোঁয়া, জলীয়বাষ্প ইত্যাদি উপাদান বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। এগুলো বৃষ্টিপাত, কুয়াশা ইত্যাদি নৈসর্গিক ঘটনার ওপর প্রভাব ফেলে। বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য সর্বত্র এক নয়। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন জায়গায় তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ ও আর্দ্রতা বিভিন্ন রকম।

বায়ুমণ্ডলের স্তর

বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলো একের পর এক সজ্জিত। স্তরগুলো ওপরের দিকে হালকা হয়ে গেছে। ওপরের স্তর নিচের স্তরে চাপ দিচ্ছে বলে নিচের স্তর অনেক ঘন। পৃথিবীর এই বায়বীয় আবরণে চারটি স্তর আছে। যথা– (১) ট্রপোমণ্ডল (২) স্ট্রাটোমণ্ডল, (৩) মেসোমণ্ডল ও (৪) তাপমণ্ডল।

(১) ট্রপোমণ্ডল : ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডল স্তরকে বলা হয় ট্রপোমণ্ডল। ট্রপোমণ্ডল নিরক্ষরেখার নিকট ১৭.৭১ কিলোমিটার, ৪০° অক্ষাংশে ১১.২৭ কিলোমিটার এবং মেরুতে ৬.৪৪ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এর গড় গভীরতা ১২.৮৭ কিলোমিটার। বায়ুর এ স্তর মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্তর। আর্দ্রতা, কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি এ স্তরে অবস্থিত। এ স্তরের শেষ সীমাকে ট্রপোসীমা (Tropopause) বলে। এ স্তরে প্রতি কিলোমিটারে ৬.৪° সেলসিয়াস তাপের হ্রাস হয়।

(২) স্ট্রাটোমণ্ডল : বায়ুর এ স্তর ট্রপোসীমার উপরের দিকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে বায়ুর উত্তাপ ও চাপের তেমন ব্যতিক্রম হয় না। এখানে জলীয়বাষ্প নেই। এ মণ্ডলের বায়ু অত্যন্ত লঘু, এর প্রবাহ খুবই ক্ষীণ, এখানে বায়ুর ঊর্ধ্ব ও নিম্নগতি নেই। এখানে বায়ুর গতি সমান্তরাল।

(৩) মেসোমণ্ডল : স্ট্রাটোমণ্ডলের ওপরের স্তর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত উষ্ণতা দ্রুত হ্রাস পায়। এই স্তরকে মেসোমণ্ডল বলে। ৮০ কিলোমিটারের পর পুনরায় উষ্ণতা বাড়তে থাকে। এর নাম মেসোবিরতি। এই মণ্ডলের বায়ুর চাপ অত্যন্ত ক্ষীণ।

(৪) তাপমণ্ডল : মেসোবিরতির ওপরের অংশ থেকে তাপমণ্ডল শুরু হয়। এ স্তরেই বিদ্যুৎ চমকাতে দেখা যায়। এর বহিঃসীমাকে এক্সোস্ফিয়ার (Exosphere) বলে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের গভীরতা কত ?

ক. ১৫১০ কি. মি. প্রায় খ. ১৬১০ ”
গ. ১৭১০ ” ঘ. ১৮১০ ”

২। বায়ুমণ্ডলে যে উপাদানগুলোর প্রাধান্য তা হচ্ছে–

i. নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন
ii. আরগন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড
iii. জলীয়বাষ্প ও সাধারণ গ্যাসমূহ

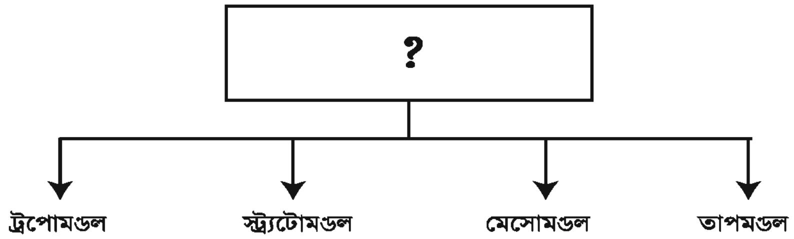
নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

৩। মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্তর কোন মণ্ডল ?

ক. ট্রপোমণ্ডল খ. স্ট্রাটোমণ্ডল
গ. মেসোমণ্ডল ঘ. তাপমণ্ডল

নিচের চিত্র থেকে ৪–৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৪। চিত্রে মণ্ডলগুলো অন্তর্ভুক্ত–

i. অশ্বমণ্ডল
ii. বায়ুমণ্ডল
iii. ভূমণ্ডল-এর

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

৫। ৮০ কি. মি. –এর পর মন্ডলে উষ্ণতা বাড়তে থাকে–

i. তাপমণ্ডল
ii. মেসো বিরতি
iii. মেসোমণ্ডল

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

৬। আমরা দেখছি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাত, কুয়াশা ইত্যাদি নৈসর্গিক ঘটনা বিভিন্ন মাত্রা বা হারে ঘটছে। এর প্রধান কারণ–

i. কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়া অন্যান্য উপাদান বায়ুতে অপরিবর্তনীয় পরিমাণ
ii. বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন স্তরে তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি একই রকম
iii. বায়ুমণ্ডলের ধুলি, ধোঁয়া, জলীয়বাষ্প ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৭। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর সঙ্গো আবর্তিত হচ্ছে, কারণ–

i. বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের প্রাধান্য
ii. পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য
iii. বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে তাপ, বায়ুপ্রবাহ বিভিন্ন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

পৃথিবীর প্রাণীকুলের বেঁচে থাকার অপরিহার্য উপাদান হল বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর সমস্ত ভূমণ্ডলকে ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল। এটা বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণে গঠিত। বায়ুমণ্ডলের গভীরতা ১০,০০০ কি: মি: হলে ও শতকরা ৯৭ ভাগ বায়ুই ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০ কিলোমিটার–এর মধ্যে আছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের গভীরতা ১৬১০ কিলোমিটার। বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য সর্বত্র এক নয়। বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলো একের পর এক সজ্জিত আছে।

ক. বায়ুমণ্ডল কাকে বলে।
খ. বায়ুচাপের তারতম্যের কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. প্রাণীকুলের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন কেন?
ঘ. ''বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলো একের পর এক সজ্জিত''– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

দশম পরিচ্ছেদ

সৌরতাপ ও তাপমাত্রা

সৌরতাপ

সূর্য তাপ ও আলোর উৎস। ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডল সূর্য থেকে তাপ গ্রহণ করে। সূর্যের তাপশক্তির যে ক্ষুদ্রতম অংশ বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত করে তাকে গৃহীত-সৌরশক্তি বলে। ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডল সূর্য থেকে যে সৌরশক্তি গ্রহণ করে তাকেই সৌরতাপ (Insolation) বলা হয়। সৌরশক্তি বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত, আবহাওয়া প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং পৃথিবীকে মানুষের বাসের উপযোগী করে তোলে।

বায়ুর তাপ

পৃথিবীর সর্বত্র বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা সমান নয়। বায়ুর তাপের প্রধান উৎস সূর্য। বিভিন্নভাবে সৌরশক্তি বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। বায়ুর উষ্ণ ও শীতল অবস্থাকে বায়ুর তাপ বলে। সূর্যতাপে প্রত্যক্ষভাবে বায়ু বিশেষ উত্তপ্ত হয় না। বায়ুস্থিত ধূলিকণা ও পানিকণা তাপ গ্রহণ ও সংরক্ষণ করে। সূর্যকিরণে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় এবং ভূত্বক তাপ বিকিরণ করলে নিম্নস্তরের বায়ু উষ্ণ হয়ে ওঠে। আবার নিম্নস্তরের বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওপরে গেলে চারদিকের শীতল ও ভারি বায়ু ঐ স্থানে আসে। ক্রমান্বয়ে এ বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে যায়। এভাবে পরিচলন ক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়।

বায়ুমণ্ডলে তাপের তারতম্যের কারণ

বায়ুমণ্ডলে তাপের তারতম্যের অনেক কারণ আছে। নিচে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল।

দিনরাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি : পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান থাকে না। দিনের পরিমাণ বেশি হলে ভূপৃষ্ঠ বেশি সময় সৌরতাপ গ্রহণ করে। ফলে ঐ স্থান বেশি উত্তপ্ত হয়। কিন্তু রাত্রির পরিমাণ বেশি হলে ঐ স্থান বেশি শীতল হয়।

আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে বায়ুমণ্ডল অধিক উত্তপ্ত হয়, কিন্তু শীতকালে দিবাভাগের পরিমাণ কম বলে বায়ুমণ্ডল কম উত্তপ্ত হয়।

সূর্যরশ্মির তির্যক পতন : তির্যক সূর্যরশ্মি লম্ব সূর্যরশ্মি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ বায়ুস্তর ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। এই কারণে তির্যক সূর্যরশ্মি দ্বারা ভূপৃষ্ঠ অল্প পরিমাণ তাপ পায়। কিন্তু লম্ব সূর্যরশ্মি অল্প বায়ুস্তর ভেদ করে আসে বলে এর দ্বারা ভূপৃষ্ঠ অধিক উত্তপ্ত হয়। নিরক্ষরেখায় সূর্যকিরণ সারা বছর লম্বভাবে পড়ে বলে সেখানে সূর্যতাপ অধিক এবং বায়ুমণ্ডলও অধিক উষ্ণ। এছাড়া লম্বভাবে পতিত রশ্মি অপেক্ষা তির্যকভাবে পতিত রশ্মি অধিক স্থানব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে লম্বভাবে পতিত রশ্মি অপেক্ষা তির্যকভাবে পতিত এলাকায় উত্তাপের পরিমাণ কম হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে উত্তর ও দক্ষিণে ক্রমেই সূর্যরশ্মি অধিক তির্যকভাবে পড়ে। এজন্য নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর ও দক্ষিণে ক্রমান্বয়ে সূর্যের তাপ কমতে থাকে।

জলীয়বাষ্পের পরিমাণ : জলীয়বাষ্প অধিক পরিমাণ তাপ সংরক্ষণ করে। তাই যে অঞ্চলের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি সেখানের তাপমাত্রা চরম হয় না। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের বায়ুতে জলীয়বাষ্প বেশি বলে দিবাভাগে অধিক উষ্ণতা ও রাতে শীত প্রখর হয় না। মরুভূমি অঞ্চলের বায়ুতে জলীয়বাষ্প কম থাকায় দিনে প্রখর তাপ হয়। কিন্তু মরুভূমির বালিকণা অতি দ্রুত তাপ বিকিরণ করে ঠান্ডা হয়ে যায় বলে রাতে প্রবল শীত অনুভূত হয়।

উচ্চতা : সমুদ্র সমতল থেকে যতই ওপরে ওঠা যায় ততই বায়ু হালকা ও পরিষ্কার হয়। এই হালকা বায়ুর তাপ ধারণ ক্ষমতা কম থাকে। বায়ুতে ধূলিকণা কম থাকলে তাপ গ্রহণ ও সংরক্ষণ কম হয়। ভূপৃষ্ঠের বিকীর্ণ তাপ বেশি উঁচুতে পৌঁছায় না। তাই যতই ওপরে ওঠা যায় ততই উষ্ণতা কমতে থাকে।

সুপ্ত তাপ : বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পানিবিন্দুতে পরিণত হওয়ার সময় এর সুপ্ত তাপ বেরিয়ে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। এতে বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।

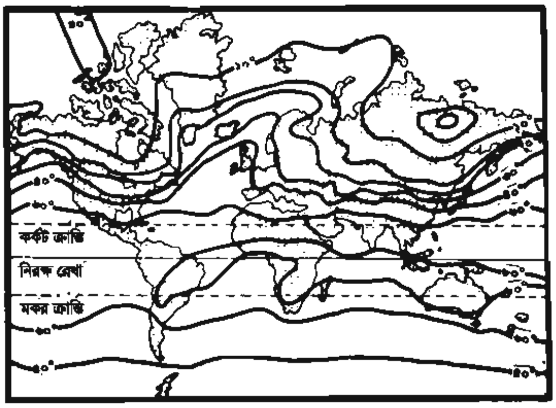
বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত : বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার তারতম্য বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের উপরও নির্ভর করে। উষ্ণমণ্ডল থেকে প্রবাহিত বায়ু উষ্ণ এবং হিমমণ্ডল থেকে প্রবাহিত বায়ু শীতল হয়। নিম্ন অক্ষাংশের সমুদ্র থেকে প্রবাহিত উষ্ণ স্রোত এবং উচ্চ অক্ষাংশ থেকে প্রবাহিত শীতল স্রোত উপকূল ও উপকূলস্থ বায়ুকে যথাক্রমে উষ্ণ ও শীতল করে। এ সমস্ত বিভিন্ন কারণে পৃথিবীর সর্বত্র বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা সমান থাকে না।

সমোষ্ণরেখা (Isotherm)

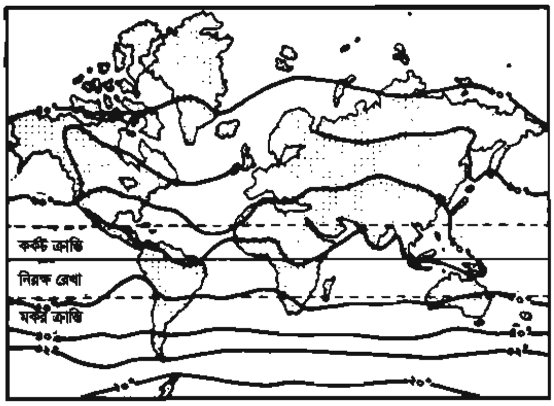
পৃথিবীর একই অক্ষাংশে অবস্থিত সকল স্থানের উষ্ণতা সমান নয়। উচ্চতা, জলভাগ ও স্থলভাগের উত্তাপের পার্থক্য, সমুদ্রস্রোত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণের জন্য ভূপৃষ্ঠে তাপের তারতম্য দেখা যায়। সেজন্য অক্ষাংশ বরাবর তাপমণ্ডলগুলোকে নির্দিষ্ট করা যায় না।

কোন নির্দিষ্ট সময়ে ভূপৃষ্ঠের সমান উষ্ণতা বিশিষ্ট স্থানসমূহের ওপর দিয়ে মানচিত্রে যে রেখা অঙ্কন করা হয় তাকে **সমোষ্ণরেখা বা সমতাপরেখা** বলে।

উত্তর গোলার্ধে পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি স্থলভাগ বেশি থাকায় তাপ সংরক্ষণ ক্ষমতাও ভিন্ন। সেজন্য উত্তর গোলার্ধে সমোষ্ণরেখাগুলো খুবই এলোমেলো। আবার দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগের আধিক্যহেতু সমোষ্ণরেখাগুলো অক্ষাংশের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল। পৃথিবীর প্রকৃত তাপ বিন্যাস দেখানোর জন্য সমোষ্ণরেখা ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৩.২০ : সমোষ্ণরেখা (জানুয়ারি)



চিত্র ৩.২১ : সমোষ্ণরেখা (জুলাই)

সাধারণত পৃথিবীর বা কোন দেশের মানচিত্রে জানুয়ারি ও জুলাই মাসের সমোষ্ণরেখা উষ্ণতার তারতম্য দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। উত্তর গোলার্ধে জানুয়ারি মাসের তাপ সাধারণত সর্বনিম্ন এবং জুলাই মাসের তাপ সর্বোচ্চ। দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডল সূর্য থেকে যে শক্তি গ্রহণ করে তাকে বলে–

ক. সৌরশক্তি   খ. সৌরতাপ
গ. গৃহীত সৌরশক্তি   ঘ. বায়ুর তাপ।

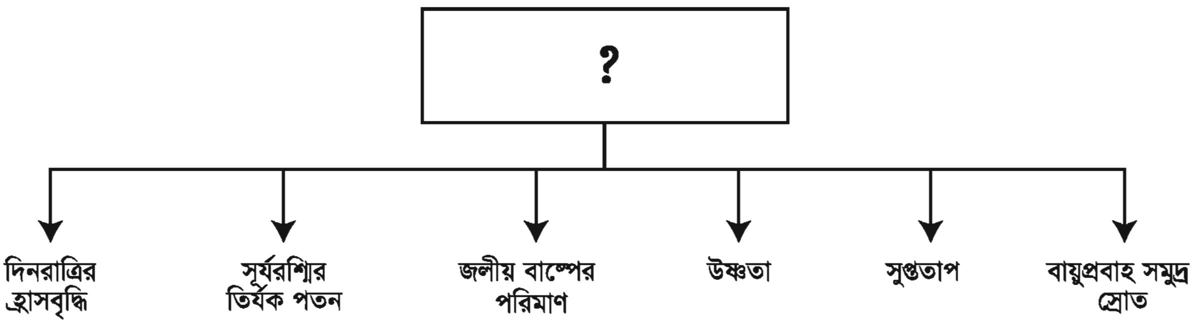
২। সমোষ্ণরেখা ব্যবহার করা হয়–

i. পৃথিবীর প্রকৃত তাপ বিন্যাস দেখানোর জন্য
ii. পাহাড় পর্বতের অবস্থান দেখানোর জন্য
iii. জলভাগ ও স্থলভাগের উত্তাপের পার্থক্য দেখানোর জন্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii
গ. iii   ঘ. ii ও iii

নিচের ছকের আলোকে ৩–৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৩। ? চিহ্নিত স্থানে কী বসবে ?

ক. বায়ুর তাপের কারণ   খ. বায়ুমন্ডলের তাপের তারতম্যের কারণ
গ. সূর্য রশ্মির হ্রাস বৃদ্ধির কারণ   ঘ. দিন রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধির কারণ

৪। বায়ু হালকা ও পরিষ্কার হয়–

i. সমুদ্র সমতল থেকে যতই উপরে ওঠা যায়
ii. জলীয় বাষ্পের আধিক্যের ফলে
iii. সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পতিত হলে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii
গ. i ও ii   ঘ. ii ও iii

৫। উষ্ণমণ্ডল থেকে প্রবাহিত বায়ু কেমন হয়?

ক. উষ্ণ হয়   খ. শীতল হয়
গ. নাতিশীতোষ্ণ হয়   ঘ. উষ্ণ ও শীতল হয়

একাদশ পরিচ্ছেদ

বায়ুর চাপ

বায়ু চারদিকে সর্বদা চাপ দিচ্ছে। যেকোন পদার্থ বা বস্তুর মত বায়ুরও ওজন আছে। এ ওজন থেকেই চাপের সৃষ্টি। এ চাপকেই বায়ুর চাপ (Air Pressure) বলে। চাপ সব জায়গায় সবসময় সমান থাকে না। ভূপৃষ্ঠ থেকে যতই ওপরে ওঠা যায় বায়ুর এ চাপ ততই কমতে থাকে। ব্যারোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর চাপ মাপা হয়।

চাপ বলয়

যেখানে বায়ুর চাপ অধিক সেখানে উচ্চচাপ এবং যেখানে বায়ুর চাপ কম সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ নিম্ন বা উচ্চচাপ অঞ্চলগুলো পৃথিবীকে বলয়ের মত ঘিরে রেখেছে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অক্ষাংশের তাপের পার্থক্য ও পৃথিবীর ঘূর্ণনজনিত কারণে বায়ুমন্ডলের নিম্নতম স্তরে কয়েকটি চাপমন্ডলের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে চাপ বলয় (Pressure Belts) বলে। বায়ুচাপের তারতম্য হেতু চারটি চাপ বলয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

(১) নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় : নিরক্ষরেখার উভয় পাশে ০° থেকে ৫° অক্ষাংশ পর্যন্ত এই বলয় অবস্থিত। এই অঞ্চলে সূর্য সারা বছর লম্বভাবে কিরণ দেয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের বায়ু পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বায়ু অপেক্ষা উষ্ণ ও লঘু তাই বায়ুর চাপ কম। এখানে জলভাগও বেশি। ফলে এ অঞ্চলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। একে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় বলে।

(২) ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় : নিরক্ষীয় উষ্ণ, আর্দ্র ও লঘু বায়ু যতই ওপরে ওঠে ততই শীতল হতে থাকে। কিন্তু নিচ থেকে উষ্ণ বায়ু অনবরত ওপরে ওঠায় এ বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলে নিচে নামতে পারে না। ফলে ওপরের বায়ু উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। ২৫° থেকে ৩৫° ক্রান্তীয় প্রদেশে এসে শীতল ও ভারি বায়ু নিচে নামতে থাকে। এভাবে উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের ২৫° থেকে ৩৫° মধ্যবর্তী অঞ্চলে দুটি উচ্চচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এ চাপ বলয় দুটিকে যথাক্রমে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় বলা হয়।



চিত্র ৩.২৩ : চাপ বলয়

(৩) উপ মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয় : দুই মেরুবৃত্ত প্রদেশে পৃথিবীর আবর্তনের বেগ বেশি। ফলে এ অঞ্চলের বায়ু ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। ফলে দুই মেরুবৃত্তে (৬০° থেকে ৭০° অক্ষাংশের মধ্যে) বায়ুর পরিমাণ কমে যায় ও নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এছাড়া মেরু থেকে যে শীতল ভারি বায়ু মেরুবৃত্তদেশীয় অঞ্চলে পৌঁছে পৃথিবীর বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ছিটকে যায় ও প্রসারিত হয়। এজন্যও উপ মেরুবৃত্ত অঞ্চলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

(৪) মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয় : দুই মেরুর নিকটবর্তী স্থানে অতিরিক্ত শীতের জন্য বায়ু সর্বদাই শীতল ও ভারি হয়। ফলে মেরু অঞ্চলে দুটি উচ্চচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর উচ্চচাপ বলয়কে যথাক্রমে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু উচ্চচাপ বলয় বলে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বায়ুর চাপ মাপা হয় কোন যন্ত্রের সাহায্যে ?

ক. সীসমোগ্রাফ   খ. ব্যারোমিটার
গ. থার্মোমিটার   ঘ. ল্যাকটোমিটার

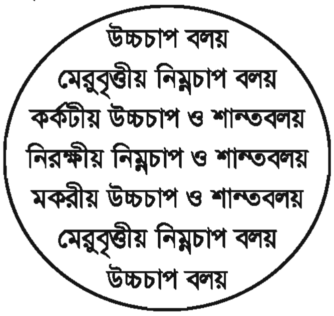
২। বায়ুমণ্ডলের নিম্নতম স্তরে চাপমণ্ডল সৃষ্টির কারণ–

i. ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অক্ষাংশের তাপের পার্থক্য
ii. পৃথিবীর ঘূর্ণনজনিত কারণে
iii. অধিক উচ্চচাপের কারণে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii
গ. i ও ii   ঘ. ii ও iii

নিচের চিত্র অনুসরণ করে ৩–৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।





৩। এটি কীসের বলয়–

ক. চাপ বলয়   খ. মকরীয় উচ্চচাপ বলয়
গ. নিরক্ষীয় বলয়   ঘ. শান্তবলয়

৪। ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়কে কোন দুটি বলয়ে ভাগ করা হয়েছে?

i. কর্কটীয় ও মকরীয় বলয়
ii. উচ্চ ও নিম্নচাপ বলয়
iii. সুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত প্রদেশীয় বলয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii
গ. iii   ঘ. i ও ii

৫। উপমেরুবৃত্ত অঞ্চলে নিম্নচাপের সৃষ্টির কারণ কি?

i. মেরুবৃত্ত প্রদেশে পৃথিবীর আবর্তনের বেগ বেশি
ii. মেরু বৃত্তে বায়ুর পরিমাণ কম
iii. মেরুর বায়ু পৃথিবীর বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ছিটকে যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii
গ. i ও ii   ঘ. i, ii ও iii

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বায়ুপ্রবাহ

তাপ ও চাপের পার্থক্যের জন্য বায়ু এক জায়গায় নিশ্চল থাকে না। সর্বদা একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। একে বায়ুপ্রবাহ বলে। বায়ুপ্রবাহ সরাসরিভাবে বায়ুচাপের বণ্টনের ওপর নির্ভর করে। বায়ু যেদিক থেকে প্রবাহিত হয় সেদিক অনুসারে বায়ুর নামকরণ করা হয়।

বায়ুপ্রবাহের নিয়মাবলি

বায়ুপ্রবাহ সাধারণত কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়মে প্রবাহিত হয়। নিয়মগুলো নিম্নরূপ :

(১) বায়ু সর্বদা উচ্চচাপের স্থান থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। অধিক উত্তপ্ত ও জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে গেলে সেখানে আংশিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়। বায়ুমণ্ডলের সমতা রক্ষার জন্য তখন উচ্চচাপ অঞ্চলের ভারি ও শীতল বায়ু নিম্নস্তর দিয়ে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। তাপ বৃদ্ধি পেলে বায়ুর ঊর্ধ্বগতি এবং তাপ হ্রাস পেলে বায়ুর নিম্নগতি হয়ে থাকে।

(২) পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তনের ফলে বায়ু সোজাসুজি নিরক্ষরেখা থেকে মেরুর দিকে অথবা মেরু থেকে নিরক্ষরেখার দিকে যেতে পারে না। এজন্য বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত ইত্যাদি উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। এটি ফেরেলের সূত্র (Ferrel's Law) নামে খ্যাত।

(৩) উত্তর গোলার্ধে বায়ুপ্রবাহের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালে ডান দিকের বায়ু অপেক্ষা বাম দিকের বায়ুর চাপ কম অনুভূত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। এই সূত্রকে বলা হয় বাইস ব্যালট সূত্র (Buy's Ballot's Law)।

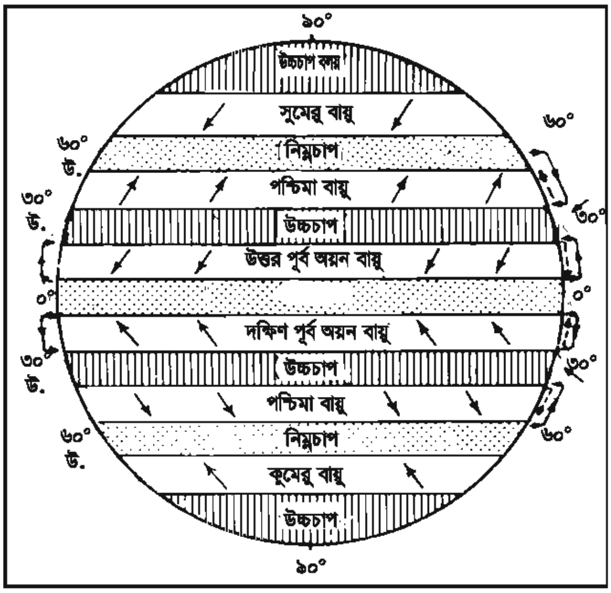
(৪) বায়ুপ্রবাহের গতিপথে পাহাড়-পর্বত থাকলে বায়ুপ্রবাহের গতির দিক পরিবর্তিত হয় এবং বেগ কমে যায়।

বায়ুপ্রবাহের শ্রেণীবিভাগ

পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) নিয়ত বায়ু, (২) সাময়িক বায়ু, (৩) স্থানীয় বায়ু ও (৪) অনিয়মিত বায়ু।

নিয়ত বায়ু

যে বায়ু পৃথিবীর চাপ বলয়গুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সারা বছর নির্দিষ্ট দিকে নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় তাকে নিয়ত বায়ু বলে। ভূপৃষ্ঠের উচ্চচাপ বলয় থেকে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে এই বায়ু প্রবাহিত হয়। অয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ু এর অন্তর্গত।



চিত্র ৩.২৪ : নিয়ত বায়ুপ্রবাহ

অয়ন বায়ু : কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে (২৫° থেকে ৩৫°) দুটি বায়ুপ্রবাহ নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে সবসময় প্রবাহিত হচ্ছে। পৃথিবীর আবর্তনের জন্য ফেরেলের সূত্র অনুসারে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে বেঁকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। এদের নাম যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু। এ বায়ুকে বাণিজ্য বায়ুও বলা হয়। এই বায়ুপ্রবাহ দুটি নিরক্ষ অঞ্চলের অত্যধিক তাপে উষ্ণ ও হালকা হয়ে ওপরে উঠলে সেখানে অনুভূমিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। তাই নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে ৫° অক্ষরেখা পর্যন্ত স্থানকে নিরক্ষীয় শান্ত বলয় বলে।

পশ্চিমা বায়ু : কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে আরো দুটি বায়ুপ্রবাহ উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু বৃত্তাঞ্চলের নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। উত্তর গোলার্ধে উত্তর মেরুর দিকে আসতে আসতে পৃথিবীর আবর্তনের জন্য ডান দিকে বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় বাম দিকে বেঁকে উত্তর-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহে পরিণত হয়। এগুলোকে যথাক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু বলে।

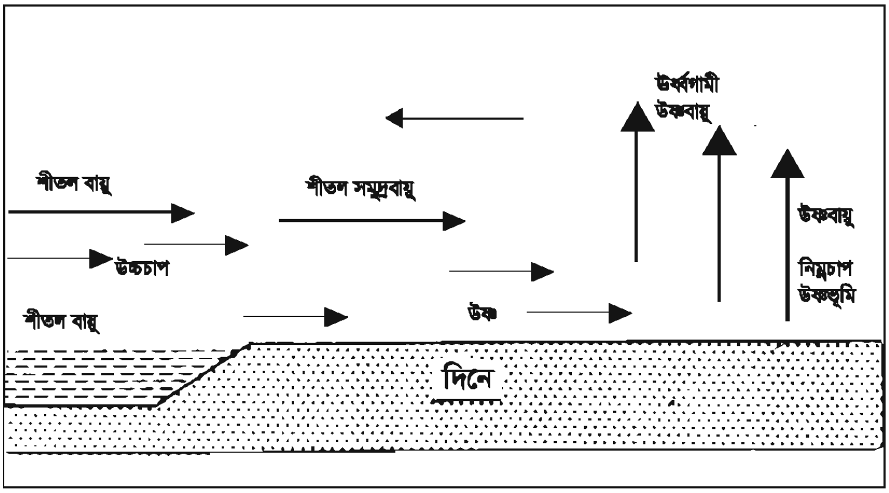
দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগ কম বলে এ বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। ৪০° দক্ষিণ থেকে ৪৭° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত এই বায়ুর গতিবেগ সবচেয়ে বেশি। তাই এই অঞ্চলকে গর্জনশীল চল্লিশ বলে।

মেরু বায়ু : উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু উচ্চচাপ বলয় থেকে নিয়মিতভাবে আরো দুটি বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। এদের উত্তর-পূর্ব মেরু বায়ু বা সুমেরু বায়ু এবং দক্ষিণ-পূর্ব মেরু বায়ু বা কুমেরু বায়ু বলে।

সাময়িক বায়ু

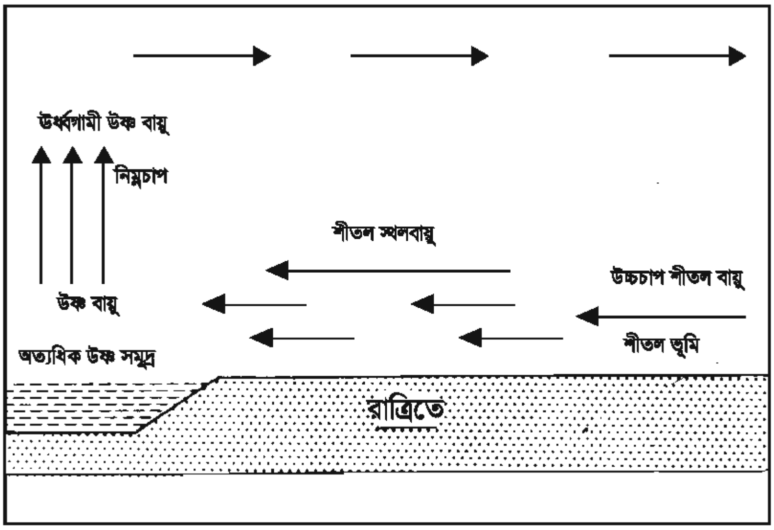
দিনের বিভিন্ন সময়ে ও বছরের বিভিন্ন ঋতুতে জল ও স্থলভাগের তাপ গ্রহণ, সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে অসমতার জন্য যে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয় তাকে সাময়িক বায়ু বলে। সমুদ্রবায়ু, স্থলবায়ু ও মৌসুমি বায়ু উল্লেখযোগ্য সাময়িক বায়ু।

সমুদ্রবায়ু : জল ও স্থলভাগের তাপ গ্রহণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা এক নয়। স্থলভাগ দ্রুত উত্তপ্ত ও শীতল হয়। জলভাগ দীর্ঘ সময়ে শীতল বা উত্তপ্ত হয়। দিনের বেলায় সূর্যকিরণে তীরবর্তী স্থলভাগ সমুদ্রের পানি অপেক্ষা শীঘ্র ও অধিক উত্তপ্ত হয় এবং সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এই সময় বায়ুর চাপের সমতা রক্ষার জন্য সমুদ্র থেকে শীতল ও উচ্চচাপ বিশিষ্ট বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুই সমুদ্রবায়ু। অপরাহ্নে এ বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়।



চিত্র ৩.২৫ : সমুদ্রবায়ু

স্থলবায়ু : রাত্রিতে স্থলভাগ দ্রুত তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে পড়ে। কিন্তু জলভাগ অধিকক্ষণ তাপ সংরক্ষণ করে বলে ধীরে ধীরে শীতল হয়। ফলে স্থলভাগের শীতল বায়ু সমুদ্রে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। একে স্থলবায়ু বলে। এ বায়ু শেষরাতে প্রবল হয়।



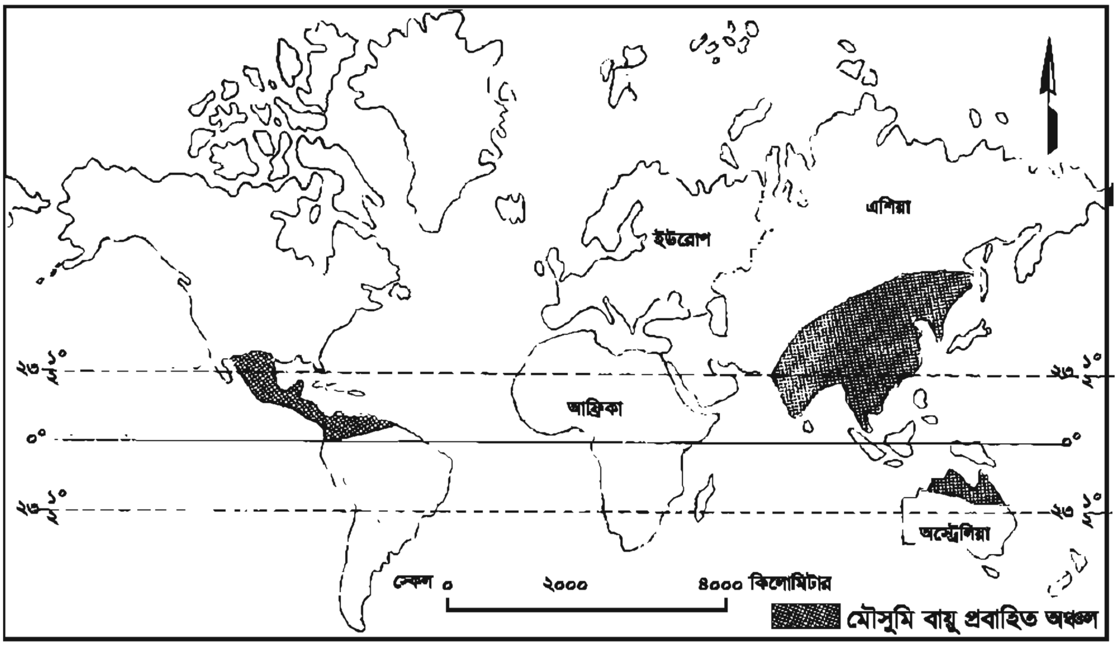
চিত্র ৩.২৫ : স্থলবায়ু

মৌসুমি বায়ু : মৌসুমি শব্দটি আরবি মওসুম শব্দ থেকে এসেছে। 'মওসুম' শব্দের অর্থ ঋতু। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে বায়ুর দিক পরিবর্তন হয় তাকে মৌসুমি বায়ু বলে। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুভেদে এ বায়ুর সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে সূর্য কর্কটক্রান্তির ওপর লম্বভাবে অবস্থান করলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর-পশ্চিম ভারত, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি স্থানের স্থলভাগ অতিশয় উত্তপ্ত হয় এবং একটি বৃহৎ নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। তখন দক্ষিণ গোলার্ধের ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে আগত দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে এশিয়ার নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে ফেরেলের সূত্র অনুসারে বেঁকে ঐ বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুতে পরিণত হয়। এই বায়ুকে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মের মৌসুমি বায়ু বা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বলে।

আবার জাপান, চীন, তাইওয়ানে এই বায়ু দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হওয়ায় একে দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমি বায়ু বলে। এই উভয় মৌসুমি বায়ু স্থলভাগে প্রবেশ করে পাহাড়-পর্বতে বাধা পেয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল তখন দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার স্থলভাগ অত্যন্ত শীতল হয়ে পড়ে কিন্তু নিকটবর্তী সমুদ্র উষ্ণ থাকে। তখন স্থলভাগের ওপরের উচ্চচাপ কেন্দ্র থেকে শীতল বায়ু মহাসাগরের নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। এ বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসে বলে একে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু বলে। এ বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে ফেরেলের সূত্র অনুসারে বেঁকে উত্তর-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুরূপে উত্তর অস্ট্রেলিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়।

স্থানীয় বায়ু : স্থানীয় তাপ ও চাপের তারতম্যের জন্য স্থানীয় বায়ুর উৎপত্তি হয়। ফন, খামসিন, সিরক্কো, লু, চিনুক প্রভৃতি স্থানীয় বায়ু।

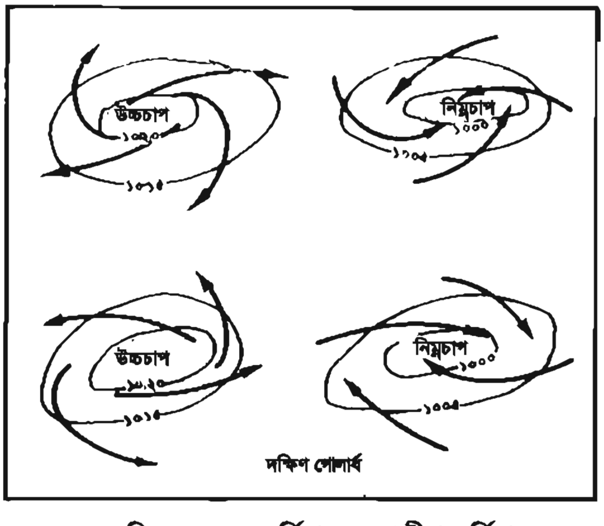


চিত্র ৩.২৬ : মৌসুমি বায়ু

অনিয়মিত বায়ু

সাধারণত তাপ ও চাপের বৈষম্যের জন্য আকস্মিকভাবে যে বায়ুর সৃষ্টি হয় তাকে অনিয়মিত বায়ু বলে। ঘূর্ণিবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণিবাত অনিয়মিত বায়ু।

ঘূর্ণিবাত : ভূপৃষ্ঠের কোনো স্বল্প পরিসর স্থানে বায়ু হঠাৎ অত্যন্ত উত্তপ্ত হলে আকস্মিকভাবে সে জায়গার মধ্যস্থলে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু চারপাশে বায়ুর উচ্চচাপ বিদ্যমান থাকে। তখন চাপের সমতা রক্ষার্থে চারদিকের শীতল বায়ু কুন্ডলীর আকারে প্রবলবেগে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নচাপ কেন্দ্রে প্রবেশ করে এবং উত্তপ্ত বায়ুর সঙ্গে মিশে উপরে উঠতে থাকে। এরূপ কেন্দ্রমুখী ও ঊর্ধ্বগামী বায়ুকে ঘূর্ণিবাত বলে। উত্তর গোলার্ধে এ বায়ু বামাবর্তে ও দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে ঘুরতে ঘুরতে অগ্রসর হয়। ঘূর্ণিবাতের ফলে আকস্মিক ঝড়ের সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। টাইফুন, সাইক্লোন, টর্নেডো, হারিকেন প্রভৃতি ঘূর্ণিবাতের উদাহরণ। বাংলাদেশের কালবৈশাখী ও আশ্বিনে ঝড়কে আঞ্চলিক ঘূর্ণিবাত বলা যায়।



চিত্র ৩.২৭ : ঘূর্ণিবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণিবাত

প্রতীপ ঘূর্ণিবাত : হিমমন্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলের কোন অল্প বিস্তৃত স্থানে সহসা যদি বায়ু শীতল হয়ে যায় তবে সেখানে উচ্চচাপ হয়। তখন সে স্থানের বায়ু অধোগামী ও বহির্মুখী হয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। একে প্রতীপ ঘূর্ণিবাত বলে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বায়ু সর্বদা একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয় কেন?

ক. বায়ুর গতিপথে পর্বতের অবস্থানের জন্য
খ. তাপ ও চাপের পার্থক্যের জন্য
গ. চাপ বলয়ের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য
ঘ. নিরক্ষীয় নিম্ন ও উচ্চচাপ বলয়ের জন্য

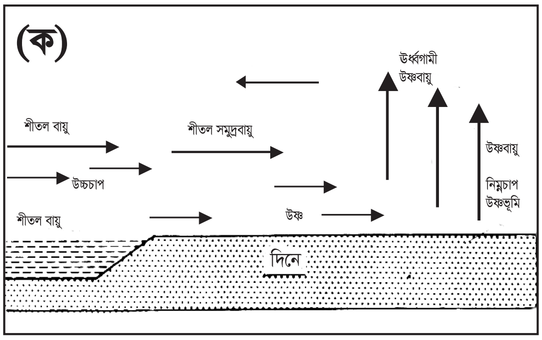
২। মৌসুমি বায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল–

i. এটি একটি আঞ্চলিক বায়ু
ii. ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এর দিক পরিবর্তন হয়
iii. শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুভেদে এ বায়ুর সৃষ্টি হয়।

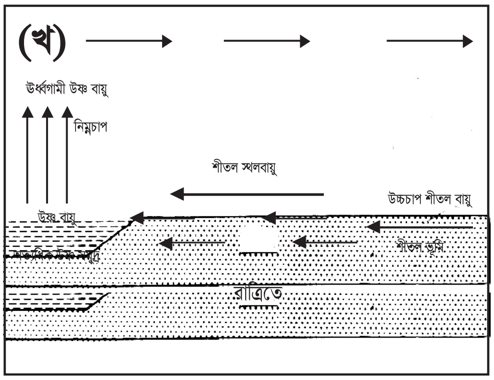
নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের চিত্র অনুসরণ করে ৩–৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



সমুদ্রবায়ু



স্থলবায়ু

৩। 'খ' চিহ্নিত চিত্রটি কোন ধরনের বায়ুর–

ক. পশ্চিমা বায়ু খ. অয়ন বায়ু
গ. স্থল বায়ু ঘ. মেরু বায়ু

'ক' চিহ্নিত চিত্র নির্দেশিত

৪। সমুদ্র থেকে শীতল ও উচ্চচাপ বিশিষ্ট বায়ু মূলভাগের দিকে প্রবাহিত; কারণ এটি–

ক. সমুদ্র বায়ু খ. মৌসুমি বায়ু
গ. স্থানীয় বায়ু ঘ. স্থলবায়ু

৫। সাময়িক বায়ু সৃষ্টির কারণ–

i. দিনের বিভিন্ন সময়ে ও বছরের বিভিন্ন ঋতুর ভিন্নতা
ii. জল ও স্থলভাগের তাপ গ্রহণের পরিমাণ
iii. জল ও স্থলভাগের তাপ সংরক্ষণের ওপর

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বায়ুর আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত

বায়ুর আর্দ্রতা

সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদী, হ্রদ প্রভৃতি থেকে পানি ক্রমাগত বাষ্পে পরিণত হচ্ছে। জলীয়বাষ্প বায়ুর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাতাসে এই জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিকে বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity) বলে। সকল প্রকার বারিপাত এই জলীয়বাষ্পের ওপর নির্ভরশীল। যে বায়ুতে জলীয়বাষ্প থাকে না তাকে শুষ্ক বায়ু বলে। বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্প বৃদ্ধি পেলে আর্দ্রতা বাড়ে আর জলীয়বাষ্প কমলে আর্দ্রতা হ্রাস পায়।

বাষ্পীভবন : বাষ্পীভবনের দ্বারা জলীয়বাষ্পের সৃষ্টি হয়। সমুদ্র জলীয়বাষ্পের প্রধান উৎস। এছাড়া উদ্ভিদজগৎ, নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের পানি সূর্যের তাপে ক্রমাগত বাষ্পে পরিণত হয়ে ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে মিশে যাচ্ছে। একে বাষ্পীভবন বলে।

পরিপৃক্ত বায়ু : বায়ু অপেক্ষা বাষ্প হালকা। বায়ুর বাষ্প ধারণ করার একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে। বায়ুর উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর জলীয়বাষ্প ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ু যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে সে পরিমাণ জলীয়বাষ্প বায়ুতে থাকলে বায়ু আর অধিক পরিমাণ জলীয়বাষ্প গ্রহণ করতে পারে না। তখন একে পরিপৃক্ত বায়ু বলে।

ঘনীভবন : কোনো কারণে পরিপৃক্ত বায়ু শীতল হতে থাকলে পূর্বের মতো বেশি জলীয়বাষ্প ধরে রাখতে পারে না, তখন জলীয়বাষ্পের কিছুটা পানিতে পরিণত হয়, একে ঘনীভবন বলে। ঘনীভবনের সাহায্যে অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প বারিপাত ঘটায়। যে তাপমাত্রায় বায়ু পরিপৃক্ত হয় এবং ঘনীভবন আরম্ভ হয় তাকে শিশিরাঙ্ক বলে। ঘনীভূত জলীয়বাষ্প তুষার, বরফ, শিশির, কুয়াশা এবং বৃষ্টিরূপে ভূমিতে পতিত হয়।

বৃষ্টিপাত

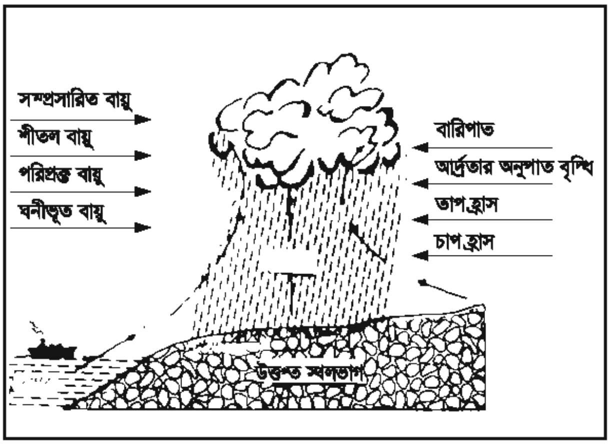
জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঊর্ধ্বে উঠে শীতল ও ঘনীভূত হয় এবং পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানিকণায় পরিণত হয়। এই কণাগুলো ভাসমান ধূলিকণার আশ্রয় নিয়ে মেঘের রূপ নেয়। ঊর্ধ্বাকাশে মেঘ শীতল হয় এবং শিশিরাঙ্ক উপস্থিত হলে মেঘের পানিকণাগুলো বড় বড় বিন্দুতে পরিণত হয়ে নিজের ভারে ভূপৃষ্ঠে পড়ে। একে বৃষ্টিপাত বলে। বৃষ্টিপাত ঘটানোর জন্য জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু, ঘনীভবন, শিশিরাঙ্ক এবং বায়ুতে ধূলিকণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বৃষ্টিপাতের শ্রেণীবিভাগ

বৃষ্টিপাত চার প্রকার। যথা- (১) পরিচলন বৃষ্টি, (২) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি, (৩) ঘূর্ণি বৃষ্টি ও (৪) সংঘর্ষ বৃষ্টি।

(১) পরিচলন বৃষ্টি : ভূপৃষ্ঠের বায়ু উষ্ণ হলে সোজা উপরে উঠে যায়। এই হালকা বায়ু উপরে উঠে শীতল হয়।

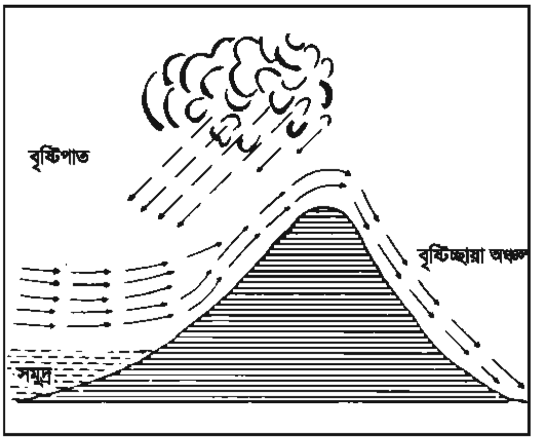
বায়ু শীতল হলে বায়ুর জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। এরূপ বৃষ্টিকে পরিচলন বৃষ্টি বলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যের প্রচন্ড তাপে পরিচলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রায় প্রত্যহ এ ধরনের বৃষ্টিপাত হয় বলে একে পরিচলন বৃষ্টি বলে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গ্রীষ্মের শুরুতে এবং বর্ষার প্রারম্ভে বাংলাদেশে পরিচলন বৃষ্টি হয়। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান নদীর অববাহিকা, আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে সারা বছর প্রচুর পরিচলন বৃষ্টি হয়।



চিত্র ৩.২৮ : পরিচলন বৃষ্টি

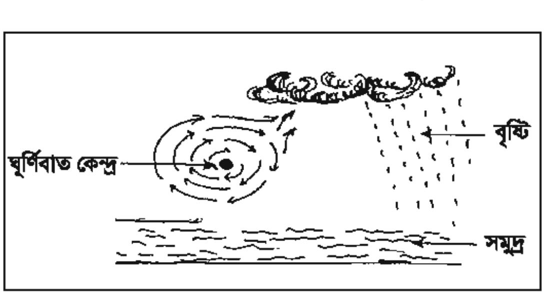
(২) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি : জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় গতিপথে পাহাড় পর্বতে বাধা পেলে পর্বতের ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। উপরে উঠে শীতল হয়ে পর্বতের প্রতিবাত পার্শ্বে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। একে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে।

প্রতিবাত পার্শ্বে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে বায়ু যখন পর্বতের অনুবাত পার্শ্বে পৌঁছে তখন আর জলীয়বাষ্প থাকে না। তাই পর্বতের বৃষ্টিপাত বঞ্চিত অনুবাত পার্শ্বকে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলে। গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বায়ু হিমালয়ে বাধা পেয়ে আসাম, মায়ানমার ও বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। কিন্তু হিমালয়ের উত্তরে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। এছাড়া, কলম্বিয়া, যুক্তরাজ্য, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, দক্ষিণ চিলি, তাসমানিয়া ও নিউজিল্যান্ডে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি হয়।



চিত্র ৩.২৯ : শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি

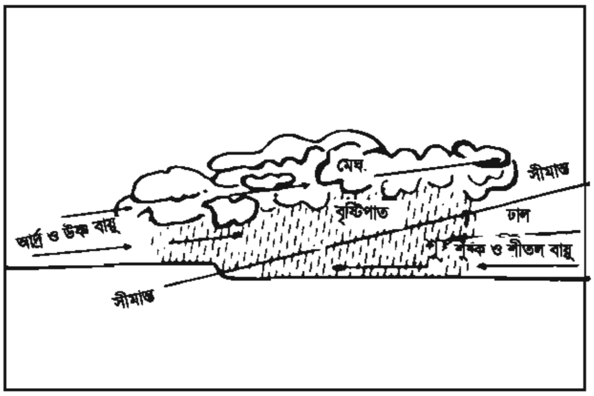
(৩) ঘূর্ণি বৃষ্টি : ঘূর্ণিবাতের কেন্দ্রস্থলে নিম্নচাপ থাকে। ফলে চারদিকের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ পরিপৃক্ত বায়ু উপরে উঠে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এরূপ বৃষ্টিপাতকে ঘূর্ণি বৃষ্টি বলে।



চিত্র ৩.৩০ : ঘূর্ণি বৃষ্টি

পাকিস্তানে শীতকালীন ঘূর্ণিবাতের ফলে এবং বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গ্রীষ্মকালীন কালবৈশাখীর ফলে এরূপ বৃষ্টি হয়। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপেও ঘূর্ণি বৃষ্টি হয়।

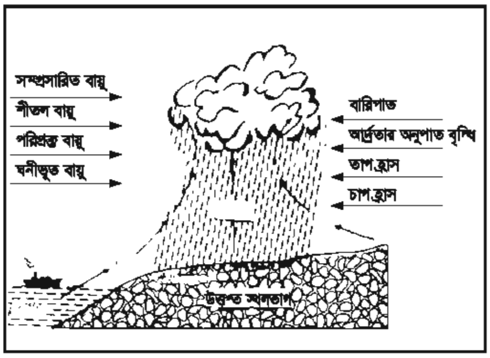
৪। সংঘর্ষ বৃষ্টি : মেরুদেশীয় শীতল ও শুষ্ক বায়ু এবং ক্রান্তীয় উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু একে অপরের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়ে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে পরস্পর মিলিত হয়। শীতল বায়ুর সংস্পর্শে উষ্ণ বায়ু শীতল ও ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। একে সংঘর্ষ বৃষ্টি বলে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে সংঘর্ষ বৃষ্টি হয়।



চিত্র ৩.৩১ : সংঘর্ষ বৃষ্টি

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন



১। বাতাসে কীসের উপস্থিতিকে বায়ুর আর্দ্রতা বলে ?

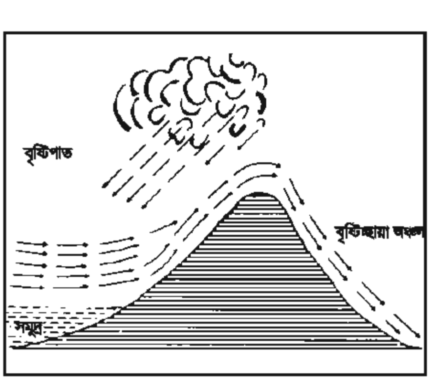
ক. ধূলিকণা খ. জলীয়বাষ্প
গ. চাপ ঘ. গ্যাস

২। শিশিরাঙ্ক হচ্ছে–

i. যে তাপমাত্রায় বায়ু পরিপৃক্ত হয়
ii. যে তাপমাত্রায় ঘনীভবন আরম্ভ হয়
iii. যখন জলীয়বাষ্প বারিপাত ঘটায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii



পাশের চিত্র থেকে ৩–৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩। চিত্রগুলি–

i. ঘূর্ণি বৃষ্টির
ii. পরিচলন বৃষ্টির
ii. শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টির

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. i ও ii
গ. i ও iii
ঘ. ii ও iii

৪। **বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল হচ্ছে–**

ক. যে অঞ্চলে বায়ু শীতল হলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটে
খ. পর্বতের বৃষ্টিপাত বঞ্চিত অনুবাত পার্শ্ব
গ. যে অঞ্চলে জলীয়বাষ্প উপরে উঠে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটে
ঘ. পর্বতের বৃষ্টিপাত বঞ্চিত প্রতিবাদ পার্শ্ব

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মহাসাগর ও জোয়ার-ভাটা

বারিমণ্ডল

উত্তপ্ত অবস্থা থেকে তাপ বিকিরণ করে ভূত্বক বর্তমান কঠিন আকার ধারণ করার সময় অসমানভাবে সংকুচিত হয়েছে। ফলে এর কোনো অংশ উঁচু ও কোনো অংশ নিচু। পৃথিবীর এ উঁচু অংশগুলোকে স্থলমণ্ডল ও নিচু অংশগুলোকে বারিমণ্ডল বলে। বারিমণ্ডল বস্তুত মহাসাগর, সাগর, নদী ও হ্রদের সমষ্টি। ভূপৃষ্ঠের সাত ভাগের প্রায় পাঁচ ভাগ (মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ) বারিমণ্ডলের অন্তর্গত।

মহাসাগর

বারিমণ্ডলের উন্মুক্ত বিরাট সুগভীর জলরাশিকে মহাসাগর বলে। মহাসাগরগুলোর গভীরতা সব জায়গায় সমান নয়। ভূপৃষ্ঠে পাঁচটি মহাসাগর আছে। মহাসাগরগুলোর মধ্যে কোনো প্রাকৃতিক সীমারেখা নেই। মহাসাগরগুলোর নাম (১) প্রশান্ত মহাসাগর, (২) আটলান্টিক মহাসাগর, (৩) ভারত মহাসাগর, (৪) উত্তর মহাসাগর ও (৫) দক্ষিণ মহাসাগর।

(১) প্রশান্ত মহাসাগর : এশিয়া, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মাঝে প্রশান্ত মহাসাগর। এটি সর্ববৃহৎ মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগরের আকৃতি একটি বৃহদাকার ত্রিভুজের মতো। এর আয়তন প্রায় ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। গড় গভীরতা প্রায় ৪,২৭০ মিটার এবং সর্বাধিক গভীরতা ১০,৮৭০ মিটার। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে এশিয়া মহাদেশে ছোটবড় অনেক দ্বীপ আছে। এখানকার সাগরের মধ্যে জাপান সাগর, পীত সাগর, চীন সাগর ইত্যাদি প্রধান।

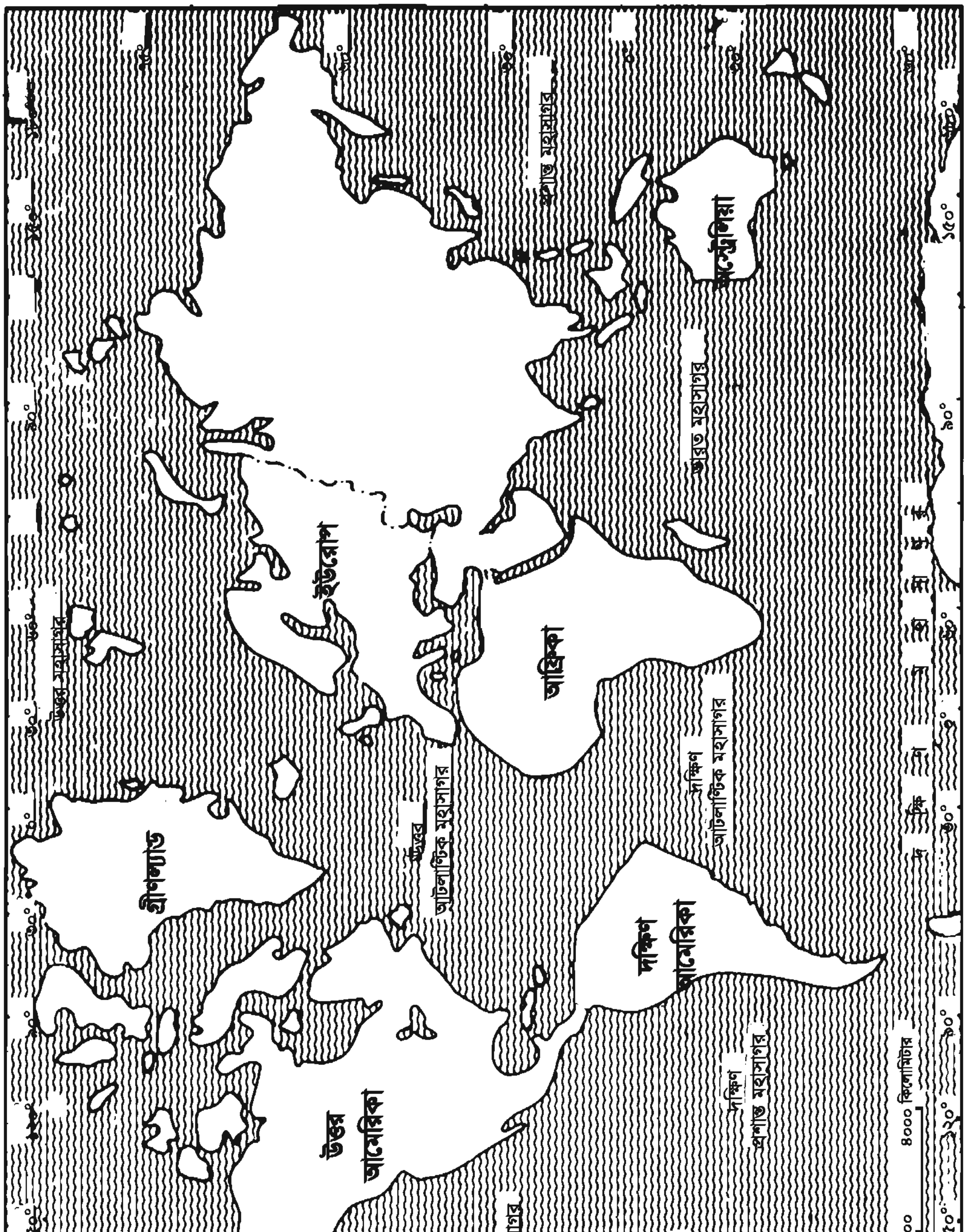
(২) আটলান্টিক মহাসাগর : আয়তনে দ্বিতীয় বৃহত্তম কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে এ মহাসাগর প্রথম। এর পূর্ব তীরে ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিম তীরে আমেরিকা। এর আয়তন প্রায় ৮ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। গড় গভীরতা ৩,৯৩২ মিটার এবং সর্বাধিক গভীরতা ৮,৮০৬ মিটার। আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল খুবই দীর্ঘ ও ভগ্ন। আমেরিকার হাডসন ও মেক্সিকো উপসাগর এবং ইউরোপের বাল্টিক ও ভূমধ্যসাগর এর শাখা। এ মহাসাগরের উত্তরাংশ গ্রীনল্যান্ড, আইসল্যান্ড প্রভৃতি দ্বীপ দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু দক্ষিণ অংশটি ক্রমশ দক্ষিণ মহাসাগরের সঙ্গে মিশেছে। এর আকৃতি অনেকটা ইংরেজি 'S' অক্ষরের মত।

(৩) ভারত মহাসাগর : এর আয়তন প্রায় ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, গড় গভীরতা ৩,৯৬২ মিটার। সর্বাধিক গভীরতা ৭,৪৫৯ মিটার। এ মহাসাগরের উত্তরে এশিয়া, দক্ষিণে এন্টার্কটিকা, পূর্বে অস্ট্রেলিয়া ও পশ্চিমে আফ্রিকা। এ মহাসাগরের উত্তরে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। শ্রীলঙ্কা এবং মাদাগাস্কার ভারত মহাসাগরের বৃহত্তম দ্বীপ। এ মহাসাগরের দক্ষিণ দিক প্রশস্ত এবং উত্তর দিক ক্রমশ সংকীর্ণ।

(৪) উত্তর মহাসাগর : চারদিকে সুমেরুবৃত্ত দ্বারা বেষ্টিত। একে সুমেরু মহাসাগরও বলে। এ মহাসাগর প্রায় বার মাসই বরফে আবৃত থাকে। মোট আয়তন প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। গড় গভীরতা ৮২৪ মিটার এবং সর্বাধিক গভীরতা ৫,৪৪০ মিটার। উত্তর মহাসাগরের উপকূলে কয়েকটি অগভীর সাগর আছে। সাইবেরিয়া, লাপটেভ, কারা সাগর প্রভৃতি। এ মহাসাগরের দ্বীপগুলোর মধ্যে সাইবেরিয়া দ্বীপপুঞ্জ, বিয়রি ও স্টিপসবার্গেন প্রধান।

(৫) দক্ষিণ মহাসাগর : এ মহাসাগর এন্টার্কটিকা মহাদেশের উত্তরাংশের চারদিকে বিস্তৃত। এটিও প্রায় বার মাস বরফে আবৃত থাকে। আয়তনে এটি প্রায় ১ কোটি ৪৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, গড় গভীরতা ১৪৯ মিটার।

পৃথিবীর বৃহত্তম তিনটি মহাসাগর- আটলান্টিক, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ দিক এ মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত। এন্টার্কটিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মাঝখানে এ মহাসাগরের তলদেশ একটি নিমগ্ন মালভূমি।



চিত্র ৩.৩২ : পৃথিবীর বিভিন্ন মহাসাগর

জোয়ার-ভাটা

চন্দ্র ও সূর্য ভূপৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগকে অবিরাম আকর্ষণ করছে। এ আকর্ষণের ফলে ভূপৃষ্ঠের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রত্যহ একস্থানে ফুলে ওঠে এবং অন্যত্র নেমে যায়। পানিরাশির এ ফুলে ওঠাকে জোয়ার (High Tide) ও নেমে যাওয়াকে ভাটা (Low Tide) বলে। সমুদ্রের মধ্যভাগে পানিরাশি সাধারণত ৩০ সেন্টিমিটার থেকে ৯০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ওঠানামা করে। কিন্তু উপকূলের নিকট সাগর ও উপসাগরের গভীরতা কম বলে সেখানে পানিরাশি অনেক বেশি ওঠানামা করে।

জোয়ার-ভাটার কারণ

(১) মহাকর্ষণ শক্তির প্রভাব : পৃথিবীর সকল পদার্থের আকর্ষণ শক্তি আছে এবং একটি অপরটিকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণকে মহাকর্ষণ শক্তি বলে। এই মহাকর্ষণের ফলে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। যে যত বড় তার আকর্ষণ শক্তি তত বেশি। কিন্তু দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে আকর্ষণ শক্তি কমে যায়। সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা ২.৬০ কোটি গুণ বড় হলেও পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব চন্দ্রের দূরত্ব থেকে অনেক বেশি বলে পৃথিবীর ওপর সূর্য অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি প্রায় দ্বিগুণ। ফলে প্রধানত চন্দ্রের আকর্ষণেই জোয়ার-ভাটা হয়।

(২) কেন্দ্রাতিগ বা কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি : কেবল মহাকর্ষণ শক্তির কারণেই জোয়ার হয় না। ঘূর্ণনশীল পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে কেন্দ্রাভিমুখী (Centrifugal Force) শক্তির উৎপত্তি হয়, তার প্রভাবেও জোয়ারের সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রাতিগ শক্তির দ্বারা পানিরাশি ভূপৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। ফলে জোয়ার হয়।

জোয়ারের শ্রেণীবিভাগ : জোয়ার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা- মুখ্য জোয়ার ও গৌণ জোয়ার

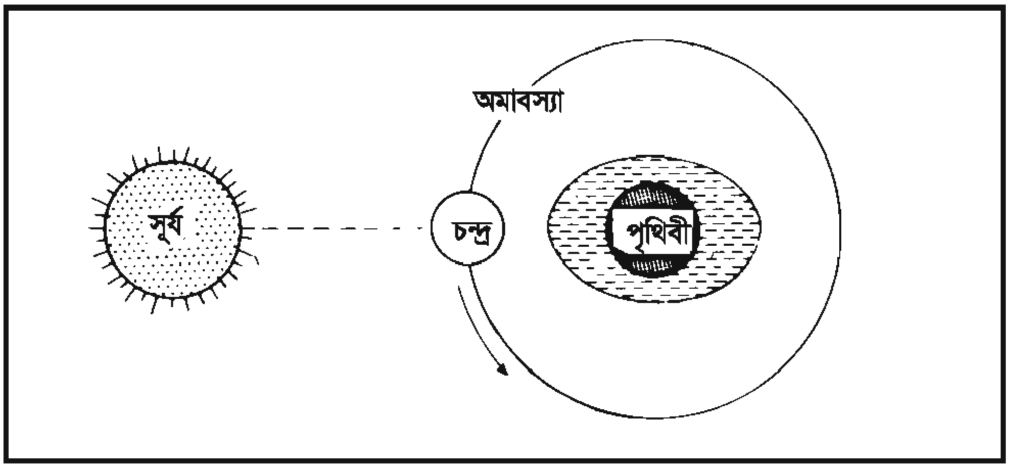
মুখ্য জোয়ার : চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমণ করছে। এ পরিক্রমণকালে পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের নিকটবর্তী হয় সেখানে চন্দ্রের আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। এ আকর্ষণে পার্শ্ববর্তী দুটি স্থানের পানি এসে ঠিক চন্দ্রের নিচে ফুলে ওঠে এবং জোয়ার হয়। একে মুখ্য জোয়ার বা প্রত্যক্ষ জোয়ার বলে।

গৌণ জোয়ার : মুখ্য জোয়ারের বিপরীত দিকে পানির নিচের স্থলভাগ পৃথিবীর কেন্দ্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। ফলে তার ওপর চন্দ্রের আকর্ষণ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের আকর্ষণের সমান থাকে। এতে বিপরীত দিকের পানিরাশি অপেক্ষা স্থলভাগ চন্দ্রের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। ফলে কেন্দ্রাতিগ শক্তির সৃষ্টি হয় এবং দুই দিকের পানি সে স্থানে প্রবাহিত হয়ে যে জোয়ারের সৃষ্টি করে, তাকে গৌণ জোয়ার বা পরোক্ষ জোয়ার (Secondary Tide বা Indirect Tide) বলে।

ভাটা

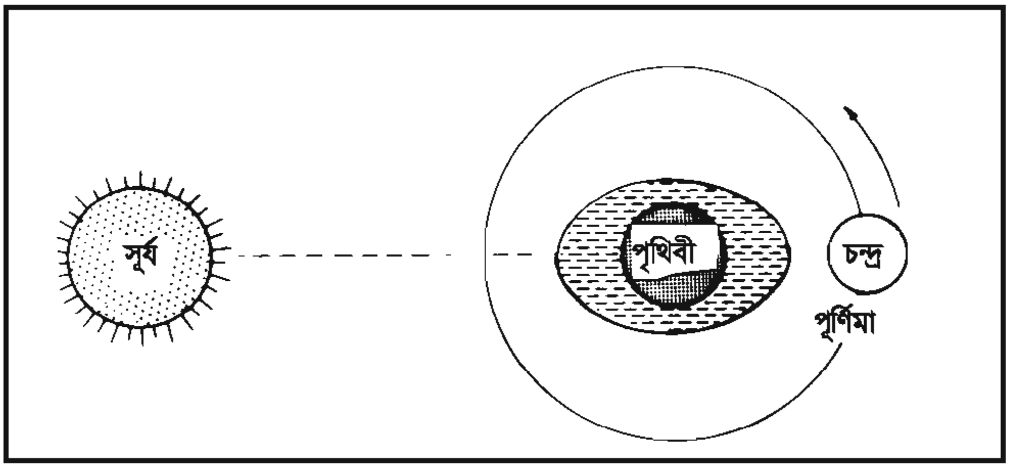
মনে করি পৃথিবীর উপরিভাগ সর্বত্র সমপরিমাণ পানি দ্বারা আবৃত। পৃথিবীর একপাশে মুখ্য জোয়ার ও অন্যপাশে গৌণ জোয়ার যখন হয় তখন দুই জোয়ারের মধ্যবর্তী স্থল থেকে পানি সরে যায়। মধ্যবর্তী স্থলের ঐ অবস্থাকে ভাটা (Ebb- tide) বলে।

ভাটার শ্রেণীবিভাগ : ভাটা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা- তেজ কটাল ও মরা কটাল



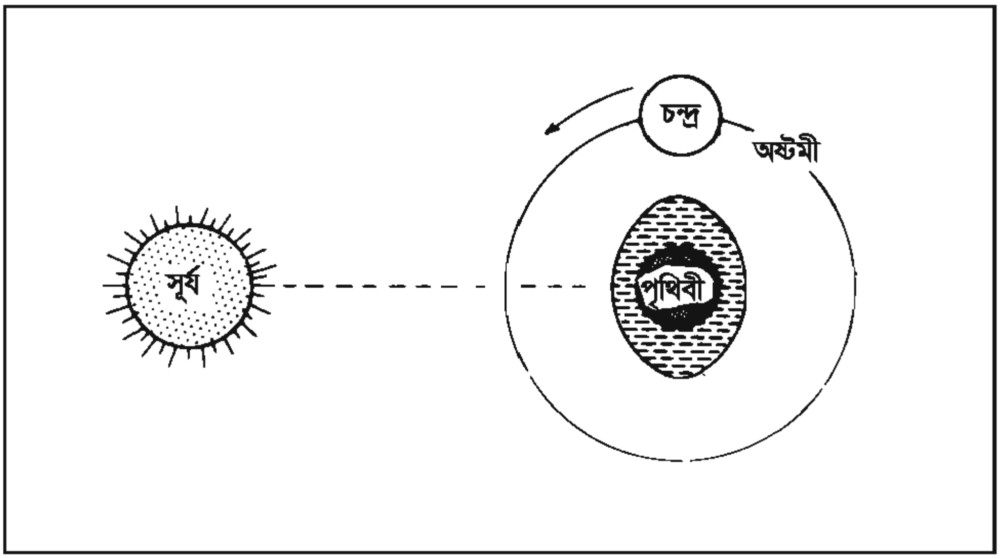
চিত্র ৩.৩৩ : তেজ কটাল বা ভরা কটাল (অমাবস্যায়)

তেজ কটাল : অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর একই পার্শ্বে এবং পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীর এক পার্শ্বে চন্দ্র ও অপর পার্শ্বে সূর্য অবস্থান করে। ফলে এ দুই তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য সমসূত্রে থাকে এবং উভয়ের মিলিত আকর্ষণে যে প্রবল জোয়ারের সৃষ্টি হয় তাকে তেজ কটাল বা ভরা কটাল (Spring Tide) বলে।



চিত্র ৩.৩৪ : তেজ কটাল বা ভরা কটাল (পূর্ণিমায়)

মরা কটাল : অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর সমকোণে অবস্থান করার ফলে চন্দ্রের আকর্ষণে চন্দ্রের দিকে জোয়ার হয়। সূর্যের আকর্ষণের জন্য এ জোয়ারের বেগ তত প্রবল হয় না। এরূপ জোয়ারকে মরা কটাল (Neap Tide) বলে।



চিত্র ৩.৩৫ : অষ্টমী তিথিতে মরা কটাল

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। **কোন মহাসাগরের আকৃতি ত্রিভুজের মতো?**

ক. ভারত মহাসাগর
খ. আটলান্টিক মহাসাগর
গ. প্রশান্ত মহাসাগর
ঘ. দক্ষিণ মহাসাগর

২। **তেজ কটাল হয় যখন–**

ক. চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর সমসূত্রে থাকে
খ. চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর সমকোণে থাকে
গ. শুধু সূর্য পৃথিবীর সমসূত্রে থাকে
ঘ. শুধু চন্দ্র পৃথিবীর সমসূত্রে থাকে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩–৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

গত মাসে মেরন সান স্কুলের ছেলেরা কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে পিকনিক করতে গেলে ভাটার টানে তিনটি ছেলে সমুদ্রে পড়ে মারা যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ছেলেগুলোকে না পাওয়া গেলেও তারপর দিন জোয়ারের পানিতে তাদের লাশ সৈকতে পাওয়া যায়।

৩। **জোয়ার হচ্ছে–**

i. পানিরাশির ফুলে ওঠা
ii. নির্দিষ্ট সময়ে পানিরাশির ফুলে ওঠা
iii. চন্দ্র ও সূর্যের কারণে জল ও স্থলভাগের আকর্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

৪। পানিরাশি ওঠানামা করে কোথায়?

ক. উপকূলের নিকটে
খ. মধ্য সমুদ্রে
গ. সাগরের তীরে
ঘ. সাগর ও মহাসাগরের মিলন স্থলে

৫। ভাটা বলে সে সময়কে–

i. যখন একপাশে মুখ্য জোয়ার ও অন্যপাশে গৌণ জোয়ার হয়
ii. যখন দুই জোয়ারের মধ্যবর্তী স্থল থেকে পানি সরে যায়
iii. যখন সূর্যের আকর্ষণ তীব্র হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশ

অবস্থান

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে বাংলাদেশ অবস্থিত। ২০°৩৪´ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮°০১´ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৯২°৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা পর্যন্ত বাংলাদেশের বিস্তৃতি। বাংলাদেশের প্রায় মধ্য দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। এদেশের মোট আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে ভারত, দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।

ভূপ্রকৃতি

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বদ্বীপ। এদেশের ভূখড উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্রমশ ঢালু। পূর্বে সামান্য উচ্চভূমি ছাড়া সমগ্র দেশ বিস্তীর্ণ সমভূমি।

শ্রেণীবিভাগ : ভূমির বন্ধুরতার পার্থক্য ও গঠনের সময়ানুক্রমিক দিক থেকে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ, (২) প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি ও (৩) সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি।

(১) টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ : টারশিয়ারী যুগে হিমালয় পর্বত গঠনের সময় এসব পাহাড় সৃষ্টি হয়েছিল বলে এগুলোকে টারশিয়ারী পাহাড় বলে। এ পাহাড়ী অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ ও (খ) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।

(ক) উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের দক্ষিণাংশের ছোটবড় বিচ্ছিন্ন পাহাড়গুলো এ অঞ্চলের অন্তর্গত। মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের দক্ষিণের পাহাড়গুলোর উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়। শেরপুর ও ময়মনসিংহের উত্তর সীমানায় কিছু কিছু পাহাড় আছে। উত্তরের পাহাড়গুলোর মধ্যে চিকনাগুল, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া উল্লেখযোগ্য।

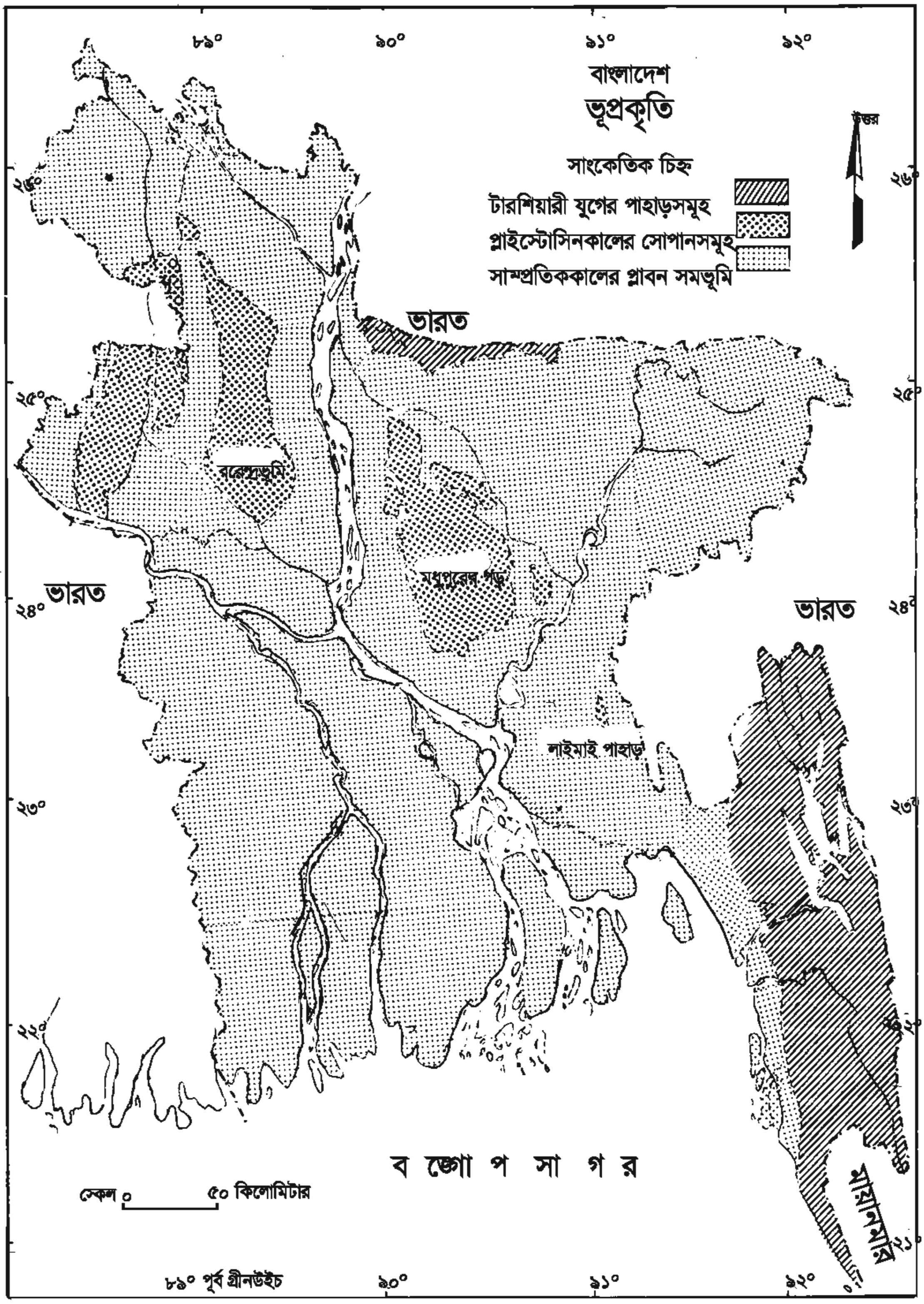
(খ) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলা এবং চট্টগ্রামের অংশবিশেষ এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। বাংলাদেশের শৃঙ্গ কিওক্রাডং (উচ্চতা ১,২৩০ মিটার) এ অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। সাম্প্রতিককালে বান্দরবানে আরো একটি শৃঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর নাম তাজিওডং (বিজয়) এবং উচ্চতা ১,২৩১ মিটার। এটিই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই অঞ্চলের অপর দুইটি উচ্চতার পাহাড় চূড়া হচ্ছে মোদকমুয়াল (১,০০০ মিটার) ও পিরামিড (৯১৫ মিটার)। এসব পাহাড় বেলেপাথর, শেল ও কর্দম শিলা দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলে পাহাড়গুলোর মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়ে কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হালদা প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হয়েছে।

(২) প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি : ২৫,০০০ বছর পূর্বে প্লাইস্টোসিনকালে আন্তঃবরফগলা পানিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে এসব চত্বরভূমি গঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এ অঞ্চলের মাটির রং লাল ও ধূসর। নিচে এ উচ্চভূমিগুলোর বর্ণনা দেওয়া হল।

বরেন্দ্রভূমি : বরেন্দ্রভূমি রাজশাহী বিভাগের প্রায় ৯,৩২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে আছে। প্লাবন সমভূমি থেকে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার।

মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় : উত্তরের ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত অর্থাৎ ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর অঞ্চলজুড়ে এর বিস্তৃতি। এর মোট আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গ কিলোমিটার। মাটি কংকর মিশ্রিত ও লাল। গড়ের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশের উচ্চতা ৬ মিটার কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর দিকের উচ্চতা ৩০ মিটার।

লালমাই পাহাড় : এটি লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত বিস্তৃত। এর আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গ কিলোমিটার। এ পাহাড়ের গড় উচ্চতা ২১ মিটার। এর মাটি লালচে এবং নুড়ি, বালি ও কংকর দ্বারা গঠিত।



চিত্র ৩.৩৬ : বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

(৩) সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি

বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ভূমি এ অঞ্চলের আওতায় পড়ে। এ অঞ্চল পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদী এবং এদের উপনদী ও শাখানদী বাহিত পলি দ্বারা গঠিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ সমভূমির গড় উচ্চতা ৯ মিটারের কম। এ অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে অসংখ্য বিল ও জলাভূমি ছড়িয়ে আছে। এগুলো এদেশে ভূপ্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রাজশাহী ও পাবনার চলন বিল, মাদারিপুরের বিল ও সিলেটের হাওরগুলো বর্ষার পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে হ্রদের আকার ধারণ করে। এ সমভূমি অঞ্চলের ভূমি খুব উর্বর।

জলবায়ু

বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব বেশি বলে বাংলাদেশের জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু বলে। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং শীতকালীন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১° সেলসিয়াস। বাংলাদেশের সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত রাজশাহীর লালপুরে এবং সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত সিলেটের লালখানে পরিলক্ষিত হয়। এদেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ২০৩ সেন্টিমিটার। পশ্চিমাংশ অপেক্ষা পূর্বাংশে বৃষ্টিপাতের পরিমান বেশি। বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে প্রধানত তিনটি ঋতুতে ভিভক্ত করা যায়। যথা- (১) গ্রীষ্মকাল, (২) বর্ষাকাল ও (৩) শীতকাল।

(১) গ্রীষ্মকাল : মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে গ্রীষ্ককাল। গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের উষ্ণতম ঋতু। গ্রীষ্ককালে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে উষ্ণ ও আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু এবং পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। এই দুই বায়ুর সংঘর্ষে প্রায়ই ঝড় বৃষ্টি হয়। এই ঝড়কে 'কালবৈশাখী' বলে। কালবৈশাখী দেশের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। কালবৈশাখীর বৃষ্টিপাত কৃষিজ দ্রব্য বিশেষ করে পাট ও ধান উৎপাদনে সহায়ক।

(২) বর্ষাকাল : বাংলাদেশে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল স্থায়ী হয়। বর্ষাকালে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত মহাসাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প নিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয়। এছাড়া জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু পর্বতগাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, রাঙামাটি ও বান্দরবানের পাহাড়িয়া অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের পাঁচ ভাগের চার ভাগই বর্ষাকালে হয়ে থাকে। এসময়ে সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১৯ সেন্টিমিটার এবং সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ৩৪০ সেন্টিমিটার।

(৩) শীতকাল : নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে শীতকাল থাকে। শীতকালে উত্তর-পূর্ব শুষ্ক মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে।

বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে বাংলাদেশের প্রধান ফসল ধান, পাট, আখ, চা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাতের প্রভাবে আম, কাঁঠাল, জাম, লিচুর ফলনও বৃদ্ধি পায়। শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। এই সামান্য বৃষ্টিপাতের ফলে নানা প্রকার তেলবীজ, ডাল, গোলআলু, পিঁয়াজ, রসুন, ধনে প্রভৃতি রবিশস্যের ফলন হয়।

বাংলাদেশের নদী

বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলো হচ্ছে- পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলী, সাঙ্গু ইত্যাদি।

পদ্মা : পদ্মা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গা প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এর একটি শাখা ভাগীরথী নামে পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। গঙ্গার মূল প্রবাহ। রাজশাহী অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে পদ্মা নামে ১৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমা নির্দেশ করে কুষ্টিয়ার উত্তর প্রান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর দৌলতদিয়ার কাছে যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত ধারা পদ্মা নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই তিন নদীর মিলিত স্রোত মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কুমার, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁ পদ্মার শাখানদী। উপনদীগুলোর মধ্যে মহানন্দা প্রধান। কপোতাক্ষ ও পশুর ভৈরবের শাখানদী। পুনর্ভবা, নাগর, কুলিক, ট্যাংগন মহনন্দার উপনদী।

ব্রহ্মপুত্র : ব্রহ্মপুত্র হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের নিকটে মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে তিব্বত ও আসামের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ময়মনসিংহের দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরববাজারের দক্ষিণে মেঘনায় পড়েছে। প্রায় পৌনে দুশ' বছর আগে এটিই ব্রহ্মপুত্রের মূল গতিপথ ছিল। **ধরলা** ও **তিস্তা** ব্রহ্মপুত্রের প্রধান উপনদী এবং **বংশী** ও **শীতলক্ষা** প্রধান শাখানদী।

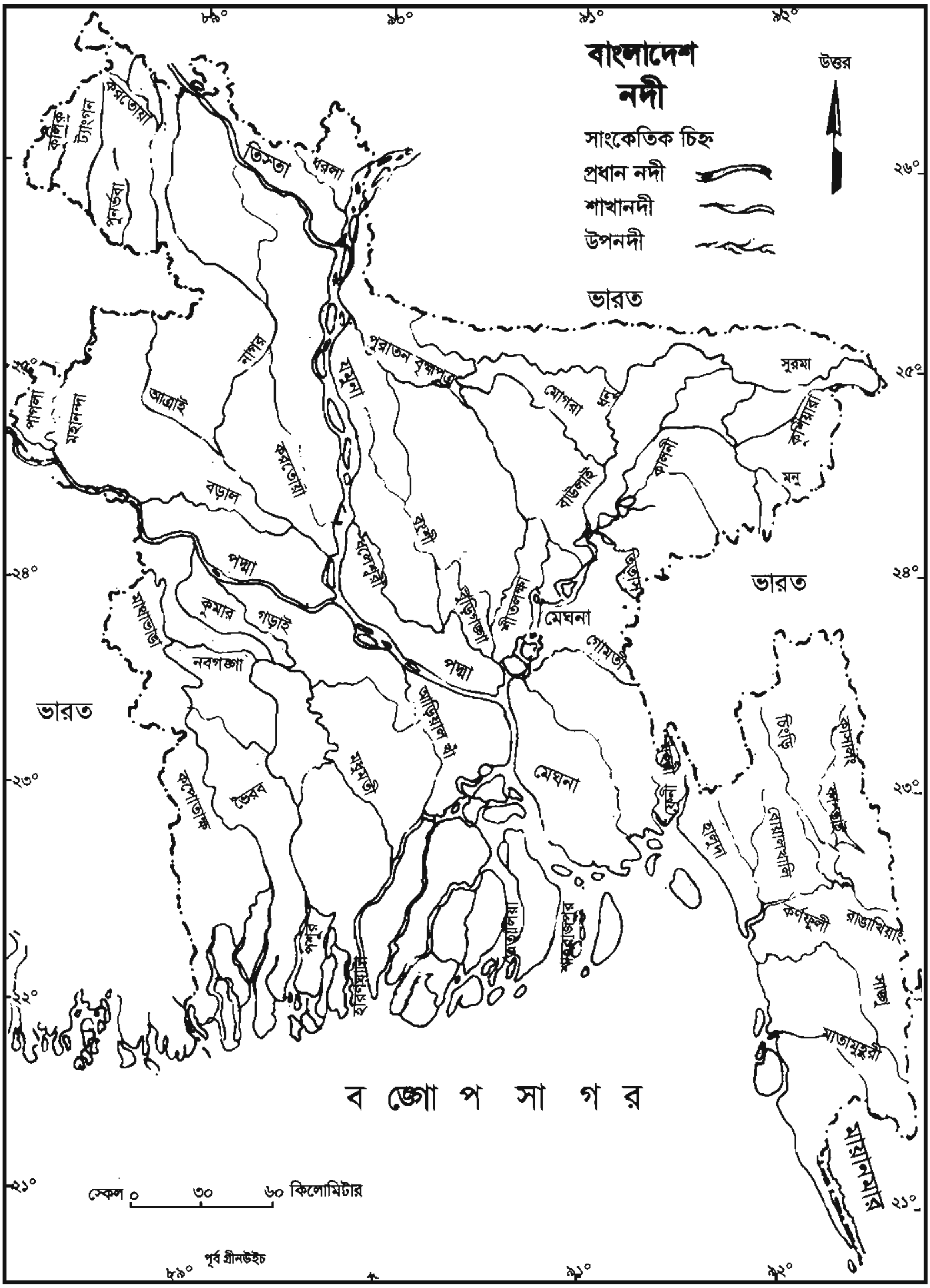
যমুনা : ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনা নামে সরাসরি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে দৌলতদিয়ার কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। **করতোয়া** ও **আত্রাই** যমুনার প্রধান উপনদী। **ধলেশ্বরী** যমুনার শাখানদী এবং বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরীর শাখানদী।

মেঘনা : নাগা ও মণিপুরের দক্ষিণ ঢালে উৎপন্ন বরাক নদী সিলেট সীমান্তে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। উত্তরের শাখা সুরমা পশ্চিম দিকে ছাতক, সিলেট ও সুনামগঞ্জের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আজমিরিগঞ্জের কাছে কালনী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দক্ষিণের শাখা কুশিয়ারা আজমিরিগঞ্জের উত্তরে কালনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সুরমা ও কুশিয়ারার মিলিত প্রবাহ দক্ষিণে কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করে। মেঘনা ভৈরববাজারে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে এবং চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। **মনু, বাউলাই, তিতাস, গোমতী** প্রভৃতি এর উপনদী।

কর্ণফুল : আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে এ নদী রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। **হালদা, বোয়ালখালি** ও **কাসালং** এ নদীর প্রধান উপনদী। পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য এ নদীর গুরুত্ব অধিক।

সাঙ্গু : সাঙ্গু আরাকান পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে এবং ফেনী নদী পার্বত্য ত্রিপুরায় উৎপন্ন হয়ে ফেনী জেলার পূর্ব সীমানায় মেঘনার মোহনায় পতিত হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর নদীর প্রভাব অপরিসীম। সেচের পানি, শিল্পে ব্যবহৃত পানি ও পানিবিদ্যুৎ শক্তির উৎস হচ্ছে নদী। মাছেরও উৎস হচ্ছে নদী। নদীগুলো পরিবহণ ও যোগাযোগের প্রধান উপায়। নদী জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। নদীমাতৃক বাংলাদশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ ইত্যাদি বহুলাংশে নদীর ওপর নির্ভরশীল বলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম।



চিত্র ৩.৩৭ : বাংলাদেশের নদী

প্রাকৃতিক সম্পদ : কৃষিজ

বাংলাদেশে নানান রকম ফসল উৎপাদিত হয়। এই সব ফসলকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়- **খ্যাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল**।

খাদ্য শস্য : কৃষিযোগ্য ভূমির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জমিতেই খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, ডাল, তেলবীজ, ভুট্টা, যব, জোয়ার ও নানান রকম মসলা প্রধান। কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য এদেশ খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

ধান : ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। দেশের শতকরা ৭০ ভাগ আবাদী জমিতে ধানের চাষ হয়। নদী উপত্যকার পলিমাটি, সমতল ভূমি, ১৬° থেকে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ১০০ থেকে ২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত ধান চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশে উৎপন্ন ধানকে প্রধানত **আউশ, আমন** ও **বোরো** এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। আউশ ধান উঁচু জমিতে, আমন ধান অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে এবং বোরো ধান শীতকালীন ফসল হিসেবে বিভিন্ন নিচু জলাশয়, বিল, হাওরসহ অন্যান্য জমিতে উৎপন্ন হয়। বর্তমানে উচ্চফলনশীল বিভিন্ন শ্রেণীর ইরি ও বিরি ধানের চাষ করা হচ্ছে। এর ফলন একর প্রতি ৪৩ কুইন্টালের অধিক। রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, রাজশাহী, বরিশাল, পটুয়াখালি, ঢাকা, দিনাজপুর ও খুলনা অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশি ধান উৎপন্ন হয়। তবে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধান হিসেবে বরিশাল ও পটুয়াখালি অঞ্চলের বালাম, দিনাজপুরের কাটারিভোগ ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিরই এবং নোয়াখালি ও কুমিল্লা অঞ্চলের কালিজিরা ও চিনিগুঁড়া উল্লেখযোগ্য। ২০০৬-০৭ সালে ২ কোট ৬১ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমিতে ২ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৩ হাজার মেট্রিকটন ধান উৎপন্ন হয়। (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা পরিশিষ্ট - ২৭ পৃ: ২৪৫)

গম : গম বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য। এটি শীতকালীন ফসল। ২০০৬-০৭ সালে প্রায় ৯.৮৮ লক্ষ একক জমিতে ৭.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হয়। সমতল ভূমিতে ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৫০ থেকে ৭৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত গম চাষের জন্য প্রয়োজন। রংপুর, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও পাবনা অঞ্চলে গম বেশি উৎপন্ন হয়। (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা পরিশিষ্ট- ২৭ পৃ: ২৪৫)

ডাল : ডাল জাতীয় শস্যের মধ্যে মুগ, মসুর, ছোলা, খেসারি, মাষকলাই, মটর, অড়হর ইত্যাদি প্রধান। ২০০৬-০৭ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৭৬৯ হাজার একর জমিতে ২৫৮ হাজার মেট্রিক টন ঢাল উৎপন্ন হয় দেশের প্রায় সব জেলাতেই ডাল জন্মে। তবে পদ্মা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে বেশি উৎপন্ন। হয়। (উৎস : বা: অ: স: পরিশিষ্ট - ২৭ পৃ: ২৪৫)।

তেলবীজ : বাংলাদেশে উৎপন্ন তেলবীজের মধ্যে সরিষা, তিল, তিসি, রেড়ি উল্লেখযোগ্য। সরিষা উৎপাদনে ময়মনসিং, রাজশাহী, দিনাজপুর ও ঢাকা অঞ্চল প্রসিদ্ধ। ফরিদপুর, কুমিল্লা ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রচুর তিল ও তিসি জন্মে। কুমিল্লা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ অঞ্চল বাদাম চাষের জন্য বিখ্যাত। ২০০৬-০৭ সালে প্রায় ৭৮৯ হাজার একর জমিতে ৩২২ হাজার মেট্রিক টন তেলবীজ উৎপাদিত হয় (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি ২৭, পৃষ্ঠা ২৪৫)।

অন্যান্য খাদ্যশস্য : খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান; রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে ভুট্টা, দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলসমূহে যব; রংপুর, দিনাজপুর ও ব্রহ্মপুত্র-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে জোয়ার ও বাজরার চাষ হয়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ঋতুতে নানান রকম ফল উৎপন্ন হয়। এছাড়া বিভিন্ন রকমের মসলার চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রতিবছর প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়।

অর্থকরী ফসল : যে সকল ফসল সরাসরি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে চাষ করা হয় তাদের **অর্থকরী ফসল** বলে। অর্থকরী ফসল দেশে বাজারজাত বা বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে।

অর্থকরী ফসলের মধ্যে **পাট, চা, আখ, তামাক, রেশম, রাবার** ও **তুলা** প্রধান।

পাট : পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে পাটকে **'সোনালি আঁশ'** বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পাট বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়। ২০০৬-০৭ সালে ১০.৩৪ লক্ষ একর জমিতে ৮.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন পাট উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, নদী উপত্যকার উর্বর পলিমাটি, সুলভ শ্রমিক, পাটের উন্নতমানের জন্য ব্যাপক চাহিদার কারণে বাংলাদেশে পাট চাষ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কিছু না কিছু পাট জন্মে। তবে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা ও আত্রাই নদীর উপত্যাকায়, পদ্মা নদীর অববাহিকায়, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরে পাট ভাল জন্মে। ময়মনসিংহ-ঢাকা-কুমিল্লা অঞ্চল শ্রেষ্ঠ **'পাটবলয়'**। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে পাট রপ্তানি করা হয়। (উৎস : বা: অ:স: পরিশিষ্ট - ২৭ পৃ: ২৪৫।

চা : চা বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান অর্থকরী ফসল। চা বাগানগুলো বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় অবস্থিত। বাংলাদেশে মোট ১৫৮টি চা বাগান আছে। পানি নিষ্কাশন বিশিষ্ট উঁচু ও ঢালু জমি, ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত, ১৫° থেকে ১৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং উর্বর, লোহ ও জৈব মিশ্রিত দোআঁশ পলিমাটি চা চাষের জন্য উপযোগী। মোট উৎপাদিত চা এর শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ২০০৬-০৭ সালে ৫৫.৯০ হাজার মেট্রিক টন চা উৎপাদিত হয়। (উৎস: বা: অ: স: ২০০৮ সারণি ৩৩ পৃ: ২৫১)

তামাক : বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম তামাক উৎপাদনকারী দেশে। ২০০৬-০৭ সালে ৭৬ হাজার একর জমিতে ৩৯ হাজার মেট্রিক টন তামাক উৎপন্ন হয়। তামাক চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু, ১৮.৭° থেকে ২৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ১০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা ও কুষ্টিয়া অঞ্চল তামাক চাষের জন্য প্রসিদ্ধ।

আখ : বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু আখ চাষের বিশেষ উপযোগী। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের তুলনায় উত্তরাঞ্চলে বেশি আখ জন্মে। প্রাধান আখ উৎপাদনকারী অঞ্চল হচ্ছে রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ। ২০০৬-২০০৭ সালে ৩৭১ হাজার একর জমিতে প্রায় ৫৭.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন আখ উৎপন্ন হয় (উৎস : বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি ২৭, পৃষ্ঠা ২৪৫।)

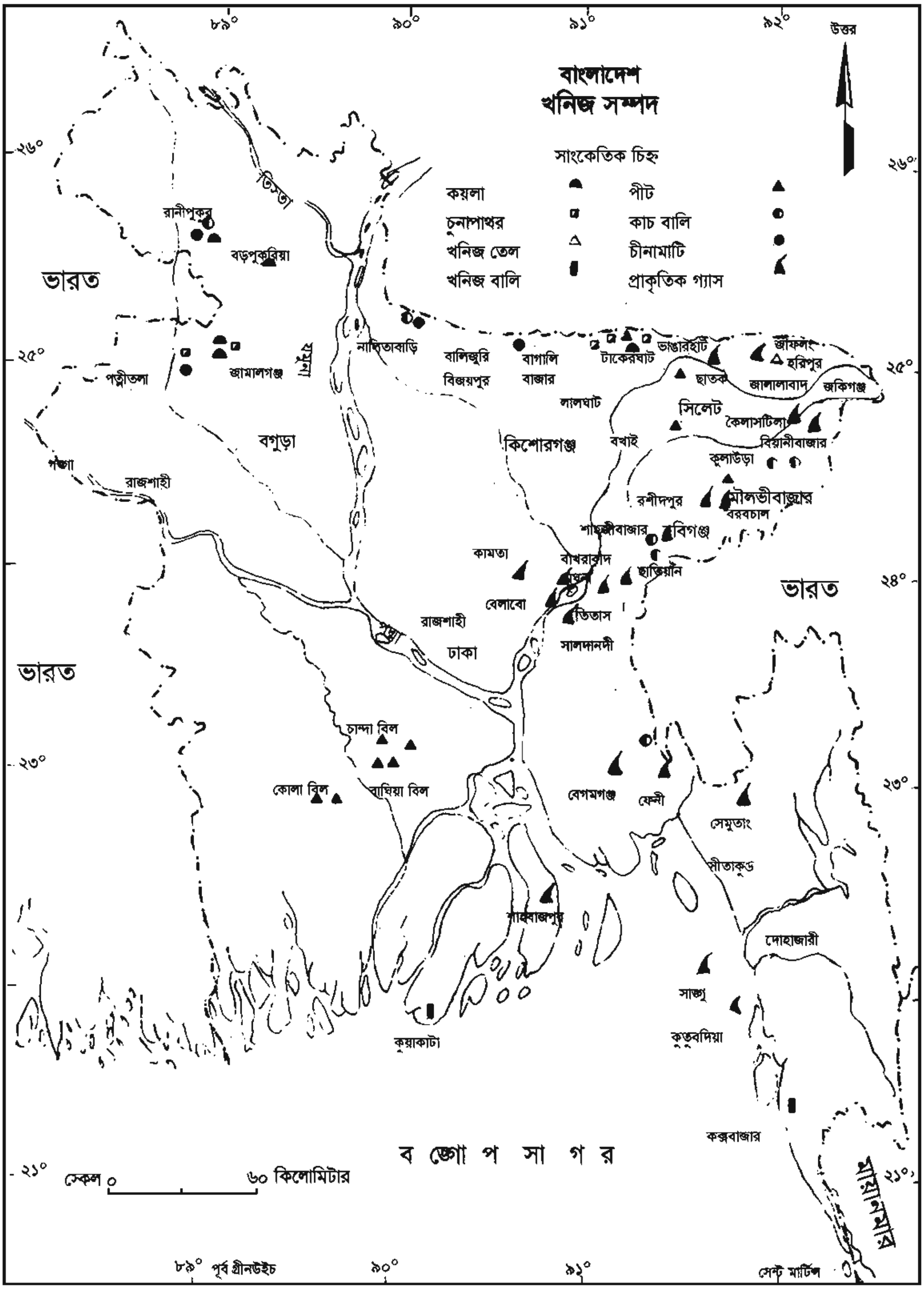
অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে যশোর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী অঞ্চলে তুলা: অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও সিলেটে রবার; রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলে রেশম উৎপাদিত হয়।

খনিজ

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নয়। তবে বাংলাদেশে কয়েকটি প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) **শক্তি সম্পদ**, (২) **ধাতব খনিজ** ও (৩) **অধাতব খনিজ**।

শক্তি সম্পদ

(১) কয়লা : জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ, নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া, সুনামগঞ্জ জেলার লালঘাট, টাকেরঘাট প্রভৃতি স্থানে উন্নতমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লা পাওয়া গেছে। ফরিদপুরে চান্দা বিল ও বাঘিয়া বিল, খুলনা অঞ্চলের কোলা বিল, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে পীট কয়লা পাওয়া গেছে। ১৯৯৪ সাল থেকে বগুড়ার নন্দীগ্রাম থেকে চীন ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় কয়লা উত্তোলন শুরু হয়েছে। শক্তি উৎপাদনে, স্পিরিট ও আলকাতরা তৈরির কাজে কয়লা ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ৩.৩৮ : বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

(২) খনিজ তেল : সিলেট জেলার হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র, রশীদপুর ও তিতাস গ্যাসক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ খনিজ তেল পাওয়া গেছে। এছাড়া মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে একটি তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। শক্তি উৎপাদনে ও বিভিন্ন যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে তেল ব্যবহৃত হয়।

(৩) প্রাকৃতিক গ্যাস : প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ । এ পর্যন্ত প্রায় ২৩টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ১৭টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। এর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস সববৃহৎ অন্যান্য গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে নরসিংদি, হবিগঞ্জ, সিলেট জালালাবাদ, কৈলাসটিলা, বাখরাবাদ, রশীদপুর, মেঘনা, বিয়ানীবাজার, সাঙ্গা, সালদানদী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব গ্যাসক্ষেত্রে ১৩২২৩.১৪৯ বিলিয়ন ঘনফুট গ্রাস মজুদ আছে বলে অনুমান করা হয় (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি ১০.১২, ১০.১৩ পৃষ্ঠা ১২২, ১২৩)। তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন, গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক কাজে এ গ্যাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া সেমুতাং, বেগমগঞ্জ, কুতবদিয়া, ফেনী, ফেঞ্চুগঞ্জ, ছাতক, শাহবাজপুর, কামতা, বিবিয়ানা, মৌলভীবাজার প্রভৃতি স্থানেও গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে।

ধাতব খনিজ

তামা : রংপুর জেলার রানীপুকুর, পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

অধাতব খনিজ

(১) চুনাপাথর : টাকেরঘাট, লালঘাট, জাফলং, ভাঙারঘাট, জকিগঞ্জ, জয়পুরহাট, জামালগঞ্জ, সেন্টমার্টিন্স দ্বীপ ও সীতাকুন্ডে চুনাপাথর পাওয়া যায়। সিমেন্ট, ইস্পাত, গ্যাস কাগজ, ব্লিচিং পাউডার ও গৃহনির্মাণ কাজে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়।

(২) চীনামাটি বা শ্বেতমৃত্তিকা : ময়মনসিংহের বিজয়পুর এবং নওগাঁ জেলার পত্নীতলায় চীনামাটি পাওয়া যায়। বিজয়পুরে আনুমানিক ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টন চীনামাটি সঞ্চিত আছে। বাসনপত্র, বৈদ্যুতিক ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারি জিনিসপত্র নির্মাণ শিল্পে এটি ব্যবহৃত হয়।

(৩) সিলিকা বালি : হবিগঞ্জের নয়াপাড়া, ছাতিয়ান, শাহজীবাজার, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া, চট্টগ্রামের দোহাজারী, জামালপুরের গারো পাহাড়ে ও কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে সিলিকা বালি পাওয়া গেছে। এ সকল অঞ্চলে সঞ্চিত সিলিকা বালির পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ টন। প্রধানত কাচ নির্মাণে, রাসায়নিক দ্রব্য ও রং প্রস্তুতেও সিলিকা বালি ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া কুতুবদিয়া ও টেকনাফে প্রচুর খনিজ বালি এবং সিলেট, পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামে নুড়িপাথর পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ায় বাংলাদেশের একমাত্র গন্ধকের খনির সন্ধান পাওয়া গেছে।

মৎস্য

মৎস্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রাণিজ সম্পদ। মাছ দেশবাসীর প্রিয় খাদ্য। এদেশের অসংখ্য খালবিল, নদী, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয় এবং সুবিস্তৃত সাগর উপকূল মৎস্য চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (১) **সামুদ্রিক মৎস্য** ও (২) **মিঠা পানির মৎস্য**।

সামুদ্রিক মৎস্য : বংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। ২০০৭-০৮ সালে সামুদ্রিক জলাশয় থেকে ৪.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৫ লক্ষ লোক সামুদ্রিক মৎস্য শিকারে নিয়োজিত।

দেশের দক্ষিণে প্রায় ৭২০ কিলোমিটার দীর্ঘ তটরেখা বরাবর প্রায় ১০ লক্ষ ১ হাজার হেক্টর অঞ্চলজুড়ে মৎস্যক্ষেত্র অবস্থিত। উপকূল ভাগে অসংখ্য নদী মোহনা, খাড়ি বর্তমান থাকায় এসব স্থান মাছের বসবাস ও বিচরণের জন্য খুবই উপযুক্ত। এসব স্থানে মাছের নানাধরনের খাদ্য ও রয়েছে। মোহনার লোনা ও মিঠা পানির সংযোগস্থল মাছের বংশবৃদ্ধির পক্ষে খুবই সহায়ক। (উৎস : বা: অ: স: ২০০৮ সারণি ৭.৮ : পৃ: ৮৯)।

পূর্ব উপকূলে সেন্টমার্টিন্স দ্বীপ, কক্সবাজার, কুতুবদিয়া, মহেশখালি, হাতিয়া, সন্দ্বীপ ও পশ্চিম উপকূলে দুবলারচর, রাঙাবালি ও বড় বাইশদিয়া প্রধান মৎস্য চারণ কেন্দ্র।

সামুদ্রিক মৎস্যের মধ্যে ভেটকি, রূপচান্দা, লাক্ষা, ছুরি, কোরাল, গলদাচিংড়ি প্রধান। রপ্তানিকৃত মাছের মধ্যে গলদাচিংড়ি প্রধান।

মিঠা পানির মৎস্য : নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রায় ৭,২৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ নদী, অসংখ্য পুকুর, খার, বিল, হাওর, জলাশয় প্রভৃতির প্রায় ৪৮,৬৯৪ বর্গ কিলোমিটার এলকা নিয়ে মিঠা পানির মৎস্যক্ষেত্র গড়ে উঠেছে।

বর্ষাকালে দেশের এক বিস্তৃত এলাকা পানিতে ডুবে থাকে। উন্মুক্ত এলাকা মাছের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়া বর্ষার পানিতে খাল, বিল, পুকুর ও হাওরে মাছের প্রিয় খাদ্য শেওলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে।

দেশে রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, শোল, বোয়াল, গজার, পাঙ্গাশ, আড়, কালবাউস প্রভৃতি বড় মাছ এবং কৈ, মাগুর, শিঙি, তেলাপিয়া, নাইলোটিকা, সিলভার কাপ, আফ্রিকান মাগুর, পাবদা, তপসি, চিংড়ি, টেংরা, সরপুটি প্রভৃতি অনেক প্রজাতির ছোট মাছ পাওয়া যায়।

ভৈরবরাজার, আশুগঞ্জ, চাঁদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারিপুর, কুলিয়ারচর প্রভৃতি প্রধান অভ্যন্তরীণ মৎস্য কেন্দ্র। ২০০৭-০৮ সালে ২১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন মিঠা পানির মাছ ধরা হয়। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৭৩৭০৩.৭৭ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৩৩৫২.৮৮ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় (উৎস : বা: অ: স: ২০০৮ পৃষ্ঠা ৯০)।

বনজ

স্বাভাবিকভাবে কোনো অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের যে অসংখ্য বৃক্ষের সমারোহ দেখা যায় তাকে অরণ্য বা বনভূমি বলে। বনভূমি থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে বনজ সম্পদ বলে।

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিশুদ্ধ পরিবেশ রক্ষার জন্য সেই দেশের মোট আয়তনের প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার। ১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ চিল ২১,৯১৪ বর্গ কিলো মিটার। বর্তমানে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ হলে ২৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ দেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৬১)। এটি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপর্যাপ্ত। জলবায়ুর তারতম্য ও মৃত্তিকার গঠন পার্থক্যহেতু বিভিন্ন রকম উদ্ভিজ দেখা যায়। উদ্ভিজ্জের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলাদেশের বনভূমি তিন প্রকার। যথা- **(১) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি, (২) ক্রান্তীয় পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বা শালবন ও (৩) স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।**

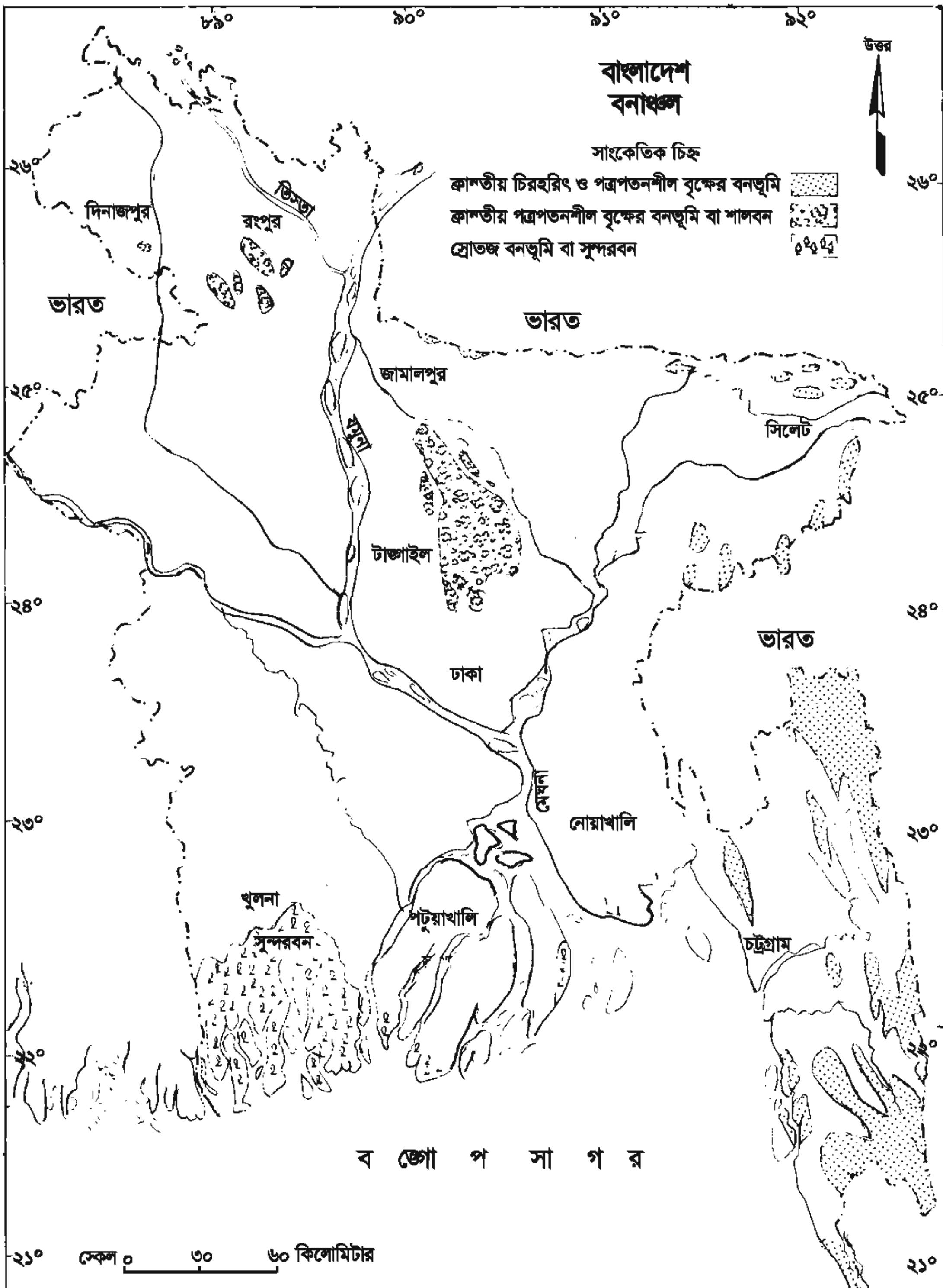
(১) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি : চট্টগ্রামে ২,৬০১ বর্গ কিলোমিটার, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবানে ১০,৫৪৪ বর্গ কিলোমিটার এবং সিলেটে ৯৫৭ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে এ বনভূমি বিস্তৃত। পার্বত্য অঞ্চলের যে সকল এলাকায় বৃষ্টিপাত প্রায় ২৫০ সেন্টিমিটার এবং তাপমাত্রা ৩৩° সেলসিয়াস এর ওপর সেখানে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

এই অঞ্চলে ময়না, তেলসুর, চাপালিস, গর্জন, গামার জারুল, কড়ই বাঁশ, বেত, হোগলা প্রভৃতি জন্মে। এ বনে নানা প্রকার পশুপাখি পাওয়া যায় এবং মধু ও মোম সংগ্রহ করা হয়।

কর্ণফুলী কাগজের কল ও রেয়ন মিল পার্বত্য অঞ্চলের কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। গর্জন ও জারুল দ্বারা **রেলপথের স্লিপার** এবং গামার, চাপালিশ দ্বারা সাম্পান ও নৌকা তৈরি হয়।

(২) ক্রান্তীয় পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বা শালবন : এ শ্রেণীর বনভূমি ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুরে অবস্থিত। সামান্য কিছু রংপুর ও দিনাজপুরে দেখতে পাওয়া যায়। এ বনভূমির আয়তন ১,৩৩৮ বর্গ কিলোমিটার। এ বনাঞ্চলের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ বৃক্ষই শাল বা গজারি। এছাড়া ছাতিম, কুর্চি, কড়ই ও হিজল গাছ জন্মে।

শালকাঠ **ঘরের ও বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি** এবং জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ছাতিম টেক্সটাইল মিলে, কুর্চি ছাতার বাঁট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ৩.৩৯ : বাংলাদেশের বনাঞ্চল

(৩) স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত বাংলাদেশের বৃহত্তম ও পৃথিবীর অন্যতম গরান বৃক্ষের বনভূমি এটি।

এ বনভূমির আয়তন ৬,৪৭৪ বর্গ কিলোমিটার। বেশির ভাগই সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। মাত্র ৯৫ বর্গ কিলোমিটার পটুয়াখালি ও বরগুনায় অবস্থিত।

এ বনভূমিতে সুন্দরী, গেওয়া, গরান, কেওড়া, ধুন্দল, পশুর, বায়েন ইত্যাদি বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। এছাড়া ছন, গোলপাতা এবং মধু, মোম ও ওষুধ তৈরির বনজ লতাপাতা সুন্দরবন থেকে সংগ্রহ করা হয়। সুন্দরী ও গরান সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ। জঙ্গালে বাঘ, হরিণ, কুমির, সাপ ও নানা প্রকার পাখি বাস করে। সুন্দরী বড় বড় খুঁটি তৈরিতে, গেওয়া নিউজপ্রিন্ট ও দিয়াশলাই কারখানায়, ধুন্দল ও গরান পেনসিল তৈরিতে, গোলপাতা ঘরের ছাউনিতে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সুন্দরবনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

শিল্প

শিল্পক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশেষ উন্নত নয়। বাংলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম শিল্প গড়ে উঠেছে। বৃহৎ শিল্পগুলোর মধ্যে পাট, বস্ত্র, কাগজ, চিনি, সার, সিমেন্ট প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

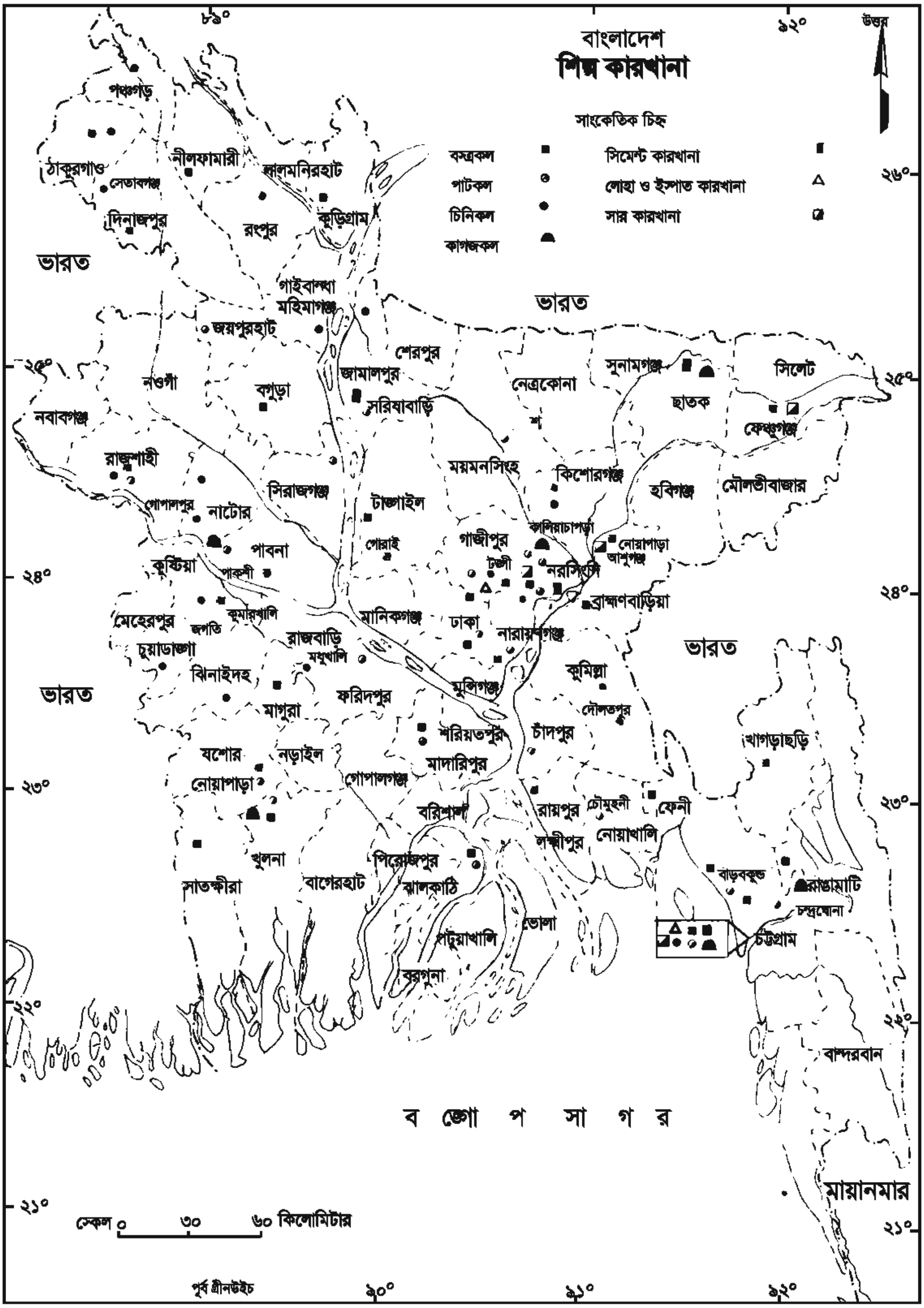
পাট শিল্প : এদেশে সর্বপ্রথম পাটকল স্থাপিত হয় ১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জের আদমজীনগরে। ৩,০০০ তাঁত বিশিষ্ট এ পাটকলটি বাংলাদেশ ও পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল ছিল। পর্যাপ্ত কাঁচামাল, উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু ও সুলভ শ্রমিক সরবরাহই এদেশে পাট শিল্প গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশের পাট শিল্পকে ৪টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। ঢাকা অঞ্চল, চট্টগ্রাম অঞ্চল, খুলনা অঞ্চল ও রাজশাহী অঞ্চল। এসব অঞ্চলে অধিকাংশ পাটকল অবস্থিত। এছাড়া ডেমরা, ঘোড়াশাল, নরসিংদি, ভৈরববাজার, গৌরীপুর, মাদারিপুর, সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও পাটকল আছে। ২০০৬-০৭ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন পাটকলে ৩২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের প্রায় ২৬৩.৩৬ হাজার মেট্রিক টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এ সকল পাটকলে চট, বস্তা, কার্পেট, দড়ি, কার্পেট ব্যাকিং, ক্যানভাস, উলপ্যাক প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বর্তমানে দেশের পাটকলগুলোতে ১ লক্ষ ৮০ হাজার শ্রমিক নিয়োজিত আছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, মিসর, জার্মানি প্রভৃতি দেশ পাট ও পাটজাত দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা।

বস্ত্র শিল্প : বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। বাংলাদেশে প্রায় ১,০৭৮টি তাঁতবিশিষ্ট ৬৩টি বস্ত্রকল আছে। অনুকূল জলবায়ু, সহজশর্তে কাঁচামাল আমদানি, প্রচুর সুলভ শ্রমিক, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ, দেশে-বিদেশে ব্যাপক চাহিদা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের প্রধান বস্ত্র শিল্প ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালি, পাবনা, যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। রেশম বস্ত্র শিল্প প্রধানত রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। এছাড়া বাংলাদেশে কয়েকটি কৃত্রিম তন্তুর মিলও রয়েছে। এদের মধ্যে আনোয়ার সিল্ক মিলস্, চন্দ্রঘোনা রেয়ন মিলস ও ভালিকা উলেন মিলস প্রধান। বাংলাদেশে ২০০৬-০৭ সালে বস্ত্রকলগুলোতে ৪৩.৭৩ মিলিয়ন মিটার কাপড় উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, পাকিস্তান, ভারত প্রভৃতি দেশ থেকে বাংলাদেশ তুলা, সুতা ও বস্ত্র আমদানি করে।

চিনি শিল্প : বাংলাদেশের অন্যতম শিল্প হল চিনি শিল্প। ১৯৪৭ সালে ৫টি চিনিকল ছিল, বর্তমানে চিনিকলের সংখ্যা ১৭টি। বাংলাদেশের চিনিকলগুলো আখ উৎপাদন অঞ্চল যথা- রাজশাহী, খুলনা ও ঢাকা বিভাগে গড়ে উঠেছে। এসব জায়গার ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও মৃত্তিকা আখ উৎপাদনের অনুকূলে। গোপালপুর, দর্শনা, মহিমাগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, দেওয়ানগঞ্জ, জয়পুরহাট, জগতি, হরিয়ান, মোবারকগঞ্জ, শ্যামপুর, পঞ্চগড়, মধুখালি, নাটোর, কালিয়াচাপড়া, সেতাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও চরসিন্দুরে চিনিকল অবস্থিত।



চিত্র ৩.৪০ : বাংলাদেশের শিল্প কারখানা

২০০৬-০৭ সালে বাংলাদেশে ১৬২.৪০ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশ চিনি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ফলে প্রতিবছর ভারত, ব্রাজিল, কিউবা প্রভৃতি দেশ থেকে চিনি আমদানি করতে হয়। (উৎস: বা: অ: স: ২০০৮ প: ৩৩ পৃ: ২৫১)।

কাগজ শিল্প : কাগজ শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিল্প। দেশে ৭টি কাগজকলসহ মোট ১১টি কাগজ ও হার্ডবোর্ড কারখানা রয়েছে। বাঁশ, আখের ছোবড়া, নলখাগড়া, পাটকাঠি প্রভৃতি কাঁচামালের প্রাচুর্য, অভ্যন্তরীণ চাহিদা, সুলভ শ্রমিক ও প্রচুর স্বচ্ছ মিঠা পানি, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, সরকারি উদ্যোগ প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশ দ্রুত এ শিল্পে উন্নতি করেছে।

কর্ণফুলী কাগজকল বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ কাগজকল। এখানে স্থানীয় বাঁশ ও নরম কাঠ এবং কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয়। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪৩,৫০০ টন। খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানা সুন্দরবনের গেওয়া কাঠের ওপর ভিত্তি করে খুলনার খালিশপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিলেটের কারখানার মণ্ড গেওয়া কাঠের সঙ্গে মিশ্রিত করে নিউজপ্রিন্ট তৈরি করা হয়। গোয়ালপাড়া তাপবিদ্যুৎ এ কারখানায় ব্যবহৃত হয়। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৬৮ হাজার টন। ১৯৬৯ সালে পাকশীর উত্তরবঙ্গ কাগজকল প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের চিনিকলগুলো থেকে প্রাপ্ত আখের ছোবড়া ও ভেড়ামারার বিদ্যুৎশক্তি এটিতে ব্যবহৃত হয়। বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৬,৫০০ টন। সিলেটের নলখাগড়া, বাঁশ, সাবাই ঘাস ও পাটকাঠির ওপর নির্ভর করে সুরমা নদীর তীরে ছাতকে সিলেট মণ্ড ও কাগজকল স্থাপিত হয়েছে। হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস এখানে ব্যবহৃত হয়। বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪৫ হাজার টন। খুলনা হার্ডবোর্ড মিল সুন্দরবনের গেওয়া কাঠের ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত। এ মিলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১০ হাজার টন। এছাড়া চট্টগ্রাম ও ঢাকায় হার্ডবোর্ড কারখানা আছে। অন্যান্য ছোট-খাট কাগজকলের মধ্যে ঢাকার ঈগল বক্স কার্টন ও চট্টগ্রামের পেপার প্রডাক্টস অন্যতম। এছাড়াও ঢাকার আশেপাশে বেসরকারি উদ্যোগে আমদানিকৃত মণ্ডের ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন, বসুন্ধরা পেপার মিল, ইস্টার্ন পেপার অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড মিল।

বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া ও মিসরে নিউজপ্রিন্ট ও মণ্ড সামান্য পরিমাণে রপ্তানি করে।

সিমেন্ট শিল্প : এ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল চুনাপাথর, কাদামাটি ও জিপসামের তীব্র অভাব রয়েছে বলে এদেশে সিমেন্ট শিল্প উন্নতি করতে পারেনি। বর্তমানে দেশে ১০টি সিমেন্ট কারখানা আছে।

ছাতকের সিমেন্ট কারখানা ১৯৪০ সালে স্থাপিত হয়। ছাতকের প্রাকৃতিক গ্যাস ও ভারত থেকে আমদানিকৃত চুনাপাথর এর কাঁচামাল। এর নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। এর বার্ষিক উৎপাদন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন। চট্টগ্রামে অবস্থিত সিমেন্ট কারখানাটি আমদানিকৃত ক্লিংকারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ২০০৬-০৭ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৩৪ লক্ষ ৩৯ হাজার মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপন্ন হয় (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮ , সারণি ৩৩)। চুনাপাথরের ওপর ভিত্তি করে জয়পুরহাটের সিমেন্ট কারখানার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। এছাড়া সীতাকুণ্ড, বাগেরহাট, নারায়ণগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা ও যশোরে সিমেন্ট কারখানা রয়েছে। বাংলাদেশের উৎপাদিত সিমেন্টে প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটে না বলে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে সিমেন্ট আমদানি করতে হয়। ২০০১-০২ সালে বাংলাদেশ ০.৬ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের সিমেন্ট আমদানি করে।

সার শিল্প : বাংলাদেশে মোট ৮টি সার কারখানা আছে। তবে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দেশে প্রচুর সার আমদানি করতে হয়। ২০০৬-০৭ সালে বাংলাদেশ ৪১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সার আমদানি করে (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি ৫১)। প্রাকৃতিক গ্যাস, স্থানীয় তাপবিদ্যুৎ, ব্যাপক বাজার, সুলভ শ্রমিক, সরকারি উদ্যোগ ও বিদেশের সহায়তায় দ্রুত এ শিল্প গড়ে উঠেছে।

১৯৬১ সালে ফেঞ্চুগঞ্জে বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস এ কারখানার প্রধান কাঁচামাল। এখানে বার্ষিক প্রায় ১.১৭ লক্ষ টন ইউরিয়া এবং ১২.৫০ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। ঘোড়াশাল সার কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টন ইউরিয়া। এখানে তিতাস গ্যাস ব্যবহৃত হয়। আশুগঞ্জ জিয়া সার কারখানা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অত্যাধুনিক সার কারখানা। এর উৎপাদন ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টন ইউরিয়া। তিতাস গ্যাস এর প্রধান কাঁচামাল। চট্টগ্রামের ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩২,৫১৪ মেট্রিক টন।

অন্যান্য শিল্প : খুলনা, চট্টগ্রাম ও জামালপুরের সরিষাবাড়িতে সার কারখানা আছে।

বাংলাদেশ জাহাজ নির্মাণ শিল্পে অনেক উন্নতি করেছে। এছাড়া লোহা ও ইস্পাত শিল্প, গাড়ি সংযোজন কারখানা, মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জনসংখ্যা

জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর নবম বৃহত্তম রাষ্ট্র এবং বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তৃতীয়। বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯৩ সালে (সূত্র : জাতিসংঘ রিপোর্ট, অনুযায়ী ১৯৯৩ ইং) বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১১ কোটি ৯৩ লক্ষ। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১২.৯৩ কোটি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা প্রায় ১.৪৮ (উৎস : আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট, আগস্ট, ২০০১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)। বাংলাদেশে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশি। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৬ লক্ষ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪১ (উৎস : বিবিএস ২০০৭)

জনসংখ্যার ঘনত্ব বণ্টন

১৯৯১ সালে বাংলাদেশের জনবসতির ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৭৫৫ জন। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা ঘনত্ব প্রায় ৮৭৬ জন। বর্তমানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৫৩ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনবসতির ঘনত্ব আরো বাড়ছে। তবে সর্বত্র জনবসতির ঘনত্ব সমান নয়। মাটির উর্বরতা, ভূপ্রকৃতি, কর্মসংস্থানের সুবিধা, যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্য লক্ষ করা যায়। জনসংখ্যা বণ্টনের হার দেশের সর্বত্র সমান নয়। বাংলাদেশের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ স্থান ঢাকা অঞ্চল। এরপর পর্যায়ক্রমে নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদি, কুমিল্লা, চাঁদপুর এবং মুন্সিগঞ্জ। এ সমস্ত স্থানে জনসংখ্যার ঘনত্ব গড়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১,০০০ জনের বেশি। চট্টগ্রাম, জামালপুর, পাবনা, টাঙ্গাইল, নোয়াখালি, ফরিদপুর, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭৫০ জন। রাজশাহী, কুষ্টিয়া, বরিশাল, যশোর অঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫৫০ থেকে ৬৭৫ জন লোক বাস করে। খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়িয়া অঞ্চল এবং সুন্দরবন অঞ্চল জনবসতির অনুপযোগী। এসব অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব কম। সবচেয়ে কম জনবসতি বান্দরবান জেলায়। এ জেলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫৪ জন বাস করে। খুলনা অঞ্চলের সুন্দরবনে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ০৩ জন লোক বাস করে। বিভাগ হিসেবে ঢাকা বিভাগে ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় রাজশাহী বিভাগ, খুলনা তৃতীয় ও চট্টগ্রাম চতুর্থ।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা প্রায় ২.১৭। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৮ ভাগ গ্রামে এবং শতকরা ২২ ভাগ শহরে বাস করে। অধিকাংশ শহরই সংগ্রহ ও বিতরণের কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছে। মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৪.৮ ভাগ লোক অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৬.৬ ভাগ মুসলমান, শতকরা ১২.১ ভাগ হিন্দু, শতকরা ০.৬ ভাগ খ্রিস্টান, শতকরা ০.৩ ভাগ বৌদ্ধ এবং শতকরা ০.৪ ভাগ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। কর্মজীবীদের মধ্যে ৬৩ ভাগ কৃষিজীবী এবং বাকি ৩৭ ভাগ কলকারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরিতে নিয়োজিত (উৎস : বাংলাদেশ লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৯৬)।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি বাংলাদেশের একটি বিরাট জাতীয় সমস্যা। এতে বেকারত্ব, খাদ্যাভাব, পুষ্টিহীনতা ও দারিদ্র্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জাতীয় অর্থনীতি চরম হুমকির সম্মুখীন। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং সেই সঙ্গে জনসংখ্যা সীমিত রাখার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

যাতায়াত ব্যবস্থা

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা তিন প্রকার। যথা- (১) **স্থলপথ**, (২) **নদীপথ** ও (৩) **বিমানপথ**।

(১) স্থলপথ : বাংলাদেশের স্থল পরিবহণ ব্যবস্থা দুই প্রকার। যথা- **সড়কপথ** ও **রেলপথ**।

সড়কপথ : বাংলাদেশের সড়কপথ পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। অধিকাংশ রাস্তা স্থানীয় যোগাযোগ রক্ষার জন্য রেলপথ ও নদীপথের পরিপূরক হিসেবে নির্মিত হয়েছে।

২০০৭-০৮ সালে দেশে প্রায় ১,৯১,৮৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার মধ্যে প্রায় ৫৯,৭৩৫ কিলোমিটার পাকা সড়ক। অবশিষ্ট রাস্তা আধাপাকা বা কাঁচা। ঢাকা থেকে সড়কপথে দেশের প্রায় সর্বত্রই যাতায়াত করা যায়। (উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক, ২০০৭, সারণি ৮.০৩)।

ঢাকা থেকে কুমিল্লা, ফেনী, চট্টগ্রাম হয়ে রাঙামাটি, কক্সবাজার ও টেকনাফ পর্যন্ত; ঢাকা থেকে আরিচা-নগরবাড়ি হয়ে পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও তেতুলিয়া পর্যন্ত এবং ঢাকা থেকে আরিচা-দৌলতদিয়া হয়ে ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল যাওয়া যায়। এছাড়া, ঢাকা থেকে সিলেট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল সড়কপথে যাতায়াত করা যায়। সড়কপথে খেয়াপারাপার প্রয়োজন হয়। দেশে বর্তমানে অনেক নদীর ওপরই সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

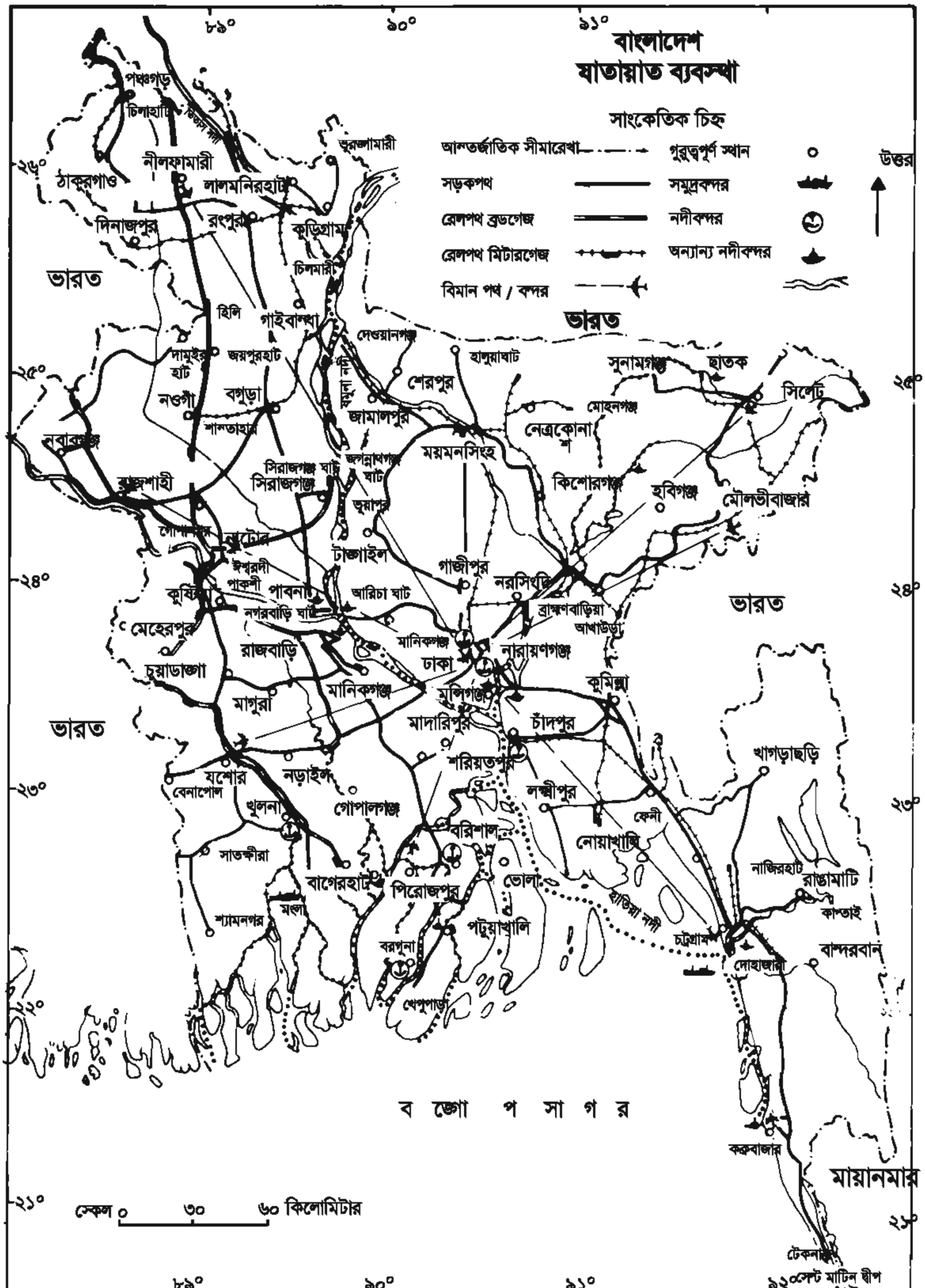
যমুনা নদীর ওপর ৪.৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৮.৫ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট যমুনা বহুমুখী সেতু দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলকে পূর্বাঞ্চলের সাথে সড়কপথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। যমুনা সেতুটি দেশের এই দুই অঞ্চলের মধ্যে যাত্রি ও মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও এ সেতুর মাধ্যমে বিদ্যুৎ, রেল, গ্যাস ও টেলিযোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

রেলপথ : ২০০৭-০৮ সালের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে ২৮৩৫.০৪ কিলোমিটার রেলপথ আছে। ১ মিটার প্রস্থ রেলপথ মিটারগেজ এবং ১.৬৮ মিটার প্রস্থ রেলপথ ব্রডগেজ নামে পরিচিত। যমুনা নদীর পূর্বে শুধু মিটারগেজ রেলপথ এবং পশ্চিমাংশে উভয় প্রকার রেলপথ আছে। ২০০৭-০৮ সালের হিসেব মতে বাংলাদেশে ৬৫৯.৩৩ কিলোমিটার ব্রডগেজ, ১৮০০ কিলোমিটার মিটারগেজ এবং ডুয়েল গেজ ৩৭৪.৮৩ কিলোমিটার রেলপথ আছে, বর্তমানে তিস্তামুখ ঘাট ও বাহাদুরাবাদ ঘাট এবং সিরাজগঞ্জ ও জগন্নাথগঞ্জের মধ্যে ২টি রেলওয়ে ফেরী চালু আছে। ২০০৬-০৭ সালের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে ৪৫৪টি সর্বমোট রেলস্টেশন আছে। তার মধ্যে ঢাকা, আখাউড়া, লাকসাম, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ভৈরববাজার, ঈশ্বরদী, পার্বতীপুর, সান্তাহার, কাউনিয়া, কুলাউড়া, দর্শনা জংশনের নাম উল্লেখযোগ্য। ঢাকার কমলাপুর দেশের বৃহত্তম রেলস্টেশন। ঢাকা থেকে দেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরে রেলযোগে যাতায়াত করা যায়। খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, বরিশাল ও পটুয়াখালি অঞ্চলে কোনো রেলপথ নেই। রেলপথে ২০০৬-০৭ সালে ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫৮ হাজার যাত্রী এবং ২৯ লক্ষ ৬৭ হাজার টন পণ্য পরিবাহিত হয় (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৬৪ এবং বিবিএস-২০০৭)।

(২) নদীপথ : নদীমাতৃক বাংলাদেশের সর্বত্র নদীপথ জালের মত ছড়িয়ে আছে। তাই নদীপথ বাংলাদেশের সুলভ পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থা। অসংখ্য নদী ও খালবিলের সমন্বয়ে গঠিত প্রায় ৮,৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ রয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৫,৪০০ কিলোমিটার সারা বছর নৌচলাচলের উপযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট ৩,০০০ কিলোমিটার শুধু বর্ষাকালে ব্যবহার করা যায়। দেশের দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌচলাচলের বেশি উপযোগী। নদীবন্দরের মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, বরিশাল ও খুলনা অন্যতম। দেশের অন্যান্য নদীবন্দরের মধ্যে ভৈরববাজার, আশুগঞ্জ, চাঁদপুর, ঝালকাঠি, আরিচা, আজমিরিগঞ্জ, মোহনগঞ্জ, মাদারিপুরের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বমোট ১২১টি লঞ্চঘাট ও ৪৩টি ফেরীঘাট আছে।

বাংলাদেশের মোট পণ্য পরিবহণের অধিকাংশ নদীপথে পরিবাহিত হয়। এছাড়া বার্ষিক ৩ কোটি যাত্রীও জলপথে বিভিন্নভাবে যাতায়াত করে। নদীপথে স্টিমার, লঞ্চ ও নৌকায় যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ করা হয়। স্বল্প ব্যয়ে পরিবহণের জন্য নদীপথের গুরুত্ব অপরিসীম।

(৩) বিমানপথ : দ্রুত যাতায়াতের জন্য বিমানই একমাত্র পরিবহণ। বাংলাদেশের বিমান সংস্থার নাম 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স'। দেশে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক এ উভয় ধরনের বিমান সার্ভিস চালু রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সার্ভিসে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, যশোর, রাজশাহী, বরিশাল, ইশ্বরদী, ঠাকুরগাঁও, সৈয়দপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করা যায়। কুর্মিটোলার জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ বিমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করে। অভ্যন্তরীণ রুটে বেসরকারি বিমান সার্ভিসও চালু রয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম আমানত শাহ ও সিলেট বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে।



চিত্র ৩.৪১ : বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থার মানচিত্র

প্রধান শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র

ঢাকা : বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি একটি ঐতিহাসিক শহর। জল, স্থল ও বিমানপথে দেশের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ শহর বন্দরের সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ আছে। এটি একটি নদীবন্দর, আন্তর্জাতিক শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এককালে এখানকার মসলিন পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। ঢাকা নগরীতে অনেক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দর্শনীয় স্থান আছে। লালবাগের কেল্লা, হোসেনী দালান, ঢাকেশ্বরী মন্দির, কার্জন হল, তারা মসজিদ, আর্মেনিয়ান গির্জা, বড় কাটরা, সংসদ ভবন প্রভৃতি ঢাকা শহরের প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন।

নারায়ণগঞ্জ : শীতলক্ষা নদীর তীরে অবস্থিত। বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর এবং উল্লেখযোগ্য শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। পাট শিল্পের জন্য বিখ্যাত বলে একে 'প্রাচ্যের ডান্ডি' বলা হত।

টঙ্গী : দেশের প্রসিদ্ধ শিল্প শহর। পাট, বস্ত্র, ওষুধ, টেলিফোন প্রভৃতি শিল্পের প্রতিষ্ঠান এখানে আছে।

সাভার : ঢাকার উপকণ্ঠে অবস্থিত এ স্থান জাতীয় স্মৃতিসৌধের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে সরকারি গবাদিপশুর খামার আছে। জাহাঙ্গীরনগর আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এখানে অবস্থিত। দেশের বৃহত্তম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ (EPZ) এলাকাটি এখানে অবস্থিত।

সিলেট : সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত বিভাগীয় শহর। চা, কমলালেবু, আনারস, বাঁশ ও বেতের দ্রব্যাদি, শীতলপাটি ইত্যাদির জন্য বিখ্যাত। এখানে হযরত শাহ জালাল (র) ও হযরত শাহ পরান (র)-এর মাজার শরীফ অবস্থিত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি মেডিকেল কলেজসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

কুমিল্লা : গোমতী নদীর তীরে জেলার সদর শহর। নানান রকম কুটির শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। শহরের উপকণ্ঠে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী অবস্থিত। এখানে একটি মেডিকেল কলেজ ও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

চাঁদপুর : মেঘনা ও পদ্মা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। দেশের একটি বিখ্যাত নদীবন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। জল ও স্থলপথে চাঁদপুর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত।

ভৈরববাজার : কিশোরগঞ্জ জেলায় মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত বিখ্যাত নদীবন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এটি একটি রেলওয়ে জংশন। ভৈরববাজার ও আশুগঞ্জের মধ্যে রেলসেতু আছে।

চট্টগ্রাম : কর্ণফুলী নদীর তীরে চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ও প্রধান সমুদ্রবন্দর। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অধিকাংশ এই বন্দরের মাধ্যমে হয়। এ কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি মেডিকেল কলেজসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

কক্সবাজার : বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি জেলা শহর, বন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থান। প্রায় ১৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত এ শহরটিকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করেছে।

বগুড়া : জেলা শহর। শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে অ্যালুমিনিয়াম ও সাবানের কারখানা আছে। বগুড়ায় রেশম শিল্প গড়ে উঠেছে। শহরের উপকণ্ঠে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী অবস্থিত। বগুড়ার অদূরে অবস্থিত মহাস্থানগড় প্রত্নতত্ত্ব ও পর্যটন কেন্দ্র। এখানে একটি মেডিকেল কলেজসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

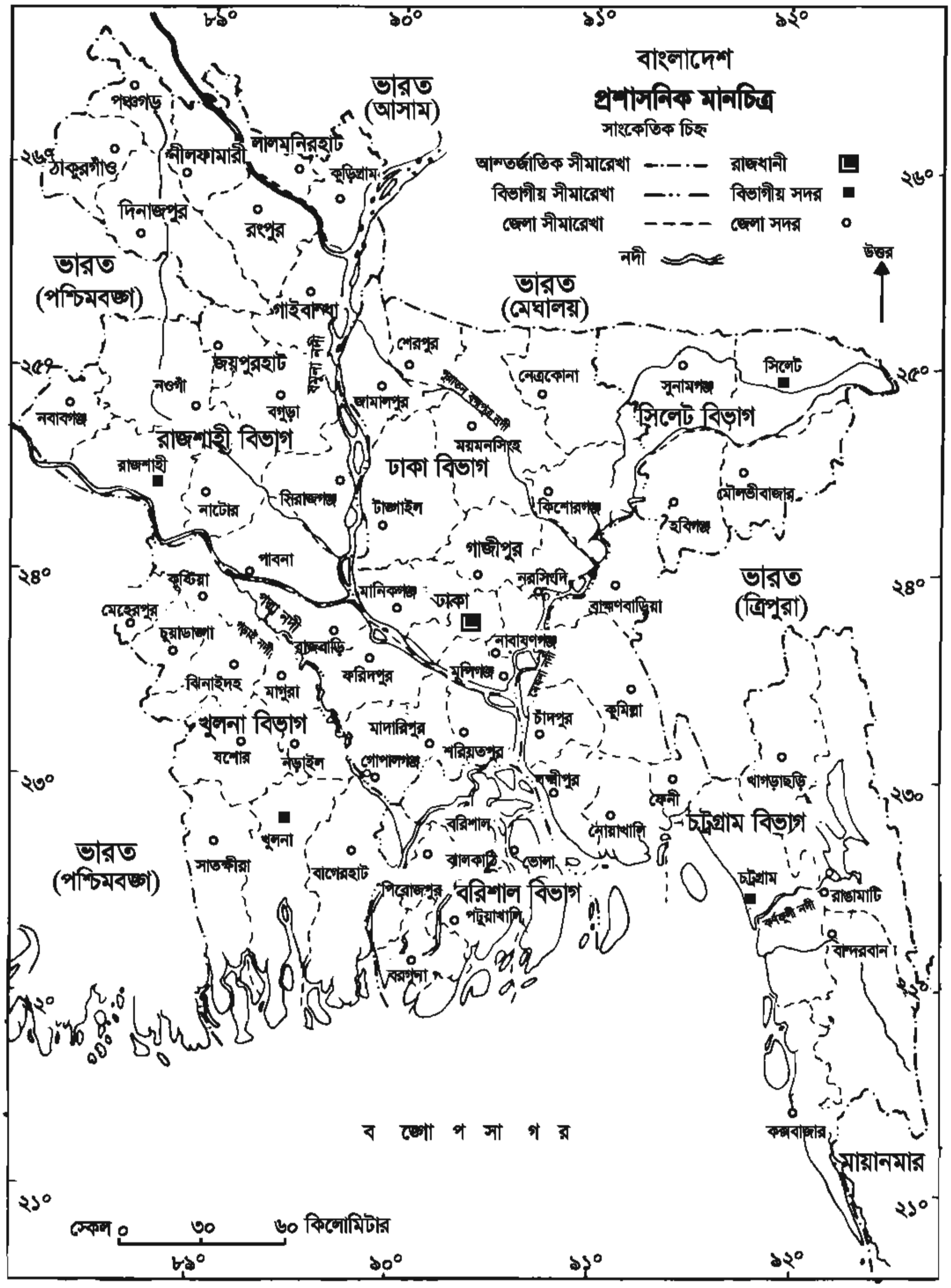
রাজশাহী : পদ্মা নদীর তীরে রাজশাহী বিভাগীয় শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এখানে বাংলাদেশের প্রধান রেশম শিল্প কেন্দ্র রয়েছে।

ময়মনসিংহ : ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত জেলা শহর। এটি একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ও রেলওয়ে জংশন। বাংলাদেশের একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এখানে অবস্থিত। একটি মেডিকেল কলেজসহ এখানে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে।

রংপুর : তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত জেলা শহর। তামাক উৎপাদনে রংপুর জেলা বাংলাদেশে শীর্ষস্থানীয়। একটি মেডিকেল কলেজসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এখানে একটি টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র আছে।

দিনাজপুর : এটি বাংলাদেশের উত্তর প্রান্তের প্রসিদ্ধ জেলা শহর। আখ উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। কাটারিভোগ চালের জন্য দিনাজপুর বিখ্যাত। এর আশেপাশে কয়েকটি চিনির কল আছে। এখানে একটি মেডিকেল কলেজ আছে।

পাবনা : জেলা শহর। তাঁত ও হোসিয়ারি শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। পাবনার অদূরে হেমায়েতপুরে বাংলাদেশের বৃহত্তম মানসিক হাসপাতাল অবস্থিত।



চিত্র ৩.৪২ : বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্র

খুলনা : ভৈরব ও রূপসা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। বিভাগীয় শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। খুলনার নিউজপ্রিন্ট কারখানা প্রসিদ্ধ। অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের পরই খুলনার স্থান। খুলনার পাশে খালিশপুর ও দৌলতপুর অন্যতম শিল্প অঞ্চল। খুলনায় একটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এখানে একটি মেডিকেল কলেজসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বরিশাল : বিভাগীয় শহর ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর এবং বাণিজ্য কেন্দ্র। বরিশালের বালাম চাল প্রসিদ্ধ। এ শহর ধান, সুপারি, নারকেল, মরিচ প্রভৃতি দ্রব্যের বাণিজ্য স্থান। এখানে একটি মেডিকেল কলেজসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

সৈয়দপুর : রেলওয়ে শহর। বাংলাদেশের বৃহৎ রেলওয়ে কারখানা এখানে অবস্থিত। সৈয়দপুরে বিমানবন্দর আছে।

মংলা : বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। খুলনার দক্ষিণে মংলা পশুর নদীর তীরে অবস্থিত। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বন্দরটি দেশের বিভিন্ন নদীবন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন কারখানায় ভেড়ামারার বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয় ?

ক. পাকশী কাগজ কলে — খ. খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানায়
গ. কর্ণফুলী কাগজ কলে — ঘ. ছাতকের মণ্ড কারখানায়

২। বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে কারণ হল–

i. অনুকূল জলবায়ু
ii. সহজশর্তে কাঁচামাল আমদানি
iii. প্রচুর সুলভ শ্রমিক

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii — খ. i ও iii
গ. ii ও iii — ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩–৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শিক্ষা সফর উপলক্ষে কর্ণফুলী কাগজ মিল পরিদর্শনে যায়। সেখানে তারা জানতে পারে কাগজ কীভাবে কোথেকে উৎপাদিত হয়, বাংলাদেশে কাগজ কলের সংখ্যা এবং কী পরিমাণ কাগজ উৎপাদিত হয়।

৩। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কাগজ কলের নাম কী?

ক. কর্ণফুলী কাগজ কল — খ. খুলনার নিউজপ্রিন্ট কারখানা
গ. বসুন্ধরা পেপার মিল — ঘ. উত্তরবঙ্গ কাগজকল

৪। কর্ণফুলী কাগজ কলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা কত ?

ক. ৪৩,৫০০ টন — খ. ৪৪,০০০ টন
গ. ৪৫,০০০ টন — ঘ. ৪৫,৫০০ টন

৫। এ কাগজ কলের কাঁচামাল–

i. স্থানীয় বাঁশ
ii. নরম কাঠ
iii. বিদ্যুৎ শক্তি

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জানুয়ারি মাসে বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বার্ষিক বনভোজনের জন্য মধুপুর পাহাড়ে যায়। গাড়ি থেকে নামার পর সীমান্ত নামের একজন ছাত্র তার সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষকের কাছে বনভূমি সম্পর্কে জানতে চায়। শিক্ষক তাকে বললেন, একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য আয়তনের কমপক্ষে ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বনভোজন চলাকালীন সময় সীমান্ত লক্ষ করল কিছু লোক গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে এবং কিছু লোক আবাদী জমির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য আগাছা পরিষ্কার করছে এবং বৃক্ষের পরিচর্যার অভাবে অনেক বৃক্ষই মারা যাচ্ছে।

ক. বনজ সম্পদ কাকে বলে?

খ. মধুপুর বনভূমির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

গ. বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন করে মধুপুরসহ বনজ সম্পদ সমৃদ্ধ তিনটি অঞ্চল চিহ্নিত কর।

ঘ. ''বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমির পরিচর্যা প্রয়োজন'' –উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ফলে তারা তাদের প্রয়োজনীয় আমিষ থেকে বঞ্চিত হয়। এদেশের মানুষকে বলা হয় ভাতে মাছে বাঙালি। বাংলাদেশের অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল এবং সমুদ্রে মাছ পাওয়া যায়। মৎস্য সম্পদ আহরণ করে তা রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

ক. আমিষের ঘাটতি পূরণের জন্য কী প্রয়োজন?

খ. বাংলাদেশের মানুষকে ভাতে মাছে বাঙালি বলা হয় কেন ব্যাখ্যা কর।

গ. বাংলাদেশ কীভাবে মৎস্যের চহিদা পূরণ করতে পারে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মৎস্য সম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে কীভাবে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করা সম্ভব তা বিশ্লেষণ কর।

৩। দশম শ্রেণীর ছাত্র সাকীব স্টীমারে চড়ে ঢাকা থেকে বরিশাল যাচ্ছিল। নদীপথে যাওয়ার সময় সে পাথর বোঝাই নৌকা, জেলেদের মাছধরা নৌকা, যাত্রী পারাপারের নৌকা দেখতে পায়। সাকীব তার বাবাকে নদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাকে প্রধান প্রধান নদী, শাখানদী ও উপনদী সম্পর্কে বলেন। তিনি আরো বলেন যে, সব নদীই শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়।

ক. ঢাকা কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

খ. বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে নদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ব্যাখা কর।

গ. বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন করে 'প্রধান প্রধান নদীবন্দরগুলো' চিহ্নিত কর।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নদীর প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

৪। আরিফ ঢাকা থেকে সুবর্ণ এক্সপ্রেসে চট্টগ্রাম যাওয়ার সময় রেলপথ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কে সে একটা প্রতিবেদন পড়েছিল। এদেশে ১৯৯৭–৯৮ সালে সড়ক পথের পরিমাণ ছিল ১,৮৩,০০৭ কি.মি., ২০০১–২০০২ সালে রেলপথের পরিমাণ ছিল ২৭৬৮.৩৭ কি.মি.। তবে সব জায়গায় রেলপথ নাই। নাব্য জলপথের পরিমাণ ৮৪০০ কি.মি.।

ক, কয়টি জেলায় রেলপথ নাই?

খ. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারী ১টি পথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

গ. মানচিত্র অংকন করে দেশের প্রধান রেলপথ নির্দেশ কর।

ঘ. আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সড়কপথ, রেলপথ ও নদীপথের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তা ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

পৌরনীতির বিষয়বস্তু

মানুষ সামাজিক জীব। বিভিন্ন সামাজিক চাহিদা সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মানুষ চায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সুবিধা, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পরিবেশ, যেখানে সে সুখী, সুন্দর জীবনযাপন করতে পারবে। এ জন্য যেসব জ্ঞানের প্রয়োজন, পৌরনীতি তা আলোচনা করে থাকে। পৌরনীতি হচ্ছে নাগরিকতাবিষয়ক বিজ্ঞান।

পৌরনীতির সংজ্ঞা

পৌরনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান। ইংরেজি Civics শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পৌরনীতি। Civics শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Civis (নাগরিক) এবং Civitas (নগর-রাষ্ট্র) হতে এসেছে। শব্দগত অর্থে পৌরনীতি নগর-রাষ্ট্র ও নাগরিকের আচরণ ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

আধুনিক রাষ্ট্র আয়তনে বিশাল। জনসংখ্যা অনেক বেশি। আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য অনেক বেড়ে গেছে। যে শাস্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে তার আচরণ এবং রাষ্ট্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ই.এম. হোয়াইট (E.M. White) পৌরনীতির একটি উত্তম সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "নাগরিকতার সঙ্গে জড়িত সকল প্রশ্ন নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে।" তিনি আরো বলেন, "পৌরনীতি হল জ্ঞানের সেই মূল্যবান শাখা যা নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবতার সঙ্গে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।"

পৌরনীতির বিষয়বস্তু

পৌরনীতির বিষয়বস্তু অতি বিস্তৃত। নাগরিকতার সঙ্গে জড়িত সকল বিষয়ই পৌরনীতি আলোচনা করে। নিচে পৌরনীতির আওতাধীন বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হল।

১। **নাগরিকতা সম্পর্কিত জ্ঞান :** নাগরিকতার অর্থ ও প্রকৃতি, নাগরিকতা লাভের পদ্ধতি, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি নিয়ে পৌরনীতিতে আলোচনা করা হয়।

২। **বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান :** নাগরিক বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে নানা রকম কাজ করে থাকে। তাই পরিবার, সমাজ ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান পৌরনীতির আলোচনার বিষয়বস্তু।

৩। **রাজনৈতিক মতবাদ ও রাজনৈতিক সংগঠন :** পৌরনীতি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ ও ধারণা নিয়ে আলোচনা করে। যেমন- রাষ্ট্রের উৎপত্তি, আইন, স্বাধীনতা ইত্যাদি। আবার রাজনৈতিক সংগঠন, যেমন- সরকারের শ্রেণীবিভাগ, সরকারের অঙ্গ ইত্যাদিও পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

৪। **নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রূপ :** বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও এগুলোর সদস্য হিসেবে নাগরিকের আচরণ ও কার্যাবলি পৌরনীতি আলোচনা করে থাকে। এটা হচ্ছে নাগরিকতার স্থানীয় রূপ। নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের অধিকার ভোগ করা, কর্তব্য পালন করা এবং আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলা হয়। এটা নাগরিকতার জাতীয় রূপ।

নাগরিকতা এখন আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে। কোনো রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন নয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা ইত্যাদি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ক্রমাগত নিকটতর করছে। গড়ে উঠেছে জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থা। রাষ্ট্রের নাগরিকরা এসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেরও সদস্য। তাই স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃতি ও এদের সদস্য হিসেবে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা পৌরনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৫। **নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ :** নাগরিকতার অতীত ও বর্তমান পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়। নাগরিকতা সম্পর্কিত ভাবধারার বিকাশ, রাষ্ট্রের ধারণা, তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদি নিয়েও পৌরনীতি আলোচনা করে। পৌরনীতি অতীত ও বর্তমানের আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোকপাত করে।

পৌরনীতি একটি গতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান। সে জন্য এর পরিধি ক্রমশ ব্যাপকতর হচ্ছে। নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত কার্যাবলি, তার সাথে সম্পর্কযুক্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক ধারণা নিয়ে আলোচনা, অর্থাৎ নাগরিক জীবনের সামগ্রিক পর্যালোচনা করাই পৌরনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। "নাগরিকতার সঙ্গে জড়িত সকল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে যে শাস্ত্র তাকে পৌরনীতি বলে" –এ উক্তিটি কার?

ক. উড্রো উইলসন　　খ. ই.এম.হোয়াইট
গ. এরিস্টটল　　ঘ. হল্যান্ড

২। **পৌরনীতিকে গতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান বলা হল কেন?**

ক. এরিস্টটল এর জনক বলে
খ. রাজনৈতিক সংগঠন নিয়ে আলোচনা করে বলে
গ. নাগরিকত্বের পূর্ণ ধারণা প্রদান করে বলে
ঘ. পরিধি সময়ের সাথে ক্রমশ ব্যাপক হচ্ছে বলে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নিশিতা পত্রিকা পড়ে সুষ্ঠু রাজনীতি ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য নাগরিক সচেতনতা ও অধিকার প্রসঙ্গে বলেন, প্রত্যেকেরই এর জন্য বিষয়গত গভীর জ্ঞান ও অনুশীলন প্রয়োজন।

৩। **নিশিতা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য কোন গভীর জ্ঞান অনুশীলনের কথা বলেন ?**

ক. নৃবিজ্ঞান　　খ. সমাজবিজ্ঞান
গ. পৌরবিজ্ঞান　　ঘ. ধনবিজ্ঞান

৪। **নিশিতা কেন উক্ত বিষয়ের জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক মনে করেন?**

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি জানার জন্য
(খ) জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য
(গ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্পর্কে জানার জন্য
(ঘ) মানুষের আচরণিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের জন্য।

সৃজনশীল প্রশ্ন

আলোর মামা গতকাল লন্ডন থেকে ঢাকা এসেছে। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটাধিকার আদায়ের কাজ করছে। এ বিষয়ে সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে পরিবারের সবার সাথে আলাপ করছিলেন। আলোচনার মাঝে আলো তার মামাকে প্রশ্ন করে কীভাবে তিনি লন্ডনের নাগরিক হয়ে বাংলাদেশে ভোট দেবেন? নাগরিকত্ব, ভোটাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আলোর কৌতূহল মেটাতে মামা তাকে পৌরনীতি পড়ার পরামর্শ দেন।

ক. পৌরনীতি কী?
খ. নাগরিকতার আন্তর্জাতিক রূপ ব্যাখ্যা কর।
গ. আলোর মামা কীরূপ নাগরিকত্বের অধিকারী তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. আলোর মামার পরামর্শের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাগরিকত্ব

মানুষ সমাজবন্ধভাবে বাস করে। রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিক ও নাগরিকতা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সুনাগরিকের ওপর রাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভরশীল। সেজন্য নাগরিকতা সম্পর্কে জানা সকলের জন্য অপরিহার্য।

নাগরিকের সংজ্ঞা

শব্দগত অর্থে নাগরিক বলতে নগরের অধিবাসী বুঝায়। প্রাচীন গ্রিসে নগর নিয়ে গঠিত নগর-রাষ্ট্রের শাসনকার্যে যারা সরাসরি জড়িত থাকত, তাদের নাগরিক বলা হত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা গ্রিক মনীষী এরিস্টটল বলেন, "সেই ব্যক্তিই নাগরিক যে নগর-রাষ্ট্রের শাসনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।" নাগরিকতা সম্পর্কে বর্তমান ধারণা এবং প্রাচীন গ্রিক ধারণায় অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।

আধুনিক রাষ্ট্রের বিপুল জনসমষ্টি সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাই বর্তমানকালে নাগরিকের সংজ্ঞাও বদলে গেছে। অধ্যাপক গেটেলের (Gettel) মতে, "নাগরিক হচ্ছে রাজনৈতিক সমাজের সে-সব সদস্য, যারা উক্ত সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকেন এবং সে সমাজ থেকে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা লাভের অধিকারী হন।" অধ্যাপক লাস্কি (Laski) নাগরিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, তাকেই নাগরিক বলা হয়।" এ সব মতের প্রেক্ষিতে নাগরিকের সংজ্ঞা আমরা এভাবে দিতে পারি– যে রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করে এবং রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে তাকেই নাগরিক বলা হয়। আর নাগরিকেরা রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রের দেওয়া যে মর্যাদা লাভ করে পৌরনীতিতে তাকেই নাগরিকত্ব বা নাগরিকতা বলে। অর্থাৎ নাগরিকতা হচ্ছে নাগরিকের গুণ বা মর্যাদা।

নাগরিকতা লাভের পদ্ধতি

নাগরিকতা দুইভাবে লাভ করা যায় :

১। জন্মসূত্রে ও ২। অনুমোদনসূত্রে।

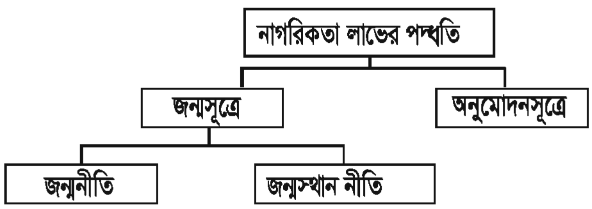
জন্মসূত্রে নাগরিক : যারা জন্মের অধিকারে নাগরিকত্ব অর্জন করে, তাদের জন্মসূত্রে নাগরিক বলা হয়।

অনুমোদনসূত্রে নাগরিক : যারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের নানাবিধ শর্ত পূরণ করে আইনের সাহায্যে অনুমোদন নিয়ে নাগরিকত্ব অর্জন করে তাদের অনুমোদনসূত্রে নাগরিক বলা হয়।

জন্মসূত্রে নাগরিক : জন্মসূত্রে নাগরিকতা লাভের আবার দুইটি পদ্ধতি আছে। একটি জন্মনীতি, অপরটি জন্মস্থান নীতি।

জন্মনীতি : জন্মনীতি অনুসারে সাধারণত পিতা-মাতা যে দেশের নাগরিক, সন্তানও সে দেশের নাগরিক হবে। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতার নাগরিকতা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারণ করে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান এই নীতি অনুসরণ করে।

জন্মস্থান নীতি : এ নীতি অনুসারে যে যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে, সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলে গণ্য হয়। এ ক্ষেত্রে জন্মের স্থান নাগরিকতা নির্ধারণ করে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি –এ উভয় নীতি অনুসরণ করে। নিচের ছকে নাগরিকতা লাভের পদ্ধতি দেখানো হল :



সাধারণভাবে জন্মসূত্রে নাগরিক ও অনুমোদনসূত্রে নাগরিকের মধ্যে কোনো বৈষম্য করা হয়না। আবার কোনো কোনো দেশে কিছু বৈষম্য দেখা যায়। যেমন- আমেরিকাতে অনুমোদনসূত্রে নাগরিক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে পারে না।

নাগরিকের অধিকার

পৌরবিজ্ঞানে অধিকার শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে মানুষ যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তাই অধিকার। এ অধিকার ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। রাষ্ট্রের দেওয়া এবং রাষ্ট্রের সাহায্যে ও সমর্থনে নাগরিক এ অধিকার ভোগ করে। অন্য কেউ নাগরিকের অধিকার হস্তক্ষেপ করলে রাষ্ট্র শাস্তির ব্যবস্থা করে।

তাহলে বলা যায়, অধিকার বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এমন কতগুলো মৌলিক সুযোগ সুবিধা বুঝায়, যার সাহায্যে ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সমাজের কল্যাণ সাধন করে। অধিকার কি, এ প্রসঙ্গে লাস্কির একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে, "অধিকার হচ্ছে সমাজ জীবনের সে সকল সুযোগ সুবিধা যা ব্যতীত ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে সক্ষম হয় না।"

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ

অধিকার সাধারণত দুইভাগে বিভক্ত, যথা- নৈতিক অধিকার ও আইনগত অধিকার।

আইনগত অধিকারকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়- সামাজিক অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার। নিচে একটি ছকের সাহায্যে অধিকারের শ্রেণীবিভাগ দেখানো হল :

- অধিকার
  - নৈতিক অধিকার
  - আইনগত অধিকার
    - সামাজিক অধিকার
    - রাজনৈতিক অধিকার

নৈতিক অধিকার : সমাজের নীতি এবং বিবেকবোধ থেকে সৃষ্ট যে সকল অধিকার, সেগুলোকে নৈতিক অধিকার বলে। যেমন- ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাওয়ার অধিকার। নৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে সমাজ ঘৃণা করে বা সমালোচনা করে। কিন্তু এর জন্য কোনো শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা নেই।

আইনগত অধিকার : রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট ও অনুমোদিত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলে। যেমন- সম্পত্তির অধিকার। এই অধিকার ভঙ্গ হলে অধিকার ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া হয়। পৌরবিজ্ঞান আইনগত অধিকার নিয়েই আলোচনা করে। সামাজিক অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার হচ্ছে আইনগত অধিকার।

সামাজিক অধিকার

যেসব অধিকার সমাজে নাগরিকদের সভ্য ও উন্নত জীবনযাপনে সাহায্য করে এবং যেসব অধিকার জীবন রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য সে-সব অধিকারকে সামাজিক অধিকার বলে। এসব অধিকার ব্যক্তির মানবিক গুণ বিকাশে সাহায্য করে। এগুলো ব্যতীত মানুষের পক্ষে উন্নত সামাজিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। নিচে প্রধান প্রধান সামাজিক অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হল।

১. **জীবন রক্ষার অধিকার :** জীবনের নিরাপত্তার অধিকারই হচ্ছে জীবন রক্ষার অধিকার। জীবনের নিরাপত্তা না থাকলে অন্য সব অধিকারই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

২. **সম্পত্তির অধিকার :** সম্পত্তির অধিকার বলতে সম্পত্তি অর্জন করা, সম্পত্তি ভোগ করা ও হস্তান্তর করার সুযোগ সুবিধা বুঝায়। এই অধিকারের অর্থ হচ্ছে– একজনের সম্পত্তি অন্যে জবরদখল বা লুট করতে পারবে না। সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

৩. **চলাফেরার অধিকার :** সকল নাগরিকের রাষ্ট্রের সর্বত্র অবাধে চলাফেরার অধিকার আছে। এটা মৌলিক অধিকার। তবে যদি ব্যক্তির অবাধ চলাফেরা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতির কারণ হয় তবে রাষ্ট্র সে অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে।

৪. **মত প্রকাশের অধিকার :** এটি হচ্ছে নাগরিকদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এ অধিকার ব্যতীত গণতন্ত্র কার্যকরী হতে পারে না। তবে মতামত রাষ্ট্রবিরোধী বা ধ্বংসাত্মক হলে রাষ্ট্র সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মতামত যুক্তিসঙ্গত, গঠনমূলক ও জনকল্যাণমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. **সংবাদপত্রের স্বাধীনতা :** এ হচ্ছে সংবাদপত্রে বা বইপুস্তকে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার অধিকার। সংবাদপত্রে সরকারের কাজকর্মের ও সরকারি নীতির সমালোচনা করা হয়। সরকারি ও বিরোধী দলের বক্তব্য সংবাদপত্রে থাকে। এগুলো জনমত গঠনের জন্য প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্রবিরোধী অশ্লীল মতামত প্রকাশ এ অধিকারের অন্তর্গত নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এটি খুব প্রয়োজনীয় অধিকার।

৬. **সভাসমিতির অধিকার :** রাষ্ট্র নাগরিকের বিভিন্ন বিষয়ে সভাসমিতি করার অধিকার স্বীকার করে। কিন্তু সভা, সমিতি, সংঘ যদি সৃজনধর্মী ও মহৎ উদ্দেশ্যে না হয়ে রাষ্ট্রবিরোধী বা বেআইনী কাজের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে রাষ্ট্র সে সমস্ত তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৭. **চুক্তি করার অধিকার :** ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পত্তির হস্তান্তর ও অন্য যেকোনো বিষয়ে নাগরিকের চুক্তি করার অধিকার আছে। চুক্তির শর্ত সংরক্ষণে রাষ্ট্র নাগরিককে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র বা জনকল্যাণবিরোধী কোনো চুক্তি করা যাবে না।

৮. **পরিবার গঠনের অধিকার :** এ অধিকার সভ্য সমাজ জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। পরিবারকে কেন্দ্র করেই সমাজ জীবন গড়ে ওঠে। বিয়ে করার, সন্তান-সন্ততি লাভ ও তাদের লালন পালনের অধিকার এবং উত্তরাধিকার– এ অধিকারের অন্তর্গত।

৯. **ধর্মের অধিকার :** এ অধিকারের ফলে নাগরিকগণ নিজেদের ইচ্ছেমতো ধর্ম গ্রহণ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন ও ধর্ম প্রচার করতে পারে। অন্য কেউ তাতে বাধা দিতে পারে না।

১০. **কর্মের অধিকার :** নাগরিক তার যোগ্যতা অনুযায়ী যেকোনো আইনসঙ্গত পেশা গ্রহণ করতে পারে।

১১. **আইনের চোখে সমানাধিকার :** এই অধিকারের অর্থ হচ্ছে আইন সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। ধনী-গরিব, সবল-দুর্বল সকলকে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে হবে। অপরাধ করলে সবাইকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

১২. **স্বাস্থ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার :** জীবন বিকাশের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। চিকিৎসা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রকে জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা দিতে হয়। শিক্ষা উপযুক্ত ও সচেতন নাগরিক গড়ে তোলে। প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষার অধিকার আছে। সকলকে লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য।

১৩. **সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার :** নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নাগরিকের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা রক্ষা করার জন্য এ অধিকার অপরিহার্য।

রাজনৈতিক অধিকার

যেসব সুযোগ সুবিধা দ্বারা ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে, সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। নিচে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো রাজনৈতিক অধিকার আলোচনা করা হল–

১। **বসবাসের অধিকার :** রাষ্ট্রের যেকোনো অংশে অন্য কোনো নাগরিকের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে এবং রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি না করে বসবাস করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে।

২। **নির্বাচনের অধিকার :** এ অধিকার দুই রকম। একটি নির্বাচন করার অধিকার ও অন্যটি নির্বাচিত হওয়ার অধিকার।

৩। **বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তার অধিকার :** যখন কোনো নাগরিক বিদেশে থাকে তখন যদি সে কোনো অসুবিধা বা বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন সে তার নিজ রাষ্ট্রের নিকট নিরাপত্তা দাবি করতে পারে।

৪। **সরকারি চাকরি লাভের অধিকার :** প্রত্যেক নাগরিকের নিজ গুণ ও যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি চাকরি পাওয়ার অধিকার আছে। এর মাধ্যমেই নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে।

৫। **আবেদন করার অধিকার :** প্রত্যেক নাগরিক তার অভাব অভিযোগ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে পারে। আবেদন পেশ করে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করা নাগরিকের অধিকার।

৬। **ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার অধিকার :** ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকের এই অধিকার অন্যায়ভাবে খর্ব করা হলে নাগরিকরা তা প্রতিরোধ করতে পারে।

নাগরিকের কর্তব্য

নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের দেওয়া অধিকার ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদের কতগুলো দায়িত্বও পালন করতে হয়। পৌরনীতিতে নাগরিকের এসব দায়িত্বকে কর্তব্য বলে। নাগরিকদের প্রধান কর্তব্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হল।

১। **আনুগত্য :** রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব। আনুগত্য বলতে অনুগত থাকা বুঝায়। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যেকোনো রকম ত্যাগ স্বীকারেও নাগরিক সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। দেশ রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদান করা ও যুদ্ধ করা নাগরিকদের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সর্বদা সরকারি কর্মচারীদের সাহায্য করাও আনুগত্য প্রকাশের অন্তর্গত।

২। **আইন মান্য করা :** রাষ্ট্রের প্রচলিত সমস্ত আইন মেনে চলা নাগরিকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে সকলকে আইন মেনে চলতে হবে।

৩। **সততার সাথে ভোটদান :** ভোটদানের মাধ্যমে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। সততার সাথে উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নির্বাচন না করলে সরকার দুর্বল ও অযোগ্য হবে।

৪। **কর প্রদান করা :** রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা, প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। নিয়মিত কর প্রদান না করলে অর্থাভাবে সরকারের কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়।

৫। **সরকারি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা :** এটি আরেকটি উল্লেখযোগ্য কর্তব্য। নাগরিকদের সুষ্ঠু কাজকর্মের ওপর সরকারের সফলতা, উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে।

৬। **সন্তানদের শিক্ষাদান :** সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক করে গড়ে তোলা আরেক নাগরিক কর্তব্য। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে সুশিক্ষিত নাগরিকের ওপর।

সুনাগরিকের গুণাবলি

কোনো রাষ্ট্রের উন্নতি, অগ্রগতি ও সাফল্য তার নাগরিকের ওপর নির্ভর করে। সেজন্য নাগরিকদের সুনাগরিক হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লর্ড ব্রাইসের (Lord Bryce) মতে সুনাগরিকের গুণাবলি হল তিনটি– (১) বুদ্ধিমত্তা (২) আত্মসংযম ও (৩) বিবেক। লর্ড ব্রাইস বর্ণিত এই তিনটি গুণ একজন সুনাগরিকের জন্য অপরিহার্য।

১। **বুদ্ধিমত্তা :** রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন, সরকার গঠন, শাসনকার্য পরিচালনা, সরকারি নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি কার্য সম্পাদনের জন্য নাগরিকের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। বুদ্ধিমান নাগরিক রাষ্ট্রে সুবিধা ভোগের সাথে সাথে নিজের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়। বুদ্ধি বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে সকল নাগরিককে সচেতন করে তোলা সরকারের দায়িত্ব।

২। **আত্মসংযম :** সরকারের প্রতি অনুগত থেকে এবং আইন মেনে চলে একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র গঠনের জন্য নাগরিকদের আত্মসংযম একটি অপরিহার্য গুণ। আত্মসংযম রাষ্ট্রের বৃহত্তম স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে নাগরিকদের অনুপ্রাণিত করে। এছাড়া পরমতসহিষ্ণু হওয়ার জন্যও আত্মসংযম প্রয়োজন। সমস্ত লোভ-লালসার উর্ধ্বে থেকে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত থাকার জন্যও আত্মসংযম একান্ত আবশ্যক। সুতরাং আত্মসংযম নাগরিকের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ।

৩। **বিবেক :** রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য এবং রাষ্ট্রের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের জন্য নাগরিককে বিবেকবান হতে হবে। বিবেকবান ব্যক্তি আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতন থাকে। রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী হয়। ন্যায় অন্যায় বিচার-বিবেকের ওপর নির্ভরশীল। সমাজসেবা, দেশপ্রেম বিবেকবোধ থেকেই সৃষ্টি হয়।

সুতরাং বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম, বিবেক ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট নাগরিকদেরই সুনাগরিক বলা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের এক দম্পতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে। তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। এক্ষেত্রে সন্তানটির নাগরিকত্ব নির্ধারণে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে?

ক. জন্মনীতি খ. জন্মসূত্রে
গ. জন্মস্থান সূত্রে ঘ. অনুমোদনসূত্রে

২। নূর ফকির ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এটি কোন অধিকারের পর্যায়ভুক্ত?

ক. সামাজিক খ. অর্থনৈতিক
গ. আইনগত ঘ. নৈতিক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আরমিন রাউজানে জন্মগ্রহণ করে সেখানেই জায়গা কিনে স্থায়ী ও স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করেন। তার ক্রয়কৃত জায়গায় একটি কারখানা স্থাপন করে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং তিনি সরকারের নির্ধারিত করও পরিশোধ করেন। এলাকায় তাকে সবাই সজ্জন লোক হিসেবে শ্রদ্ধা করে।

৩। আরমিন অধিকার ভোগের পাশাপাশি যে কর্তব্য পালন করছে তা হচ্ছে–

i. তার এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখে
ii. তার ওপর আরোপিত কর সঠিকভাবে পরিশোধ করে
iii. আইনের অনুশাসনগুলো মেনে চলে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৪। একজন নাগরিক হিসেবে আরমিন যে গুণের পরিচয় দিচ্ছেন–

i. কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ
ii. নির্ধারিত কর পরিশোধের মাধ্যমে দায়িত্ববোধের পরিচয়
iii. আইন–শৃঙ্খলা অনুসরণের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৫। আরমিনের রাউজানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা কোন ধরনের অধিকার?

ক. নৈতিক অধিকার খ. আইনগত অধিকার

গ. সামাজিক অধিকার ঘ. রাজনৈতিক অধিকার

সৃজনশীল প্রশ্ন

জোয়ান সেন্ডি অস্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন । পরবর্তীকালে ২০০৩ সালে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবে চাকরি নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। ঘটানাচক্রে বাংলাদেশকে ভালো লাগায় এ দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন। একদিন তিনি অফিস থেকে বনানীস্থ বাসার উদ্দেশ্যে আসার পথে মতিঝিলে ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন। ছিনতাইকারী তাকে অস্ত্রের মুখে নগদ ৫০০ ডলার, একটি ঘড়ি এবং একটি স্বর্ণের চেইন নিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি এ ব্যাপারে আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে সরাসরি বাসায় চলে যান।

ক. জোয়ান সেন্ডি কোন সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক?

খ. একজন নাগরিকের আইনগত অধিকার ব্যাখ্যা কর।

গ. আইনগত অধিকার লাভে জোয়ান সেন্ডির কী করা উচিত ছিল?

ঘ. ''একজন নাগরিকের আইনগত অধিকার ভোগ করার জন্য কিছু নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে হয়'' –উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্র

সামাজিক জীব হিসেবে অন্যের সঙ্গে একত্রে মিলেমিশে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। প্রকৃতি ও প্রয়োজনের তাগিদে সে সমাজ গঠন করে। আর সমাজের মানুষ বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। রাষ্ট্র এক বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান। সামাজিক সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হচ্ছে রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটলের (Aristotle) মতে, "কতিপয় পরিবার ও গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনই রাষ্ট্র।" প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (Woodraw Wilson) বলেন, "রাষ্ট্র হল আইনানুসারে সংগঠিত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের একটি জনসমষ্টি।" রাষ্ট্রের সবচেয়ে সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়েছেন অধ্যাপক গার্নার (Garner)। তাঁর মতে, "রাষ্ট্র হল বহুসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এমন এক জনসমাজ, যা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত এবং যাদের একটি সুসংগঠিত সরকার আছে, যার প্রতি ঐ জনসমাজ স্বভাবতই অনুগত।"

রাষ্ট্রের এসব সংজ্ঞা থেকে বলা যায়, যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সংগঠিত সরকার, জনসমষ্টি এবং সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে, তাকে রাষ্ট্র বলে।

রাষ্ট্রের উপাদান

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করলেই রাষ্ট্র কি কি উপাদান নিয়ে গঠিত তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের উপাদান চারটি। যথা- ১. জনসমষ্টি ২. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ৩. সরকার ও ৪. সার্বভৌমত্ব। এই চার উপাদানের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়।

১. **জনসমষ্টি :** জনসমষ্টি রাষ্ট্রের প্রথম উপাদান। রাষ্ট্র গঠনে জনসমষ্টি অপরিহার্য। জনহীন অরণ্যে বা জনশূন্য মরুভূমিতে কখনই রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। রাষ্ট্রে জনসংখ্যা কত হবে তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। স্যানম্যারিনো রাষ্ট্রে বার হাজারের কিছু বেশি, আর চীন প্রায় নব্বই কোটি জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত।

২. **নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড :** এটি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় উপাদান। যে জনসমষ্টি রাষ্ট্র গঠন করবে তাদেরকে অবশ্যই একটি ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে। এই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড যেকোনো আয়তনের হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ– গণচীনের আয়তন ৪৪.৫ লক্ষ বর্গমাইল আর হল্যান্ডের (নেদারল্যান্ডস) আয়তন মাত্র সাড়ে বার হাজার বর্গ মাইল।

৩. **সরকার :** রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান সরকার। সরকার ব্যতীত জনসমষ্টি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বাস করে রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকেন তাদের নিয়ে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সমন্বয়ে সরকার গঠিত হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্নরূপ সরকার থাকে।

৪. **সার্বভৌমত্ব :** রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য উপাদান সার্বভৌমত্ব বা সার্বভৌমিকতা। এটা হল রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা। এই ক্ষমতার জন্য জনসমষ্টি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। সার্বভৌম ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুটি দিক আছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর কর্তৃত্ব করে। বাহ্যিক সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকে। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও একটি দেশ সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকলে রাষ্ট্র বলে গণ্য হবে না। এই চারটি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত। যেকোনো একটি উপাদান অনুপস্থিত থাকলে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

রাষ্ট্রের কার্যাবলি

উইলোবী, গেটেল, গিলক্রাইস্ট প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ১. অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলি. ২. কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলি।

অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলি

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ও জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত কাজ সম্পাদন করে, সেগুলোকে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ বলে। দেশ রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও পরিচালনা এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব।

নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সেজন্য অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের আরেক অপরিহার্য কাজ।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক জোট গঠন, অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক, বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি হচ্ছে পররাষ্ট্রবিষয়ক অপরিহার্য কাজ। এছাড়া, রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করে সুষ্ঠুভাবে শাসনকাজ পরিচালনা করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব।

জনকল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলি : নাগরিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য, তাদের নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে বিকশিত করার জন্য আধুনিক রাষ্ট্র নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে। উন্নয়নে সহায়ক এ সমস্ত কাজ রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা গৌণ কাজ। রাষ্ট্র যত উন্নত হয় তার ঐচ্ছিক কার্যাবলিও তত বেশি হয়।

রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজগুলো নিম্নরূপ :

১. **শিক্ষা বিস্তার :** রাষ্ট্রের উন্নতি শিক্ষিত নাগরিকের ওপর নির্ভরশীল। তাই শিক্ষা বিস্তারের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা রাষ্ট্রের কাজ।

২. **জনস্বাস্থ্য রক্ষা :** সুস্থ, সবল জনগণ রাষ্ট্রের সম্পদ। সেজন্য জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি এ দায়িত্বের অন্তর্গত।

৩. **শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন :** শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির ওপর রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান, ব্যাংক, বীমা পরিচালনা ইত্যাদি রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্য।

৪. **যোগাযোগ রক্ষা :** দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যোগাযোগের ব্যবস্থা করে। সুষ্ঠু পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য অপরিহার্য।

৫. **শ্রমিক কল্যাণ :** শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য তাদের কাজের সময় ও মজুরি নির্ধারণ, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা, শ্রমআদালত স্থাপন ইত্যাদি ব্যবস্থা রাষ্ট্র গ্রহণ করে থাকে।

৬. **সামাজিক নিরাপত্তা :** কল্যাণরাষ্ট্রসমূহ দুঃস্থদের জন্য সাহায্য, বৃদ্ধ বয়স ভাতা, বেকার ভাতা ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।

৭. **জনহিতকর কার্যাবলি :** রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রতিরোধ, খেলার মাঠ, পার্ক, উদ্যান প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে।

জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। ফলে ঐচ্ছিক কাজের পরিধিও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়েছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের মধ্যে সরকার অন্যতম কারণ এর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। সরকারকে মানবদেহের কোন অংশের সাথে তুলনা করা যায় ?

ক. মস্তিষ্ক খ. চোখ
গ. কান ঘ. হাত

২। সিডরে দক্ষিণাঞ্চলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ সমস্যা মোকাবেলায় সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এটি রাষ্ট্রের –

i. অপরিহার্য কাজ
ii. গৌণ কাজ
iii. ঐচ্ছিক কাজ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

৩। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির ওপর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা হচ্ছে–

i. শ্রম আদালত স্থাপন করা
ii. ব্যাংক, বীমা পরিচালনা করা
iii. বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৪। বাংলাদেশের সাথে বার্মার কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। এটি রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজ?

ক. অপরিহার্য খ. স্বাভাবিক
গ. গৌণ কাজ ঘ. আবশ্যিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

মাসুদ দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ১৬ বছরের একজন বালক। মাসুদ তার পিতার কাছে শুনেছে যে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের একটি মূল উপাদান। মাসুদ স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট সুবিধাদি ভোগ করে থাকে। মাসুদ বিশ্বাস করে যে, জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

ক. রাষ্ট্র কী?
খ. সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র গঠনের একটি অন্যতম উপাদান ব্যাখ্যা কর।
গ. মাসুদ কীভাবে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ''জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য'' –উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

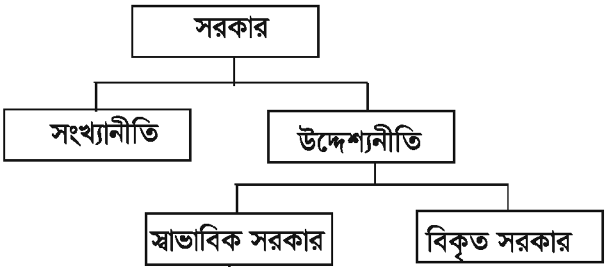
সরকার

সরকার রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সরকার ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। সরকার পরিবর্তনশীল এবং অনেক রকমের হতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের সরকার দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে চিন্তাবিদগণ বিভিন্নভাবে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

সরকারের শ্রেণীবিভাগ

প্রাচীন শ্রেণীবিভাগ : প্রাচীনকালে এরিস্টটল (Aristotle) সংখ্যানীতি ও উদ্দেশ্যনীতি–এ দুটি নীতির ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেন। উদ্দেশ্য নীতির ভিত্তিতে সরকার দুইরকম– স্বাভাবিক সরকার ও বিকৃত সরকার। জনসাধারণের কল্যাণে কাজ করলে সেটা স্বাভাবিক সরকার, আর ব্যক্তিস্বার্থ বা দলীয় স্বার্থে কাজ করলে সেটা বিকৃত সরকার। এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগটি নিচে ছকের সাহায্যে দেখানো হল।

এরিস্টটল অভিজাততন্ত্রকে সর্বাপেক্ষা উত্তম কিন্তু পলিটিকে সর্বাধিক বাস্তবধর্মী সরকার বলে উল্লেখ করেছেন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ শ্রেণীবিভাগ অচল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।



সরকারের চরম ক্ষমতা যখন একজনের হাতে ন্যস্ত	রাজতন্ত্র (Monarchy)	স্বৈরাচারতন্ত্র (Tyranny)
সরকারের চরম ক্ষমতা যখন কয়েক জনের হাতে ন্যস্ত	অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)	ধনিকতন্ত্র (Oligarchy)
সরকারের চরম ক্ষমতা যখন বহু জনের হাতে ন্যস্ত	পলিটি (Polity)	গণতন্ত্র (Democracy)

ছক : এরিস্টটল প্রদত্ত সরকারের শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক শ্রেণীবিভাগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্টেস্কু, বুশো, ব্লুন্টসলী, ম্যারিয়ট ও লিকক সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তন্মধ্যে লিককের শ্রেণীবিভাগকে সর্বোত্তম বলে গ্রহণ করা হয়। লিকক (Leacock) নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগ করেছেন–

১। সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থানের ভিত্তিতে সরকারের একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র– এ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

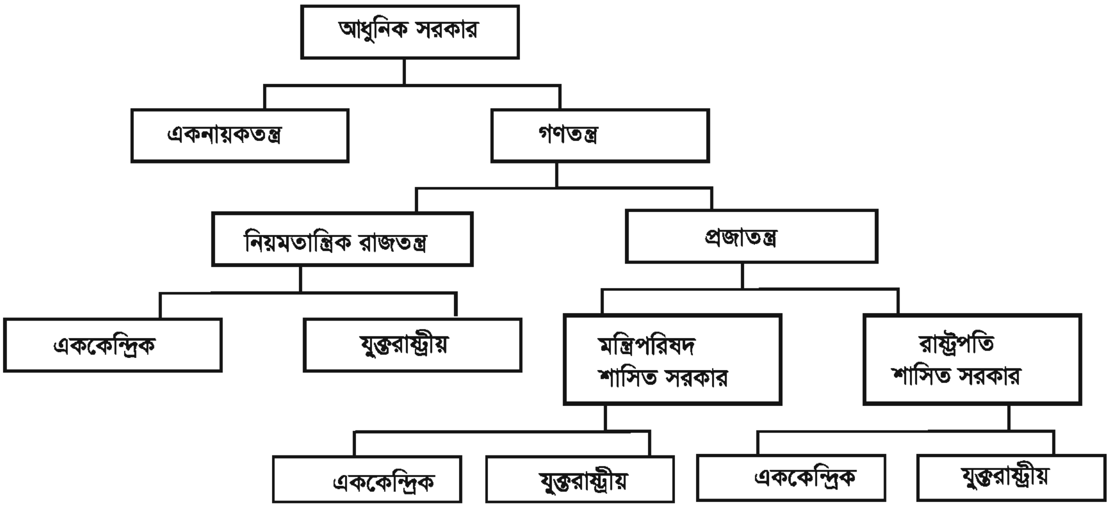
২। রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা লাভের পদ্ধতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও (খ) প্রজাতন্ত্র।

৩। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়– ১. মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও ২. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।

৪। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে সরকারকে এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয়– এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

নিচে একটি ছকের সাহায্যে লিককের শ্রেণীবিভাগ দেখানো হল :



ছক : লিকক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণীবিন্যাস

একনায়কতন্ত্র

যে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকে একনায়কতন্ত্র বলে। একনায়ক বা ডিকটেটর রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা এবং চরম ক্ষমতার উৎস, ক্ষমতা প্রয়োগে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। এক দেশ, এক জাতি, এক নেতা– একনায়কতন্ত্রের আদর্শ। একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা একনায়কের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। তার কাজকর্মের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তার আদেশ নির্দেশ সকলে মেনে চলতে বাধ্য। একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একনায়কের নেতৃত্বে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। একনায়ক তার পছন্দমত উপদেষ্টাদের নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। উপদেষ্টামণ্ডলী তাঁর কাছে দায়ী থাকে ও তার সন্তুষ্টির ওপর তাদের কার্যকাল নির্ভর করে। জার্মানির হিটলার, স্পেনের ফ্রাংকো ও ইটালির মুসোলিনী একনায়ক ছিলেন।

একনায়কতন্ত্রের গুণ : এ শাসন ব্যবস্থায় একনায়ক দ্রুত যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না এবং আলোচনাও করতে হয় না বলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। একনায়ক তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অনুন্নত দেশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি তার নেতৃত্বে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করতে পারেন। একনায়কের অধীনে সারা দেশ একইভাবে পরিচালিত হয় বলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় হয়।

একনায়কতন্ত্রের ত্রুটি : একনায়কতন্ত্রে জনসাধারণের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এটা ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী। এই শাসন ব্যবস্থার কোনো সমালোচনা কেউ করতে পারে না। বিভিন্ন মতবাদ জোরপূর্বক দমন করা হয়। একনায়কতন্ত্র উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সামরিক শক্তির বিকাশ ঘটায়। এ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকতা বিরোধী। একনায়ককে কোনো জবাবদিহি করতে হয় না বলে তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন। এটা একটা স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা। এই শাসন ব্যবস্থা অস্থায়ী। কারণ, একনায়কের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ শাসনও শেষ হয়ে যায়।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র বলতে জনসাধারণের শাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়। যে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে গণতন্ত্র বলে। গণতন্ত্র অর্থ জনসাধারণের শাসন। জনগণ যখন সকল ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং

রাষ্ট্র পরিচালনার ভার জনগণের ওপর ন্যস্ত থাকে তখন তাকে গণতন্ত্র বলা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে এমন এক ব্যবস্থা বলেছেন। কাজেই বলা যায় যে সরকার বা শাসন ব্যবস্থায় জনমতের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় এবং জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তাই গণতন্ত্র। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) গণতন্ত্রের একটি জনপ্রিয় সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, "জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত এবং জনসাধারণের সরকারই হল গণতন্ত্র।" (Democracy is a government of the People, by the People and for the People.)
গণতন্ত্র দুই রকম- (১) প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র (২) পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র : যে শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, তাকে প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বলে। প্রাচীন গ্রিসে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রের সকল নাগরিক কোনো বিশেষ স্থানে জমায়েত হয়ে আইন প্রণয়ন, কর ধার্য, কর্মচারী নিয়োগ, বিচারকার্য পরিচালনা ইত্যাদি কাজ করত। নগররাষ্ট্রের আয়তন ক্ষুদ্র ও জনসংখ্যা কম ছিল বলে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা সম্ভব ছিল। সেখানে নির্বাচন বা প্রতিনিধি প্রেরণের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে জনবহুল বৃহৎ রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্যকরী করা সম্ভব নয়। তবে এখনো সুইজারল্যান্ডের কয়েকটি ক্যান্টনে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আংশিকভাবে প্রচলিত আছে।

পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র : যে শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ না করে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে, তাকে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বলে। পরোক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই জনসাধারণের নিকট তাদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী থাকেন। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রচলিত। গণতন্ত্র বলতে বর্তমানে পরোক্ষ গণতন্ত্রকেই বোঝায়। গণতন্ত্র আধুনিককালের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা।

গণতন্ত্রের গুণ : গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের স্বার্থের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়। প্রতিনিধিগণ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং তাদের নিকট জবাবদিহি করতে হয় বলে জনকল্যাণের দিকে তাদের লক্ষ থাকে।
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল নাগরিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। সাম্যের এ নীতি গণতন্ত্রেরই বৈশিষ্ট্য। গণতন্ত্র নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে। ফলে গণতন্ত্রে নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকে।

এ শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সক্রিয়ভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে বলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি হয়। দেশের সমস্যা অনুধাবনে উন্নয়নমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে, সরকারি নীতি ও কার্যকলাপের আলোচনা সমালোচনার ভেতর দিয়ে নাগরিকদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়।

গণতন্ত্রের ত্রুটি : অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রকে অযোগ্যের শাসন বলে ধারণা করেন। জনসাধারণ যখন তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে তখন অনেক সময়ই তারা অশিক্ষা ও অজ্ঞতার জন্য যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিকে নির্বাচন করে না। ফলে উপযুক্ত সরকার গঠন করা বা উন্নত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয় না।

গণতন্ত্রের গুণের চেয়ে সংখ্যাধিক্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনেক ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত সংখ্যাধিক্যের কারণে গৃহীত হয়। কখনো কখনো অজ্ঞ ও সাধারণ লোক দ্বারা গণতন্ত্র পরিচালিত হয় বলে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারে এই শাসন ব্যবস্থা সহায়ক হয় না।

এই শাসন ব্যবস্থায় অনেক রাজনৈতিক দল থাকে। দলগুলোর গঠন, প্রচারকার্য ও নির্বাচন অনেক ব্যয়বহুল ব্যাপার। যেহেতু গণতন্ত্র জনসাধারণের মতামতের পরিবর্তনশীলতার ওপর নির্ভরশীল তাই এ সরকার ব্যবস্থা স্থিতিশীল নয়। নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।
এ সরকারে স্থিতিশীলতার অভাব বলে রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় না। সরকার পরিবর্তনের সাথে নীতির পরিবর্তন হয় বলে সরকারি নীতির সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। আলাপ-আলোচনা করে মতামত গ্রহণ করতে হয় বলে জরুরি প্রয়োজনে এ সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়।

তবে অনেক দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও গণতন্ত্র পৃথিবীর বহুল প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন ও নামেমাত্র প্রধান থাকেন তাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলে। এ ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা থাকে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। যেমন- গ্রেট ব্রিটেন।

প্রজাতন্ত্র

যে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করেন, তাকে প্রজাতন্ত্র বলে। যেমন- বাংলাদেশ।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার

যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক শাসনকার্য পরিচালিত হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে, তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় সরকার বলা হয়। এই ধরনের শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত শাসক হল মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিপরিষদের শীর্ষে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। ব্রিটেন, ভারত, কানাডা, প্রভৃতি দেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীকে আইনসভার সদস্য হতে হয়। মন্ত্রিসভা সমষ্টিগতভাবে এর নীতি ও কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। যতদিন আইনসভা মন্ত্রিপরিষদকে সমর্থন করে ততদিন মন্ত্রিপরিষদ ক্ষমতায় থাকে। আইনসভার অধিকাংশ সদস্য অনাস্থা জ্ঞাপন করলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের গুণ : এ সরকারের প্রধান গুণ হল দায়িত্বশীলতা। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যরা মন্ত্রিসভা গঠন করে বলে আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা খুবই কম। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হয় বলে উৎকৃষ্ট আইন ও উন্নত ধরনের শাসন এই ব্যবস্থায় সম্ভবপর।

এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী থাকে বলে মন্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। স্বেচ্ছাচারী হলে অনাস্থা জ্ঞাপক ভোটে মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকেন।

এ শাসন ব্যবস্থা সহজে পরিবর্তনীয়। মন্ত্রিসভা অযোগ্য হলে আইনসভা তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। আবার আইনসভা জনমতের বিরোধী হলে রাষ্ট্রপ্রধান মন্ত্রিসভার পরামর্শে আইনসভা ভেঙে দিতে পারেন। এই ব্যবস্থায় এভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা যায়।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের ত্রুটি : এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় দলীয় স্বেচ্ছাচারিতা দেখা যায়। যেকোনো সময় সরকার বা মন্ত্রিসভার পতন ঘটতে পারে বলে এর স্থায়িত্ব কম। এজন্য শাসননীতির ও দীর্ঘমেয়াদী কাজে ধারাবাহিকতা এতে রক্ষিত হতে পারে না। জরুরি অবস্থায় ঐকমত্যের ভেতর দিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সম্ভব হয় না।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

যে শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না, তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসক। তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান। এই শাসন ব্যবস্থায় সকল শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য নন। জনগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট কালের জন্য তিনি নির্বাচিত হন। আইনসভা তার বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট পাস করতে পারে না। গুরুতর অভিযোগ থাকলে তাকে পদচ্যুত করা যায়। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন এবং মন্ত্রীগণ তার নিকট দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতি যে কোনো সময় মন্ত্রীদের পদচ্যুত করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণ : এই ধরনের শাসন ব্যবস্থায় সরকার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়। অভিশংসন ব্যতীত রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায় না। ফলে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। সংকটকালের জন্য এ ব্যবস্থা উপযোগী। কারো পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য নন বলে জরুরি সময়ে রাষ্ট্রপতি নিজে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি থাকায় শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পরস্পর নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের ত্রুটি : রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক। তিনি ও তার মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী নন বলে স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন শাসকে পরিণত হতে পারেন। অনেক সময় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। আইনসভার ওপর রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণ না থাকায় তিনি প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করাতে পারেন না। ফলে শাসনকার্যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

এককেন্দ্রিক সরকার

এককেন্দ্রিক সরকার বলতে সেই সরকারকে বুঝায় যেখানে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকে। স্থানীয় সরকারসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে ক্ষমতা লাভ করে। বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক সরকার বিদ্যমান। এই ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের কোনো ব্যবস্থা করে না। এককেন্দ্রিক সরকারে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রকে কতগুলো অংশে বিভক্ত করা হয় এবং অংশগুলোতে স্থানীয় সরকার গঠন করা হয়। স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা সংকুচিত বা প্রসারিত করা কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ : এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় একটি সরকারের তত্ত্বাবধানে সারা দেশে একই আইন, নীতি ও শাসন পদ্ধতি প্রচলিত থাকে। এতে শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় হয় ও জাতীয় ঐক্য অধিক সংহত হয়। সর্বময় ক্ষমতা একটি সরকারের হাতে থাকায় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে অধিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এককেন্দ্রিক সরকারের ত্রুটি : স্থানীয় সরকারের কোনো স্বাধীন ক্ষমতা না থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের মর্জির ওপর নির্ভর করে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার অনেক সময়ই স্থানীয় অভাব অভিযোগ সম্পর্কে সঠিকভাবে না জেনে কেন্দ্রীয়ভাবে যে সমস্ত আইন ও নীতি প্রণয়ন করে, সেগুলো স্থানীয় চাহিদার উপযোগী হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যে শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়, তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। যেমন- ভারত ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় দুই প্রকারের সরকার থাকে– একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যটি অঙ্গরাজ্যের সরকার বা প্রাদেশিক সরকার। রাষ্ট্রের সংবিধান কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেয়। রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের এবং স্থানীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো অঙ্গরাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারের নিকট অর্পণ করা হয়। আঞ্চলিক শাসন ব্যাপারে অঙ্গরাজ্যগুলো স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। এই শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ : অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বতন্ত্র সত্তা অক্ষুণ্ন রেখে জাতীয় ঐক্যের সমন্বয় সাধনের এক রাজনৈতিক কৌশল হল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্য সরকারের মধ্যে সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা বণ্টন করা হয় বলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের ভার অনেক লাঘব হয়ে যায়। এতে উভয় সরকারের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, সুনির্দিষ্ট করে ক্ষমতার বণ্টন থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যের কাজে হস্তক্ষেপ করে স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ত্রুটি : এ ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলো নিজেদের প্রয়োজন ও সুবিধামত আইন প্রণয়ন করে বলে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে আইন ও শাসন বিষয়ে সামঞ্জস্য থাকে না। একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণীত হয়। উভয় প্রকার সরকারের মধ্যে অধিকার সম্পর্কিত বিরোধও প্রায়ই দেখা যায়। ক্ষমতা উভয় সরকারের মধ্যে বিভাজিত হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়ে।

সরকারের অঙ্গসমূহ ও তাদের কার্যাবলি

রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য সরকারকে নানাবিধ কাজ করতে হয়। কাজগুলোকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়– আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা। এই কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য সরকারের তিনটি অঙ্গ বা বিভাগ রয়েছে। এই বিভাগ তিনটি হচ্ছে– ১. আইনসভা ২. শাসন বিভাগ ও ৩. বিচার বিভাগ।

আইনসভা : আইনসভা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এই বিভাগ রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার জন্য এবং বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য আইন প্রণয়ন করে।

সকল রাষ্ট্রেরই আইনসভা আছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনসভা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম কংগ্রেস, ব্রিটেনের পার্লামেন্ট ও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ। আইনসভা এক-কক্ষবিশিষ্ট বা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হয়ে থাকে। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় উচ্চ পরিষদ ও নিম্ন পরিষদ থাকে। গ্রেট ব্রিটেনের আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। বাংলাদেশের আইনসভা এক-কক্ষবিশিষ্ট।

আইনসভার কার্যাবলি

সরকারের কাজ সম্পাদনের জন্য যে তিনটি বিভাগ আছে আইনসভা তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আইনসভা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক একটি সংস্থা। আইনসভার প্রধান কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা। এই উদ্দেশ্যে আইনসভা নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে, আবার কখনো পুরনো আইনকে সংশোধন বা পরিবর্তন করে, আবার বাতিলও করে। আইনসভার সদস্যরা জনপ্রতিনিধি। তারা জনমতের প্রেক্ষিতেই আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করেন। কোনো কোনো দেশে আইনসভা সংবিধান রচনা করে। সংবিধান সংশোধনের কাজ প্রায় সকল দেশের আইনসভাই করে থাকে।

আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইনসভার বিরোধী দলীয় সদস্যরা সরকারের নীতি ও কাজের সমালোচনা করে দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকে। অর্থসংক্রান্ত কিছু কাজও আইনসভা করে থাকে। কর ধার্য করা, বাজেট পাস করা ইত্যাদি আইনসভার কাজ।

শাসন বিভাগ

রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার দায়দায়িত্ব বহন করে যে বিভাগ তাকে শাসন বিভাগ বলে। শাসন বিভাগ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন কার্যকর করে। ব্যাপক অর্থে, রাষ্ট্রপ্রধান থেকে গ্রাম্য চৌকিদার পর্যন্ত সকল কর্মচারীদের নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত। সংকীর্ণ অর্থে রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত বিভাগকে শাসন বিভাগ বলে।

শাসন বিভাগের কার্যাবলি

আইন কার্যকরী করা ও দেশের প্রশাসন পরিচালনা করা শাসন বিভাগের প্রধান কাজ। শাসন বিভাগ অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি প্রদান ইত্যাদি কাজ করে থাকে। পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা, অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি কূটনৈতিক কাজও শাসন বিভাগ করে থাকে।

শাসন বিভাগ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে। শাসন বিভাগের কিছু আইন বিভাগীয় দায়িত্বও আছে। শাসন বিভাগ আইনসভা আহ্বান করতে, স্থগিত রাখতে ও ভেঙে দিতে পারে। এছাড়া, শাসন বিভাগ প্রস্তাবিত বিল অনুমোদন, অর্ডিন্যান্স জারি ইত্যাদিও করে থাকে। বিচার বিভাগের বিচারপতিদের নিয়োগ ও দণ্ডিত ব্যক্তিদের ক্ষমা করা শাসন বিভাগের বিচার সংক্রান্ত কাজ।

বিচার বিভাগ

সরকারের যে বিভাগ আইন অনুসারে বিচার কাজ করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, জনগণের অধিকার রক্ষা করার জন্য বিচার বিভাগের প্রয়োজন। বিচার বিভাগ রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেয়। রাষ্ট্রের সকল আদালত নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত হয়।

বিচার বিভাগের কার্যাবলি

দেশের প্রচলিত আইন প্রয়োগ করে বিচারকার্য পরিচালনা করা বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। এ বিভাগের আরেক কাজ হচ্ছে আইনের ব্যাখ্যা দেওয়া ও দণ্ডবিধান করা। প্রচলিত আইনের সাহায্যে যখন বিচারকার্য পরিচালনা করা যায় না তখন বিচারকগণ ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি ও ন্যায়নীতি অনুসারে বিচার করে থাকেন।

কোনো কোনো সময় শাসন বিভাগ সুপ্রীম কোর্টের নিকট হতে আইনবিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করে। অনেক সময় আদালত আদেশ অথবা নিষেধাজ্ঞা জারি করে জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

এছাড়া, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ, মৃত ব্যক্তির বিচারাধীন সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, লাইসেন্স প্রদান ইত্যাদি কাজও বিচার বিভাগ করে থাকে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য ও রাষ্ট্রের সুশাসনের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা একান্ত অপরিহার্য।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থানের ভিত্তিতে সরকারকে ভাগ করা হয়েছে–

ক. দুই ভাগে   খ. তিন ভাগে
গ. চার ভাগে   ঘ. পাঁচ ভাগে

২। বিচার বিভাগের কাজ হচ্ছে–

i. আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বিচারকর্ম পরিচালনা করা
ii. আইনের ব্যাখ্যা দেয়া এবং দণ্ড বিধান করা
iii. মৃত ব্যক্তির বিচারাধীন সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii
গ. iii   ঘ. ii ও iii

৩। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সক্রিয়ভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে বলে তাদের মধ্যে–

ক. রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে   খ. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়
গ. ধর্মীয় চেতনার বৃদ্ধি ঘটে   ঘ. সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটে

৪। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সমস্যাদির ভিত্তিতে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে এক ধরনের–

i. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র
ii. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার
iii. মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii
গ. iii   ঘ. i, ii ও iii

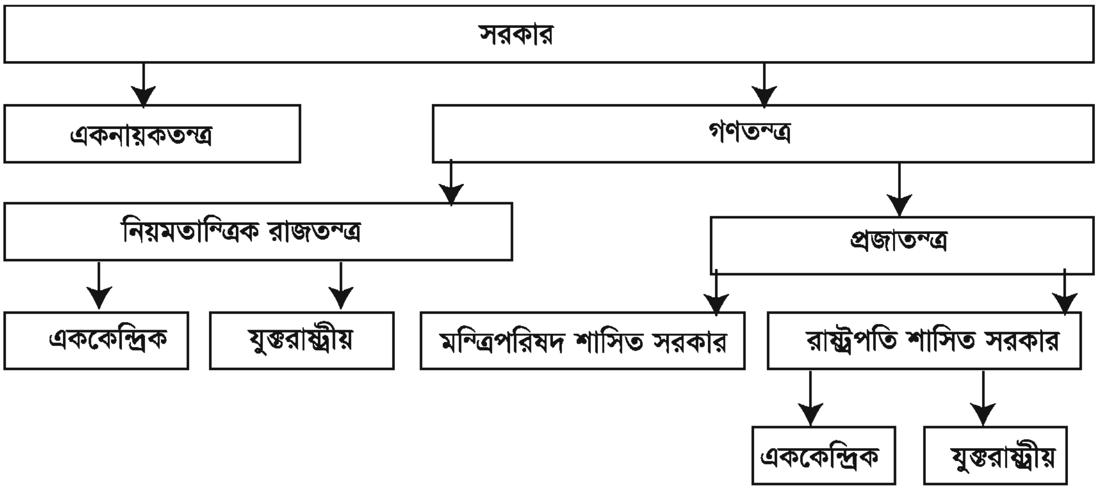
৫। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা একক বা যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। এর কারণ–

i. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা
ii. প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা দায়িত্বশীল
iii. রাজনৈতিক ঐতিহ্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. i ও ii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন



ক. সরকার কাকে বলে?

খ. একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ১টি সুবিধা ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরের ছকের আলোকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উন্নয়নে তুমি কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে যথার্থ বলে মনে কর–ব্যাখ্যা কর।

ঘ. এরিস্টটলের সরকার ব্যবস্থা ও লিককের সরকার ব্যবস্থার মধ্যে কোন ব্যবস্থাকে তুমি উত্তম বলে মনে কর, তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নির্বাচন

প্রাচীনকালে এক একটি নগর নিয়ে গড়ে উঠত এক একটি নগর-রাষ্ট্র। নগর-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাজে সকল নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করত। কিন্তু বর্তমানকালে রাষ্ট্র অনেক বড়। বিশাল তার জনসমষ্টি। তাই বর্তমানে নাগরিকদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। ফলে শুরু হয় প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা। প্রতিনিধি বলতে তাকে বুঝায় যে ভোটের মাধ্যমে নাগরিকদের সম্মতি লাভ করে তাদের পক্ষ হতে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। এভাবে সৃষ্টি হয় নির্বাচন ও নির্বাচকমণ্ডলী।

নির্বাচন কী ?

রাষ্ট্রের ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকগণ যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাকে নির্বাচন বলে। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের আইন অনুসারে প্রতিনিধি নির্বাচন করে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে তাকে নির্বাচক বা ভোটার বলে। সকল নির্বাচককে সমষ্টিগতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলে। প্রায় সকল রাষ্ট্রেই গোপন ব্যালটের সাহায্যে ভোট দেওয়া হয়। প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সমগ্র রাষ্ট্রকে কতগুলো নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হয়। একটি এলাকা হতে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। নির্বাচন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত হয়। সুতরাং নির্বাচন হল সেই বিশেষ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে প্রতিনিধি বাছাই করে। বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন ইত্যাদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনের উদ্দেশ্য

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের শাসন কায়েম করার জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি বাছাই করাই নির্বাচনের উদ্দেশ্য।

নির্বাচন পদ্ধতি

সাধারণত দুই প্রকার নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যথা- প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পরোক্ষ নির্বাচন।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন : প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলতে সেই পদ্ধতিকে বুঝায় যেখানে ভোটারগণ সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে তাদের ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। যেমন- বাংলাদেশের সংসদ সদস্য নির্বাচন।

পরোক্ষ নির্বাচন : পরোক্ষ নির্বাচন বলতে সেই পদ্ধতিকে বুঝায় যেখানে নির্বাচকমণ্ডলী সরাসরি প্রতিনিধি নির্বাচন করে একটি মধ্যবর্তী সংস্থা নির্বাচন করে। সেই নির্বাচনী সংস্থা চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।

নির্বাচনের গুরুত্ব

নাগরিকরা নির্বাচনের মাধ্যমে যেসব প্রতিনিধি নির্বাচন করে তারা দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। প্রতিনিধিরা দক্ষ ও যোগ্য হলে শাসন ব্যবস্থাও উন্নত ও উৎকৃষ্ট হয়। সুতরাং নির্বাচকমণ্ডলীকে যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হয়। সে জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যতীত প্রতিনিধি বাছাই করা সম্ভব নয়। নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতা হয়। ভুইফোঁড় ও অবাঞ্ছিত দলের বিলুপ্তি ঘটে। রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে। নির্বাচন রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে একদিকে জনমত প্রকাশ পায় অন্যদিকে দেশের সকল স্তরে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে নির্বাচনের ভূমিকা অপরিসীম।

নির্বাচন জনগণ ও সরকারের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। জনসাধারণের অভাব অভিযোগ জানা ও সেগুলো দূরীকরণে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যথাযথ ভূমিকা পালনের সুযোগ পায়। বস্তুত নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয় এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব ও বাস্তবতার নিরীখে রাজনৈতিক বিশ্বাস বা কৃষ্টির অধিকারী হয়।

নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নির্বাচকমণ্ডলী ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। যখন কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী ভোটদানের অধিকার লাভ করেন তখন তাকে ভোটার বা নির্বাচক বলে। আর সকল ভোটার বা নির্বাচকদের সমষ্টিকে নির্বাচকমণ্ডলী বলে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী নির্বাচকমণ্ডলী যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করার মাধ্যমে সরকার গঠন করে। নির্বাচকমণ্ডলী জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার ও বিরোধী দল জনমতের ভিত্তিতে নিজেদের কার্যক্রম নির্ধারণ করে । যে বা যারা জনমতের বিরোধিতা করে তার বা তাদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা থাকে না। ফলে পরবর্তী নির্বাচনে তার বা তাদের পতন ঘটে। তাছাড়া নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভুঁইফোড় রাজনৈতিক দলের অবসান ঘটে। এতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়।

সরকার যখন কোনো আইন প্রণয়ন করে তখন জনমতের দিকে খেয়াল রেখেই আইন প্রণয়নে অগ্রসর হয়। এভাবে নির্বাচকমণ্ডলী আইন তৈরিতে প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানের কোনো মৌলিক অংশ সংশোধন করতে হলে জনমত যাচাইয়ের জন্য গণভোটের ব্যবস্থা করতে হয়।

নির্বাচকমণ্ডলী সরকার, বিরোধীদল ও জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিসেবে ভূমিকা পালন করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাদের নিজ নিজ এলাকার অভাব অভিযোগ মূলত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা অবহিত হন। সে সব অভাব অভিযোগের প্রতিকার সাধনের মাধ্যমে জনগণের সাথে তাঁদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সুতরাং আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচকমণ্ডলী নিষ্ক্রিয় দর্শক নয় বরং সক্রিয় নিয়ন্ত্রক শক্তি। নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব লক্ষ করে অধ্যাপক গেটেল যথার্থই বলেছেন, ''নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের শক্তিশালী ও স্বতন্ত্র চতুর্থ শাখা।''

নির্বাচন প্রক্রিয়া

নির্বাচন প্রক্রিয়া বলতে নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো বোঝায়। ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা, রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র বিতরণ, গ্রহণ ও বাছাই, প্রতীক বণ্টন ও ব্যালট পেপার মুদ্রণ, ভোট কেন্দ্র নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা, প্রিজাইডিং, সহকারী প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগ, ব্যালট বাক্স বিতরণ, ভোট গ্রহণ, ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নির্বাচন প্রক্রিয়ার অংশ। অর্থাৎ নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমকে নির্বাচন প্রক্রিয়া বলে। এই প্রক্রিয়া বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দ্বারা বা এর তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে সম্পন্ন হয়। নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা স্থাপিত একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান।

নির্বাচন আচরণবিধি

স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত। কিন্তু নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত এবং আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের একার পক্ষে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে হবে। এজন্য নির্বাচন কমিশন ১৯৭২ এর গণপ্রতিনিধি আদেশ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী আচরণবিধি তৈরি করেছে।

নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচনী আচরণবিধিগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল–

১। **নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি-বিধান পালন :** নির্বাচন সংক্রান্ত আইনকানুন ও বিধি-বিধান অবশ্যই সকলকে মেনে চলতে হবে।

২। **কোনো প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি নিষিদ্ধ :** নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোনো প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনী এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করা যাবে না। অথবা নির্বাচনী এলাকার কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার করা যাবে না।

৩। **নির্বাচনী প্রচারণা**

(ক) রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে। প্রতিপক্ষের কোনো সভা, শোভাযাত্রা ও প্রচারে বাধা প্রদান করা যাবে না।

(খ) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো সড়ক বা মহাসড়কে জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে জনসভা করা যাবে না।

(গ) সভা বা মিছিল অনুষ্ঠানে বাধাদানকারীর বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে নিজেরা কিছু করতে পারবে না।

(ঘ) রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্র, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সহায়তা কিংবা রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করতে পারবে না।

(ঙ) কোনো প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের ওপর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল লাগানো যাবে না।

(চ) রাস্তা বা সড়কের ওপর নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না।

(ছ) সরকারি ডাকবাংলো, সার্কিট হাউস, রেস্টহাউস ও সরকারি কার্যালয়কে কোনো দল বা প্রার্থীর স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

(জ) নির্বাচন উপলক্ষে কোনো নাগরিকের জমি, বাড়ি-ঘর বা কোনো স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করা যাবে না। কারো শান্তি ভঙ্গ করা চলবে না।

(ঝ) সকল প্রকার দেয়াল লিখন হতে সকলকে বিরত থাকতে হবে।

(ঞ) ভোট কেন্দ্রের নির্ধারিত সীমার মধ্যে মোটর সাইকেল, যান্ত্রিক যানবাহন নিয়ে যাওয়া যাবে না এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করা চলবে না।

(ট) প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মকর্তা নির্বাচনী কার্যক্রমে অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

(ঠ) ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এরূপ কোনো বক্তব্য বা কোনো ধরনের তিক্ত এবং উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রদান করা যাবে না।

৪। **নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা :** অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করা যাবে না।

৫। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার :** কেবলমাত্র নির্বাচনী কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট এবং ভোটারগণ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন। কোনো প্রার্থীর বা দলের কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রে ঘোরাফেরা করতে পারবে না।

৬। **নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম :** এসব বিধিমালার যেকোনো বিধানের লঙ্ঘন নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে। কোনো প্রার্থী বা দল এর প্রতিকার পেতে চাইলে নির্বাচনী এলাকাধীন ইলেকটোরাল ইনকোয়ারি কমিটি বা নির্বাচন কমিশন বরাবর আবেদন করতে হবে।

নির্বাচনী অপরাধ ও দণ্ড

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী নির্বাচনী অপরাধ ও তার দণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। সংক্ষেপে অপরাধ ও দণ্ডগুলো নিম্নরূপ–

(ক) নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয় এর বিধান লঙ্ঘন করা, (খ) ঘুষ গ্রহণ করা, (গ) জাল ভোট দেওয়া বা ছদ্মনামে ভোট দেওয়া,

(ঘ) নির্বাচনে অসংগত প্রভাব খাটানো, জোর-জবরদস্তি করে ভোট আদায় করা বা ভোটদানে বাধা সৃষ্টি করা, (ঙ) প্রার্থী বা তার আত্মীয় স্বজনের চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা বলা, (চ) কোন প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে মিথ্যা বলা (ছ) কোন প্রার্থী প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বলা, (জ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি কারণে কোন প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দান সম্পর্কে বলা, (ঝ) কোন প্রার্থীকে সমর্থন বা বিরোধিতার জন্য যানবাহন দিয়ে সাহায্য করা, (ঞ) ভোট কেন্দ্রের কোন ভোটারকে ভোট না দিয়ে চলে যেতে বাধ্য করা, (ট) বেআইনী আচরণ করা এবং (ঠ) সভা ও মিছিলের ওপর আরোপিত নিষেধ লঙ্ঘন এগুলো দুর্নীতিমূলক অপরাধ। তাছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স নষ্ট করা, কেন্দ্র হতে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া, ব্যালট পেপার বা সরকারি মার্কা জাল করা, ভোট কেন্দ্র দখল করা এবং ভোট প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাও গুরুতর নির্বাচনী অপরাধ।

উপরিউক্ত যেকোনো অপরাধের জন্য জরিমানাসহ ক্ষেত্রবিশেষ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর এবং কমপক্ষে ২ (দুই) বছর সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে। এসকল নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধের জন্য উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করা যায়। তবে নির্বাচন কমিশনের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কর্তৃক কতিপয় নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে না।

নির্বাচনী মহড়া (শ্রেণীকক্ষে মহড়ার জন্য)

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বিষয় শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে নির্বাচনে ভোট প্রদান সংক্রান্ত ব্যবহারিক জ্ঞান দান ও দক্ষতা অর্জন করানোর উদ্দেশ্যে শ্রেণীকক্ষে মহড়ার ব্যবস্থা করবেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নির্বাচনের কাজ নিচের কোনটি ?

ক. প্রতিনিধি বাছাই করা
খ. সরকারের কর্মচারী বাছাই করা
গ. রাজনৈতিক দল গঠন করা
ঘ. রাজনৈতিক দলের সদস্যদের বাছাই করা

২। জনাব রফিকুল্লাহ ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে এলাকায় কাজ করছেন। তিনি হলেন–

ক. ভোটার খ. জনপ্রতিনিধি
গ. নাগরিক ঘ. উন্নয়নকর্মী।

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন–

i. প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে
ii. পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে
iii. মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i খ ii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৪। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দক্ষ ও যোগ্য হলে–

i. শাসন ব্যবস্থা উন্নত ও উৎকৃষ্ট হয়
ii. দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়
iii. রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii ও iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব হাসান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী জামানের প্রতীক ও প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছেন এবং মিথ্যাচার করেছেন।

৫। নিচের কোন আইনবলে হাসানের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা যায়?

ক. শৃঙ্খলা আইন বিধি–১৯৮৬

খ. আচরণ বিধি–১৯৭৯

গ. গণকর্মচারী আইন–১৯৭৪

ঘ. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ–১৯৭২

৬। হাসান অভিযুক্ত হলে কত বছর কারাদণ্ড হতে পারে ?

ক. সর্বোচ্চ ৮ বছর কমপক্ষে ১ বছর বিনাশ্রম

খ. সর্বোচ্চ ১০ বছর কমপক্ষে ২ বছর সশ্রম

গ. সর্বোচ্চ ১০ বছর কমপক্ষে ২ বছর বিনাশ্রম

ঘ. সর্বোচ্চ ৯ বছর কমপক্ষে ৩ বছর সশ্রম

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব মোস্তাফিজুর রহমান গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনী প্রচারকালে তার কর্মীরা বিভিন্ন দলের পোস্টার ব্যানার ইত্যাদি নষ্ট করে এবং অন্য প্রার্থী সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ করে। জনাব মোস্তাফিজ জনগণকে সাহায্য প্রদানের নামে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তিনি প্রভাবশালী হওয়ায় তার বিরুদ্ধে অন্য প্রার্থীরা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না।

ক. নির্বাচন কী?

খ. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনের দুটি গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. জনাব মোস্তাফিজুর রহমান কীভাবে আচরণবিধি লংঘন করেছেন ।

ঘ. ''আচরণবিধি লংঘনের জন্য জনাব মোস্তাফিজুর রহমান এর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন''– তুমি কি এর সাথে একমত ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক দল

রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। সরকার যে রকমই হোক গণতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক সব ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব স্বীকৃত। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এর প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

যখন কোনো সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি রাষ্ট্রের সমস্যাবলি সম্পর্কে একমত পোষণ করে এবং সমস্যাবলি সমাধান সংক্রান্ত পন্থা এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কিছু নীতিমালা জনসাধারণের নিকট পেশ করে এবং জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে তখন সেই জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা হয়।

রাজনৈতিক দল একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক সংগঠন। দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা এর একটি প্রধান লক্ষ্য। এরা দলীয় কর্মসূচি গ্রহণ করে জনসমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা চালায়। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা দখল করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়। জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জনের পাশাপাশি দলীয় সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণেও তৎপর থাকে।

ম্যাকাইভার রাজনৈতিক দলের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, "যারা কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন করতে চেষ্টা করে, সেই জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা হয়।"

রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য

প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

১. রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান সমস্যা সনাক্ত করে আদর্শগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করা।

২. দলীয় নীতি ও দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি ও প্রগতি অর্জন করা।

৩. নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ও নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা দখল করা।

রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি

রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার এক অপরিহার্য উপাদান। অন্যান্য শাসন ব্যবস্থায়ও দলের প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থায় দলের ভূমিকায় অনেক পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বা কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা হল।

১. **নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি স্থির করা :** রাজনৈতিক দল দলীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে। নিজ নিজ আদর্শের ভিত্তিতে এবং দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আলোকে দল কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এই নীতিমালা ও কর্মসূচি একটি কার্যবিবরণী বা ম্যানিফেস্টোর আকারে তৈরি করা হয়।

২. **প্রার্থী মনোনয়ন ও নির্বাচনী প্রচার :** দলীয় যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারণা ব্যাপকভাবে করা হয়।

৩. **জনমত গঠন :** দলসমূহ পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের কর্মসূচি প্রচার করে। জনসাধারণ বিভিন্ন দলের কর্মসূচি পর্যালোচনা করে মতামত গঠন করতে পারে। এভাবে রাজনৈতিক দলসমূহ জনমত গঠনে সাহায্য করে।

৪. **রাজনৈতিক শিক্ষাদান :** রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষা অর্জন করে। বিভিন্ন দলের মতামত ও সমালোচনা যাচাই করে তারা রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে।

৫. **সরকার গঠন :** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে সে দলই সরকার গঠন করে। তারা দলীয় নীতি ও কর্মসূচি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে।

৬. **গঠনমূলক বিরোধিতা :** নির্বাচনে যে দল বা দলসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে না তারা বিরোধী দল হিসেবে কাজ করে। গঠনমূলক সমালোচনা করে বিরোধী দল স্বৈরাচারমূলক প্রবণতা রোধ করে এবং সরকারি দলকে দায়িত্বশীল রাখে।

৭. **ব্যক্তি ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন :** রাজনৈতিক দলের সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় সরকারি নীতি ব্যাখ্যা করে। আবার নাগরিকদের অভাব অভিযোগ সরকারের নজরে আনে। এভাবে দল উভয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে।

৮. **স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা :** স্বাধীন দেশে আঞ্চলিক স্বাধিকার আদায়ের জন্য এবং পরাধীন দেশে স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক দল আন্দোলন পরিচালনা করে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল এ সমস্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে গণতন্ত্রকে সার্থক করে তোলে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য কী হওয়া বাঞ্ছনীয় ?

ক. জনকল্যাণ সাধন করা
খ. সরকারের সমালোচনা করা
গ. সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ করা
ঘ. ক্ষমতা দখল করা

২। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের আবশ্যকতা–

i. ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখে
ii. সরকারি সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করে
iii. একচেটিয়া ব্যবসায়ী স্বার্থ বন্ধ করতে উদ্যোগ নেয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩–৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

তৌকির সাহেব তার কিছু অনুসারী নিয়ে পুরনো ধ্যান-ধারণা থেকে বের হয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। তিনি তার দলের সদস্যদের তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেন।

৩। তৌকির সাহেব তার অনুসারীদের নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠনের প্রথম পদক্ষেপটি হচ্ছে–

ক. নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন
খ. জনমত গঠন করা
গ. রাজনৈতিক শিক্ষাদান করা
ঘ. জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন

৪। তার এ নতুন দল গড়ার কারণ–

i. দলীয় দ্বন্দ্ব
ii. দলীয় আদর্শগত মতানৈক্য
iii. দলীয় নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

করিম সাহেব একটি রাজনৈতিক দলের নেতা। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে তিনি রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি দলের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন রূপে কাজ করতে ব্যর্থ হন। ফলে জনগণের কাছে তাঁর ও তাঁর দলের জনপ্রিয়তা কমে যায়। বর্তমানে তাঁর দলের সংস্কার প্রয়োজন।

ক. রাজনৈতিক দল কী?
খ. রাজনৈতিক দলের দুটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
গ. রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে করিম সাহেবের ভূমিকা কী হওয়া উচিত।
ঘ. গণতন্ত্রকে সার্থক করে তোলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আইন ও আইনের অনুশাসন

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের রীতিনীতি ও নিয়মের প্রতি তাকে অনুগত থাকতে হয়। এই আনুগত্যই সুশৃঙ্খল জীবন নিশ্চিত করে। সামাজিক মানুষেরই সৃষ্ট রাজনৈতিক সংগঠন হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নতি ও সুশৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান প্রণীত হয়। সৃষ্টি হয় আইন। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিজীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আমরা আইনের সাথে জড়িত।

আইনের সংজ্ঞা

আইন বলতে নিয়ম-কানুন বা বিধি-বিধানকে বুঝায়। সাধারণভাবে সমাজে যে বিধি-বিধান মানুষ মেনে চলে তা হল সামাজিক আইন। আর সমাজে মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার যে সকল বিধি-বিধান চালু করে সেগুলোকে বলে রাষ্ট্রীয় আইন। আইন হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মের সমষ্টি। এগুলো মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইন সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। জন অস্টিন (Austin) এর কথায়, "সার্বভৌম শাসকের আদেশই আইন।" হল্যান্ড বলেন, "আইন হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের এমন কতগুলো সাধারণ নিয়ম যা সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয়।" আইনের সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন উড্রো উইলসন (Wilson)। তাঁর মতে, "আইন হল সমাজের সেই সকল প্রতিষ্ঠিত প্রথা ও রীতিনীতি যেগুলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং যা সরকারের অধিকার ও ক্ষমতার দ্বারা বলবৎ করা হয়।"

আইনের বৈশিষ্ট্য

আইনের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সেগুলো হল– আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি আইন রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত। আইন সর্বজনীন। আইন সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। আইন মেনে চলতে হয়। আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি পেতে হয়।

আইনের উৎস

আইনের অনেক উৎস রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আইনের ছয়টি উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন। আইনের এই প্রধান ছয়টি উৎস হল– ১. প্রথা ২. ধর্ম ৩. বিচারকের রায় ৪. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ৫. ন্যায়বোধ ও ৬. আইনসভা।

১. **প্রথা :** সমাজে দীর্ঘদিন ধরে যেসব নিয়ম কানুন প্রচলিত সেগুলোকে প্রথা বলে। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রথা আইনের মর্যাদা লাভ করে। গ্রেট ব্রিটেনের অধিকাংশ আইন প্রথার ওপর গড়ে উঠেছে।

২. **ধর্ম :** ধর্ম, ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ হতে আইনের উৎপত্তি হয়ে থাকে। হিন্দু আইন, মুসলিম আইন ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৩. **বিচারকের রায় :** অনেক সময় প্রচলিত আইনের সাহায্যে কোনো কোনো বিচারের কাজ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না। তখন বিচারকগণ নিজস্ব বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে প্রচলিত আইনের অস্পষ্টতার নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে সে সব বিষয়ের নিষ্পত্তি করেন। এভাবে নতুন আইন তৈরি হয় ও পরবর্তীকালে ঐ ধরনের বিচারে সেগুলো ব্যবহৃত হয়। এভাবে প্রণীত আইনকে "বিচারক প্রণীত আইন" বলা হয়।

৪. **বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা :** প্রখ্যাত আইনবিদদের লেখা বা বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাও আইনের উৎস। আইনবিদদের আইন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ও মতামত অনেক সময় আদালতে গৃহীত হয়। ইংল্যান্ডের ব্ল্যাকস্টোন ও কোক-এর ব্যাখ্যা আইন ব্যবস্থায় বিশেষ স্থান লাভ করেছে।

৫. **ন্যায়বোধ :** অনেক সময় বিচারকাজ করতে গিয়ে বিচারপতিগণ নিজস্ব ন্যায়বোধ দিয়ে তা মীমাংসা করেন। এভাবে বিচারকদের ন্যায়বোধ হতে নতুন আইন সৃষ্টি হয়।

৬. **আইনসভা :** বর্তমান যুগে আইনসভা আইনের অন্যতম উৎস। আইনসভা রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে।

আইনের অনুশাসন

রাষ্ট্রের মধ্যে আইনের অনুশাসন থাকলে সকলে সমভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রপ্রদত্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে। সবল দুর্বলের অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে না। সকলেই অধিকার ভোগের ভেতর দিয়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়।

আইনের অনুশাসন বলতে প্রধান দুইটি ধারণাকে বুঝায়। যথা- (ক) আইনের প্রাধান্য ও (খ) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য।

আইনের অনুশাসন

রাষ্ট্রের মধ্যে আইনের অনুশাসন থাকলে সকলে সমভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রপ্রদত্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে। সবল দুর্বলের অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে না। সকলেই অধিকার ভোগের ভেতর দিয়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়।

আইনের অনুশাসন বলতে প্রধান দুইটি ধারণাকে বুঝায়। যথা- (ক) আইনের প্রাধান্য ও (খ) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য।

আইনের প্রাধান্য থাকায় সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে না। বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখা যাবে না এবং শাস্তি দেওয়া যাবে না। আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে কেউ আইন অমান্য করে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এমনকি সরকার কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হবে না।

আইনের দৃষ্টিতে সাম্য মানে ধনী, দরিদ্র, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে আইনের আশ্রয় লাভ করবে। প্রভাবশালী ও দরিদ্র একই অধিকার ভোগ করবে। সকলের জন্য একই আইন।

আইনের অনুশাসন না থাকলে ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে না। সভ্য সমাজের প্রধান লক্ষ্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যতীত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষিত হয় না। আইনের শাসন জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে। এই অধিকার খর্ব হলে আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার করা যায়। আইন সরকারের হস্তক্ষেপ হতে মৌলিক অধিকার রক্ষা করে জনগণকে তা উপভোগের নিশ্চয়তা দেয়। আইনের অনুশাসন স্বাধীনতা ও সাম্যের সংরক্ষক।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। "সার্বভৌম শাসক এর আদেশই আইন" বলেছেন–

ক. উইলসন খ. এরিস্টটল
গ. হল্যান্ড ঘ. অস্টিন

২। **আইনের অনুশাসন বলতে যে প্রধান দু'টো ধারণাকে বুঝায়, তা হচ্ছে–**

i. আইনের প্রাধান্য ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি
ii. ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ন্যায়-বিচার
iiii. আইনের প্রাধান্য ও আইনের দৃষ্টিতে সাম্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৩। **আইনের উৎস ক'টি ?**

ক. ৪টি খ. ৫টি
গ. ৬টি ঘ. ৭টি

৪। **আইনের অনুশাসন থাকলে–**

i. সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে না
ii. ধনী, দরিদ্র, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আইনের দৃষ্টিতে সমান থাকে
iii. প্রতিটি নাগরিক তার ইচ্ছেমতো আচরণ করতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নুরজাহান স্কুলে যাওয়ার পথে প্রতিদিন বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্ত হয়। সে বিষয়টি তার বাবা-মাকে জানায়। নুরজাহানের পিতা বিষয়টি গ্রামের মাতব্বরদের জানায়। গ্রাম্য শালিসে বলা হয় যে, নুরজাহান বেপরদা হয়ে স্কুলে যায় এবং ছেলেদের সাথে একই স্কুলে লেখাপড়া করে। গ্রাম্য মাতব্বররা বখাটেদের বিচার না করে ফতোয়া জারি করে যে, বেপরদা হয়ে চলাচলের জন্য নুরজাহানকে ২০ ঘা দোররা মারা হবে। নুরজাহানের পিতা সুবিচার না পেয়ে রাগে দুঃখে থানায় মামলা করে।

ক. আইন কী?
খ. ফতোয়া আইনের কোন ধরনের উৎস? ব্যাখ্যা কর।
গ. নুরজাহানের জন্য আইনের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোর পরিবর্তন আনতে হবে – ব্যাখ্যা কর।
ঘ. আইনের সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নুরজাহানের পিতার ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

২। আমিন সাহেব একজন শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তি। তিনি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সর্বদা আইন মান্য করে চলেন এবং বিভিন্ন অপকর্ম থেকে বিরত থাকেন। তিনি বিশ্বাস করেন আইনের অনুশাসন স্বাধীনতা ও সাম্যের সংরক্ষক।

ক. আইন কী?
খ. আইনের দুটি উৎসের ব্যাখ্যা দাও।
গ. আমিন সাহেবের আইনের অনুশাসন মেনে চলার পেছনে কী কী ধারণা কাজ করেছে।
ঘ. ''আইনের অনুশাসন স্বাধীনতা ও সাম্যের সংরক্ষক'' –উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের সংবিধান

সংবিধানে একটি রাষ্ট্রের পরিচালনা পদ্ধতি তথা একটি জাতির সমগ্র জীবন পদ্ধতি প্রতিফলিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর চূড়ান্তভাবে প্রণীত ও গৃহীত হয় এবং তা কার্যকরী হয়েছে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে সংশোধনীও হয়েছে অনেক। সংশোধিত এই সংবিধান অনুযায়ী চলছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. সংবিধানটি একটি লিখিত দলিল।
২. এর প্রস্তাবনায় "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"– উল্লেখ করা আছে।
৩. রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কতগুলো মূলনীতি সন্নিবেশ করা হয়েছে।
৪. সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সুদীর্ঘ তালিকা আছে। ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য এ অধিকার অপরিহার্য। এসব অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তাও সংবিধানে আছে।
৫. সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করা হয়েছে।
৬. বাংলাদেশকে একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
৭. সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।
৮. রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা থাকবে।
৯. আইনসভা হবে এককক্ষবিশিষ্ট। আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ।
১০. সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় (যা সহজে পরিবর্তন করা যায় না)।
১১. সংবিধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন।

এগুলো হল সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান একটি সুস্পষ্ট ও উত্তম সংবিধান।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

রাষ্ট্রের কতগুলো মূলনীতি থাকে, যার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি বা স্তম্ভ ছিল। তা হচ্ছে– জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। ১৯৭৭ সালে তা পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়ে নিম্নরূপ হয় :

১. সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস
২. জাতীয়তাবাদ
৩. গণতন্ত্র
৪. সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার (সংবিধান ১৯৯৮) সংশোধন।

রাষ্ট্রপতি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি। তিনি রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক বা নামমাত্র প্রধান। তিনি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁর ওপর আদালতের কোন এখতিয়ার নেই। জাতীয় সংসদ অভিশংসন করে তাঁকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে পারে। ৩৫ বছরের কম বয়স্ক হলে এবং সংসদের সদস্য হবার মতো যোগ্যতা না থাকলে বাংলাদেশের কোনো নাগরিক রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য যোগ্য নন। ইতিপূর্বে কখনো রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অপসারিত হননি– তাঁকে এমনো হতে হবে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ১. শাসন সংক্রান্ত ২. আইন সংক্রান্ত ৩. অর্থ সংক্রান্ত ৪. বিচার সংক্রান্ত ৫. জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ও ৬. বিবিধ।

১. **শাসন সংক্রান্ত :** রাষ্ট্রপতি সরকারের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান বলে প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ তাঁর নামে পরিচালিত হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রী, এটর্নী জেনারেল, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রদূত, সেনাবাহিনীর তিন প্রধান ও অন্যদের নিয়োগ করেন।

২. **আইন সংক্রান্ত :** রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করতে পারেন। তিনি সংসদে ভাষণ দান করেন। সংসদে গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁর কাছে পাঠানো হয়।

৩. **অর্থ সংক্রান্ত :** যেকোনো অর্থবিল সংসদে পেশ করতে বা কোনো মঞ্জুরি দাবি উত্থাপন করতে রাষ্ট্রপতির সুপারিশের প্রয়োজন হয়।

৪. **বিচার সংক্রান্ত :** দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড মার্জনা বা দণ্ড হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে।

৫. **জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত :** কোনো কারণে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে বা অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

৬. **বিবিধ :** রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী ও বিচারপতিদের শপথবাক্য পাঠ করান। তিনি বিশেষ অবদানের জন্য দেশের কৃতিসন্তানদের খেতাব প্রদান করেন। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করেন। রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদমর্যাদায় আসীন।

প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সকল ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। তিনি এবং তাঁর মন্ত্রিসভা দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা।

নিয়োগ ও পদমর্যাদা

রাষ্ট্রপতি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তাঁকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভার গঠন ও কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি

সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী যেসব ক্ষমতা ভোগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করেন সেগুলো নিম্নরূপ :

১. **শাসন সংক্রান্ত :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত। মন্ত্রীদের নিয়োগ, উচ্চ পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বিচার ও পররাষ্ট্রবিষয়ক যাবতীয় কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হয়। বাস্তবিকপক্ষে রাষ্ট্রে শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ তিনি সম্পাদন করেন।

২. **আইন সংক্রান্ত :** তাঁর নেতৃত্বে সংসদ দেশের আইন তৈরি করে। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৩. **অর্থ সংক্রান্ত :** প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে অর্থমন্ত্রী বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন ও পেশ করেন।

৪. **নেতৃত্ব প্রদান সংক্রান্ত :** সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব সর্বত্র স্বীকৃত। প্রধানমন্ত্রী সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেতা। তিনি আইনসভার নেতা। সংসদে তাঁর স্থান অদ্বিতীয়। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার নেতা ও সভাপতি। তাঁকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভা গঠিত, পরিচালিত ও বিলুপ্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী জাতির নেতা। তিনি জাতীয় নীতিরভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে কেন্দ্র করে সরকার, দেশ ও জাতি পরিচালিত হয়। তাঁর নেতৃত্বের ওপর রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন নির্ভরশীল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি কোনটিতে লিপিবদ্ধ?

ক. সংবিধানে
খ. সংবিধানের প্রস্তাবনায়
গ. রাষ্ট্রের আইনে
ঘ. স্বাধীনতা সনদে

২। বাংলাদেশ সংবিধানের কততম সংশোধনীতে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সংযোজন করা হয়?

ক. ৫ম সংশোধনীতে
খ. ৪র্থ সংশোধনীতে
গ. ৭ম সংশোধনীতে
ঘ. ৮ম সংশোধনীতে

৩। বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির উল্লেখ রয়েছে। এসব মূলনীতির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়–

i. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে
ii. আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে
iii. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নবম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ অন্যতম। এ বিভাগ রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের আইন বিভাগের কাজ করার জন্য আইনসভা প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশের আইনসভা জাতীয় সংসদ নামে পরিচিত। এটি একটি এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। এর স্থায়ী আসন রাজধানী ঢাকায়।

জাতীয় সংসদের গঠন

সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী অনুসারে জাতীয় সংসদ মোট ৩৪৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে ৩০০ জন নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। ৪৫টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। জাতীয় সংসদের বিভিন্ন দলের আসন অনুপাতে মহিলা আসনগুলো ভাগ হয়ে যাবে। সংরক্ষিত আসন ছাড়াও মহিলারা সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সদস্যদের ভোটে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নিযুক্ত হন। সংসদের মেয়াদ ৫ বছর।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. আইন প্রণয়ন

২. অর্থ সংক্রান্ত ও

৩. শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।

১. আইন প্রণয়ন ক্ষমতা : দেশের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। সংসদ যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। আইন প্রণয়ন বিলের মাধ্যমে হয়। সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পেশ করা হয়। জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। জাতীয় সংসদ সংবিধান মোতাবেক সংবিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারে।

২. অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা : সংসদের অনুমতি ব্যতীত কোনো প্রকার কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাবে না। সংসদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল বার্ষিক বাজেট পাস করা।

৩. শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ : জাতীয় সংসদ বিভিন্নভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা একক ও যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট তাঁদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন। সংসদ অনাস্থা জ্ঞাপন করলে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। সংসদ নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে, বাজেটের ওপর আলোচনা সমালোচনা করে এবং অনাস্থা প্রস্তাবের দ্বারা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের স্থল, বিমান ও নৌ বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা বা কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যায় না। রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে তা সংসদে উত্থাপন করে বিধিসম্মত করতে হয়। সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ থাকলে সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করতে পারে।

জাতীয় সংসদ এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার প্রাধান্য সর্বত্র স্বীকৃত। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদও এর ব্যতিক্রম নয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে কত?

ক. ৩৩০ জন খ. ৩৪৫ জন
গ. ৩২০ জন ঘ. ৩২৫ জন

২। জাতীয় সংসদে যেকোনো বিল রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর আইনে পরিণত হয়। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়–

i. রাষ্ট্রপতির স্থান ও পদমর্যাদা সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে
ii. রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সকল কাজ করেন
iii. রাষ্ট্রপতি কোনো ভুল করতে পারেন না

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা একক বা যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকেন এর কারণ–

i. বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা
ii. প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা দায়িত্বশীল
iii. বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বশীল ঐতিহ্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

৪। সরকার ও তার মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়, তখনই যখন–

ক. সংসদ অনাস্থা জ্ঞাপন করলে
খ. জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলে
গ. যুদ্ধ ঘোষণা করলে
ঘ. জনগণের বিরোধিতার মুখে।

৫। নির্বাহী বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সংসদের করণীয় কী ?

ক. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও নিন্দা প্রস্তাব করা
খ. সংসদ থেকে নির্বাহী বিভাগ গঠন করা
গ. আদালতে মামলা করা
ঘ. জনগণকে সমালোচনা করতে উৎসাহিত করা।

দশম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ

রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার বিভাগ একটি। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং নিরপেক্ষ বিচার অনুষ্ঠানের জন্য বিচার বিভাগের প্রয়োজন। বিচার বিভাগ দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে। আইনের অনুশাসনকে অক্ষুণ্ন রাখে। তাই বিচার বিভাগের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেশি।

বিচার বিভাগের গঠন

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতসমূহ নিয়ে গঠিত।

সুপ্রীম কোর্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৪ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ–এ দুইটি বিভাগ নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকদের নিয়ে আপীল বিভাগ গঠিত হয় এবং অন্যান্য বিচারকদের নিয়ে হাইকোর্ট বিভাগ গঠিত। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ স্বাধীনভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করেন।

বিচারপতিদের নিয়োগ ও যোগ্যতা : রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন। প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। কমপক্ষে ১০ বছর সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট হিসেবে অথবা বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় পদে ১০ বছর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নাগরিকদের সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিযুক্ত করা হয়। বিচারপতিদের কার্যকাল ৬৭ বছর পর্যন্ত।

ক্ষমতা ও কার্যাবলি : সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার চার প্রকার (সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০১ ও ১০৬) যথা : ১. আদি এখতিয়ার ২. আপীল এখতিয়ার ৩. উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার এবং ৪. বিবিধ ক্ষমতা।

আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ পৃথক পৃথকভাবে কাজ করে।

অধস্তন আদালতসমূহ

সংবিধানের ১১৪ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে অধস্তন আদালতসমূহ নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। সুপ্রীম কোর্টের অধীনে বাংলাদেশের প্রতি জেলায় অধস্তন বা নিম্ন আদালত আছে। এ আদালত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করে থাকে।

জেলাজজের আদালত : জেলা আদালতের প্রধান বিচারক জেলাজজ। তিনি জেলার দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ বিচারক। জেলাজজ যখন ফৌজদারী মামলার বিচার করেন তখন তাকে সেশন জজ বা দায়রা জজ বলে। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের সুপারিশক্রমে জেলা ও দায়রা জজ নিযুক্ত করেন।

অতিরিক্ত জেলাজজ, যুগ্ম জেলাজজ ও সহকারী জজ আদালত : জেলাজজের আদালতের অধীনে প্রত্যেক জেলায় অতিরিক্ত জেলাজজ, যুগ্ম জেলাজজ ও সহকারী জজ আদালত আছে। অতিরিক্ত জেলাজজ যখন ফৌজদারী মামলার বিচার করেন তখন তাঁকে অতিরিক্ত দায়রা জজ বলে। যুগ্ম জেলাজজ যখন ফৌজদারী মামলার বিচার করেন তখন তাঁকে সহকারী দায়রা জজ বলে। ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মেজিস্ট্রেটের আদালত আছে।

গ্রাম আদালত

বিচার বিভাগীয় কাঠামোর সর্বনিম্নে ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রাম আদালত আছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিবদমান দুই পক্ষের দুইজন করে মনোনীত সদস্য– মোট পাঁচজন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। যেসব মামলা গ্রাম আদালতে বিচারের যোগ্য, তার বিচার অন্য আদালতে হয় না। দেওয়ানী ও ফৌজদারী দণ্ড সংক্রান্ত ছোটখাট বিচারের নিষ্পত্তি গ্রাম আদালতে হয় (গ্রাম আদালত আইন-২০০৬)।

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

বাংলাদেশের সংবিধান (১১৭ নং অনুচ্ছেদ :) অনুযায়ী কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। বর্তমানে কয়েকটি জেলায় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আছে। ঢাকায় একটি প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল রয়েছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে–

ক. জেলাজজের আদালত
খ. সাবজজ আদালত
গ. তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্টেট আদালত
ঘ. গ্রাম আদালত

২। গ্রাম আদালতে নিষ্পত্তি হয়–

ক. যেকোনো ফৌজদারী মামলা
খ. ছোটখাট দেওয়ানী মামলা
গ. ছোটখাট ফৌজদারী মামলা
ঘ. ছোটখাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা

৩। রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার বিভাগ একটি। বিচার বিভাগের প্রয়োজন–

i. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য
i. নিরপেক্ষ বিচার অনুষ্ঠানের জন্য
iii. দক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii
খ ii ও iii
গ i ও iii
ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মামুন ও শামীম দুইভাই পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে গ্রাম আদালতে না যেয়ে সরাসরি জেলাজজ আদালতে দেওয়ানী মামলা করে। তাদের মামলা চলাকালীন মামলার বিচারক জনাব খায়রুল আনাম সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিযুক্ত হন। বিচার বিভাগে সুপ্রীম কোর্ট সর্বোচ্চ মর্যাদা ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় জনাব খায়রুল আনামকে সবাই অভিনন্দন জানায়।

ক. দেওয়ানী মামলার বিচারককে কী বলা হয়?
খ. জনাব খায়রুল আনামের ন্যূনতম বিচারিক অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা কর?
গ. মামুন ও শামীমের বাটোয়ারা মামলা গ্রাম আদালতে করা সম্ভব হলে গঠন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বিচার বিভাগের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেশী–মূল্যায়ন কর।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

ব্রিটিশ ভারত ও পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেরূপ ছিল বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও সে রকম। একই ধারায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে নতুনভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রয়োজনের তাগিদে অল্প-বিস্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্গঠন করা হয়েছে মাত্র।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর দুইটি ধারা রয়েছে। প্রথমটি হল নীতি-নির্ধারণী কেন্দ্র বা সচিবালয়, অপরটি হল স্থানীয় প্রশাসন (Field Administration)।

সচিবালয়

বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কার্যকলাপের উৎসরূপে এবং সরকারি কার্যকলাপের কেন্দ্ররূপে আছে সচিবালয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তার বিভাগসমূহের অফিসগুলোকে একত্রে সচিবালয় বলে। সচিবালয়ে শাসন ব্যবস্থার সকল মূলনীতি প্রণীত ও চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। সচিবালয় কতগুলো মন্ত্রণালয়ে বিভক্ত। প্রতিটি মন্ত্রণালয় একজন মন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত থাকে। তবে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন একজন সচিব। মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কাজের ভার সচিবের ওপর থাকে। মন্ত্রীর প্রধান কাজ প্রকল্প প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করা। সচিব সর্বতোভাবে সকল কাজে মন্ত্রীকে সাহায্য করেন। বাংলাদেশের সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্নে আছেন সহকারী সচিব এবং সবার ওপরে মন্ত্রী। এটি মূলত স্তরভিত্তিক নীতির ওপর ব্রিটিশ কাঠামোর অনুকরণে গড়ে উঠেছে। নিচের ছকে তা দেখানো হল :

মন্ত্রী
↓
সচিব
↓
অতিরিক্ত সচিব
↓
যুগ্ম সচিব
↓
উপসচিব
↓
সিনিয়র সহকারী সচিব
↓
সহকারী সচিব

একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একাধিক সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব ও সচিব থাকতে পারেন। তবে এসব কর্মকর্তার সংখ্যা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব ও কার্যাবলির ব্যাপকতার ওপর নির্ভর করে। বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য কতগুলো দপ্তর, বিভাগ ও অধিদপ্তর রয়েছে। অধিদপ্তরের মধ্যে শিক্ষা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ইত্যাদি রয়েছে। অধিদপ্তরের দায়িত্বে এক-একজন মহাপরিচালক আছেন। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অধিদপ্তরগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নীতি অনুযায়ী এগুলো কাজ করে থাকে।

স্থানীয় প্রশাসন

বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রের এলাকাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এখানে এলাকাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা বা স্থানীয় প্রশাসন প্রচলিত। প্রশাসনিক কাঠামোতে কেন্দ্রের পরবর্তী স্তর হচ্ছে বিভাগ। প্রতিটি বিভাগ কতগুলো জেলায় এবং জেলাগুলো উপজেলায় বিভক্ত এবং কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোয় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় শাসন এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত।

বিভাগীয় প্রশাসন

বাংলাদেশকে ছয়টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিভাগগুলো হচ্ছে– ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট। বিভাগের শাসনভার বিভাগীয় কমিশনারের ওপর ন্যস্ত। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন সিনিয়র সদস্য। বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকদের কাজ তদারক ও পর্যবেক্ষণ করেন ও তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করেন।

তিনি বিভাগের রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলিও পরিচালনা করেন। বিভাগের জনকল্যাণমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তাঁর দায়িত্ব। সাহায্যমূলক ও সেবামূলক কাজ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদিও তাঁকে করতে হয়।

জেলা প্রশাসন

প্রত্যেক বিভাগ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত। জেলা প্রশাসক বা ডেপুটি কমিশনার জেলা শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য। জেলা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা আছে। জেলা প্রশাসকদের কার্যাবলি খুব ব্যাপক।

১. **প্রশাসন সংক্রান্ত কাজ :** বাংলাদেশ সচিবালয়ে গৃহীত শাসন সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা বাস্তবায়ন করা, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কাজ তদারক করা এবং সরকারি নীতি নির্ধারণে সরকারকে সাহায্য সহযোগিতা করা জেলা প্রশাসনের শাসন সংক্রান্ত কাজ।

২. **রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ :** জেলা প্রশাসক প্রধান কালেক্টর হিসেবে জেলার ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য কর ধার্য ও আদায় করেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এ কাজে তাঁকে সাহায্য করেন।

৩. **শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত কাজ :** জেলার পুলিশ সুপারের সহায়তায় নিজ জেলায় শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা জেলা প্রশাসকের কাজ। তিনি সকল ফৌজদারী মামলার বিচারও করে থাকেন। একাধারে তিনি শাসক ও বিচারক।

৪. **উন্নয়নমূলক কাজ :** জেলার কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ জেলা প্রশাসক করে থাকেন।

৫. **বিবিধ কার্যাবলি :** এছাড়া জেলা প্রশাসক বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জেলার অধীনস্থ সকল বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব।
জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসনের মধ্যমণি। একটি জেলার শান্তি, শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন বহুলাংশে একজন সুযোগ্য জেলা প্রশাসকের ওপর নির্ভর করে।

উপজেলা প্রশাসন

প্রতিটি জেলা কয়েকটি উপজেলায় বিভক্ত। বাংলাদেশে ৪৮১টি প্রশাসনিক উপজেলা রয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। তিনিও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য। তিনি জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি হিসেবে উপজেলার দায়িত্ব পালন করেন। উপজেলার সকল উন্নয়ন ও প্রশাসনিক তদারক করা, ম্যাজিস্ট্রেটের অনুপস্থিতিতে বিচারকের কাজ করা, কোষাগারের রক্ষক ও উপজেলার বরাদ্দ অর্থের আহরণ ও ব্যয়ক কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দায়িত্ব। সরকার কর্তৃক অর্পিত বিভিন্ন কার্যাদি বিভিন্ন সময়ে তিনি সম্পাদন করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে কয়টি স্তর রয়েছে ?

ক. ২ টি খ. ৪ টি

গ. ৬ টি ঘ. ৮ টি

২। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকেন ?

ক. মন্ত্রী খ. সচিব

গ. অতিরিক্ত সচিব ঘ. উপ সচিব

৩। বিভাগীয় কমিশনারদের কাজ হচ্ছে–

i. জেলা ও উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাজ

ii. জেলা প্রশাসকদের কাজ তদারক ও পর্যবেক্ষণ

iii. শুধুমাত্র উপজেলা পরিষদের কাজ তদারক করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৪। বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় প্রশাসন নীতি নির্ধারণ করে, প্রশাসন বা অধস্তন প্রশাসন কেন্দ্রের নীতি বাস্তবায়ন করে। কেন্দ্র ও মাঠ প্রশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য–

i. প্রশাসন পরিচালনা করা

ii. জনকল্যাণ সাধন করা

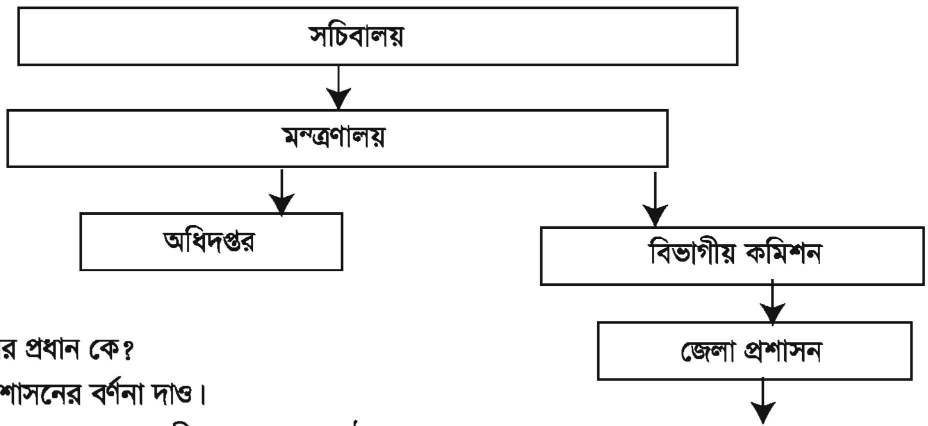
iii. আইন মান্য করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন



ক. মন্ত্রণালয়ের প্রধান কে?

খ. উপজেলা প্রশাসনের বর্ণনা দাও।

গ. উপরের ছকের আলোকে স্থানীয় সরকারের কাঠামো ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. জেলা প্রশাসকের কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কী ?

একটি দেশের ছোট ছোট এলাকার জনসাধারণের প্রতিনিধিরা যখন নিজ নিজ এলাকার শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে, তখন তাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলে। প্রত্যেক এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠিত হয়। এসব স্থানীয় সংস্থা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এবং স্থানীয় উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকে। এলাকাভিত্তিক এরূপ শাসন ব্যবস্থা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, পৌর কর্পোরেশন ইত্যাদি।

ইউনিয়ন পরিষদ

এটি বাংলাদেশের একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ইউনিয়ন পরিষদ পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন সাধন করে। দেশে বর্তমানে মোট ৪৪৯৮টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে।

গঠন : ১৯৭৬ সালে 'বাংলাদেশ স্থানীয় শাসন অর্ডিন্যান্স' জারি হয়। এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী প্রতি ইউনিয়নে একটি করে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ওয়ার্ড এবং তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। কিন্তু ১৯৮৩ সালের স্থানীয় শাসন কাঠামোতে কিছু সংশোধন আনা হয়। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর সংশোধনী বিলে ইউনিয়নে বিদ্যমান তিনটি ওয়ার্ডের পরিবর্তে নয়টি ওয়ার্ড গঠন করা হয় এবং প্রতিটি ওয়ার্ড হতে প্রত্যক্ষ ভোটে একজন সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত তিনটি আসনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯৭ সালের আইন অনুযায়ী এই তিনজন মহিলা সদস্য প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন।

ইউনিয়ন পরিষদের গঠন প্রসঙ্গে তাই বলা যায়, একটি ইউনিয়নের নয়টি ওয়ার্ড থেকে প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে মোট নয়জন সদস্য, একজন চেয়ারম্যান এবং সংরক্ষিত আসনে তিনজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন।

অর্থাৎ ১ জন চেয়ারম্যান + ৯ জন সদস্য + ৩ জন মহিলা সদস্য = মোট ১৩ জন প্রতিনিধি নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর। নির্বাচনের পর প্রথম যেদিন পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় সেদিন থেকে এর কার্যকাল গণনা করা হয়।

চেয়ারম্যান ও সদস্যপদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

যোগ্যতা

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য নিচে বর্ণিত যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।

১. তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

২. চেয়ারম্যান হতে হলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের যেকোনো ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় এবং সদস্য হতে হলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় নাম থাকতে হবে।

৩. চেয়ারম্যানের জন্য কমপক্ষে ২৫ বছর এবং সদস্যের জন্য কমপক্ষে ১৮ বছর বয়সের প্রয়োজন হয়।

অযোগ্যতা

১. আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হলে;

২. দেউলিয়া ঘোষিত হলে;

৩. কোনো কারণে নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হলে;

৪. ফৌজদারী অপরাধে দুবছর সাজা ভোগ করার পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হলে;

৫. স্থানীয় কোনো সংস্থা বা সরকারি পদে বা লাভজনক পদে কর্মরত থাকলে বা সরকার কর্তৃক ব্যবসায়িক কাজে চুক্তিবদ্ধ হলে;

৬. আইন অনুযায়ী অনুপযুক্ত বলে ঘোষিত হলে। উপরিউক্ত যেকোনো কারণে কোনো ব্যক্তি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হতে বা বহাল থাকতে পারবেন না।

উৎস : *Statistical pocket book Bangladesh - 2007 Page - 07

ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস

ইউনিয়ন পরিষদ জনকল্যাণের জন্য যত কাজ করে তার ব্যয় নির্বাহের জন্য কর ও সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভর করে। কর সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর ধার্য করা হয় :

১। ঘরবাড়ির মূল্য ও জমির আয়ের ওপর;
২। গরুর গাড়ি, সাইকেল, রিক্সা ইত্যাদি যানবাহনের ওপর;
৩। হাটবাজার, খোয়াঘাট ইত্যাদির ওপর,
৪। সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদির ওপর;
৫। বিয়ে, ভোজ, আলোকসজ্জা ও খেলাধুলার ওপর;
৬। আমদানি ও রপ্তানির ওপর;
৭। লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদির ওপর ও
৮। জলমহাল কর।

এ সমস্ত কর হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের মূল উৎস।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি

ইউনিয়ন পরিষদকে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করতে হয়। যেমন-

১। **জনকল্যাণমূলক কাজ :** রাস্তাঘাট তৈরি ও সংরক্ষণ করা, আলোর ব্যবস্থা করা, জন্ম-মৃত্যুর নিবন্ধন করা, কবরস্থান, শ্মশান নির্মাণ ও তত্ত্বাবধান করা ইত্যাদি ইউনিয়ন পরিষদের জনকল্যাণমূলক কাজ।

২। **উন্নয়নমূলক কাজ :** ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদের প্রসার ঘটানো; উন্নত বীজ, চারা ও সার বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা; পোকামাকড় থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য কীটনাশকের ব্যবস্থা করা; বাঁধ নির্মাণ ও সেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

৩। **জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত :** নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা, আবহাওয়া দূষিত না হওয়ার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করা, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা তদারক, পাঠাগার স্থাপন, পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, স্থানীয় কলহ-বিবাদ মীমাংসা ইত্যাদি ইউনিয়ন পরিষদের কাজের অন্তর্ভুক্ত।
গ্রামের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জেলা পরিষদ

গঠন : বাংলাদেশের ৬৪টি জেলাতেই জেলা পরিষদ আছে। নির্বাচিত, মনোনীত ও সরকারি এই তিন প্রকারের সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়। সদস্য সংখ্যা জেলার লোকসংখ্যা অনুযায়ী কমবেশি হয়ে থাকে। পরিষদের প্রধান কর্মকর্তা চেয়ারম্যান। জেলা পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর।

কার্যাবলি : জেলা পরিষদ কতগুলো অপরিহার্য ও কতগুলো ঐচ্ছিক কাজ করে থাকে। সরকারের নির্দেশ মোতাবেক যে সব কাজ অবশ্যই করতে হয় সেগুলো হচ্ছে অপরিহার্য কাজ।
পাঠাগার, রাস্তা, ব্রিজ, খেলার মাঠ, ডাকবাংলো, খেয়াঘাট ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, লাইসেন্স প্রদান, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, জাতীয় দিবস পালন ইত্যাদি অপরিহার্য কাজ।
শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জেলার সার্বিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ জেলা পরিষদের ঐচ্ছিক কাজের অন্তর্গত।
জেলা পরিষদ এ সমস্ত কাজের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও উন্নয়ন সাধন করে থাকে।

পৌরসভা

শহর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হচ্ছে পৌরসভা। বাংলাদেশে বর্তমানে ছোট বড় সকল পৌরসভা আছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৩০৮টি পৌরসভা আছে।

গঠন : প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান, ওয়ার্ডভিত্তিক কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। সকল পৌরসভার সদস্য সংখ্যা সমান নয়। সদস্য সংখ্যা শহরের আয়তন ও লোকসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। সদস্যরা কমিশনার নামে পরিচিত। পৌরসভার কার্যকাল পাঁচ বছর। অসদাচরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, পৌরসভার সম্পত্তির ক্ষতিসাধন ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত হলে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে চেয়ারম্যান বা সদস্যদের অপসারণ করা যায়।

কার্যাবলি

শহর এলাকার সমস্যার সমাধান ও শহর উন্নয়নের জন্য পৌরসভা বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। নিচে প্রধান প্রধান কাজ উল্লেখ করা হল।

১. **পরিকল্পনামূলক :** শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পৌরসভা বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে এবং লাভজনক বাণিজ্যের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

২. **জননিরাপত্তামূলক :** অগ্নি নির্বাপণ, বন্যা, মহামারী, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে জীবনরক্ষা, কবরস্থান, শ্মশান নির্মাণ, অবৈধ ও বিপজ্জনক ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পৌরসভার দায়িত্ব।

৩. **জনস্বাস্থ্য বিষয়ক :** চিকিৎসাকেন্দ্র, মাতৃসদন, শিশুসদন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার, এলাকায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষা করা, ডাস্টবিন ও ড্রেন নির্মাণ, দূষিত ও ভেজাল খাদ্য ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি পৌরসভার জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কাজ।

৪. **বাসস্থান সংক্রান্ত :** পৌর এলাকার গৃহনির্মাণ ও পুনঃনির্মাণে পৌরসভার অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। বিপজ্জনক বা বসবাসের অনুপযোগী বাড়িঘরের মালিককে এগুলো সংস্কার বা ভেঙে ফেলার নির্দেশ পৌরসভা দিয়ে থাকে।

৫. **রাস্তাঘাট সংক্রান্ত :** পৌরসভা জনসাধারণের সুবিধার জন্য রাস্তা নির্মাণ, নামকরণ ও সংরক্ষণ করে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, আলোর ব্যবস্থা করা ও রাস্তায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা পৌরসভার কাজ।

৬. **শিক্ষা সংক্রান্ত :** পৌরসভা পৌর এলাকায় শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পৌরসভার শিক্ষা সংক্রান্ত কাজগুলো হল– শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হোস্টেল নির্মাণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, গণশিক্ষার ব্যবস্থাকরণ, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান ও বিনামূল্যে বই বিতরণ ইত্যাদি।

৭. **সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত :** দরিদ্র ও দুঃস্থদের সাহায্যার্থে কল্যাণকেন্দ্র ও এতিমখানা স্থাপন ও পরিচালনা পৌরসভার কাজ। তাছাড়া, পৌরসভা জুয়া খেলা, মদ্যপান প্রভৃতি অসামাজিক কাজ বন্ধ করে।

৮. **কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক :** কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক উন্নতির জন্য পৌরসভা শহর এলাকায় জাদুঘর, আর্টগ্যালারী ইত্যাদি স্থাপন করে। তাছাড়া, মিলনায়তন, গ্রন্থাগার, মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা, খেলাধুলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা পৌরসভার দায়িত্ব।

৯. **বিচার সংক্রান্ত :** পৌরসভা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করতে পারে। পৌরসভার চেয়ারম্যান ও উভয় পক্ষের মতামত সাপেক্ষে আরো চার জন সদস্যসহ মোট পাঁচ জন নিয়ে বিচার কমিটি গঠিত হয়।

১০. **বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত :** পৌর এলাকার বন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; রাস্তার পাশে ও সরকারি জায়গায় বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ, শহর এলাকার অধিবাসীদের সুবিধার্থে পার্ক, উদ্যান, খেলার মাঠ ইত্যাদি তৈরি ও সংরক্ষণ করাও পৌরসভার কাজ।

এ সমস্ত বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে পৌরসভা শহরের উন্নতি সাধন করে।

পৌর কর্পোরেশন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রাজশাহী পৌরসভাকে পৌর কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পৌর কর্পোরেশনের এলাকা ও কাজের ওপর এর সদস্য সংখ্যা নির্ভরশীল। কর্পোরেশনে একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র আছেন। শহরের সমস্যার সমাধান ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সম্পাদনের জন্য পৌর কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানকালে রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা বিশাল ও বিপুল। কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় কাজে ব্যস্ত থাকে। সরকারের একার পক্ষে সমগ্র দেশের সকল এলাকার সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই স্থানীয় এলাকার আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারে না। সেজন্য স্থানীয় সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা জাতীয় নেতৃত্ব সৃষ্টির ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রাখে। সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিক্ষা লাভ করে। স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা সমাধান ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট কতটি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে ?

ক. ৪৫৫৪ টি খ. ৪৪৯৮ টি

গ. ৪৫৫৬ টি ঘ. ৪৫৫৭ টি

২। বাংলাদেশে শহর এলাকায় জনস্বাস্থ্য বিষয়ক যে সকল কার্যাবলি পৌরসভার উদ্যোগে গৃহীত হয়–

(ক) বন্যা প্রতিরোধ, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, ভেজাল খাদ্য ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি

(খ) মহামারী হতে জীবন রক্ষা, শ্মশান নির্মাণ, চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা ইত্যাদি

(গ) অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করা, চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা, সংক্রামক রোগের টিকা দান ইত্যাদি

(ঘ) ডাস্টবিন ও ড্রেন নির্মাণ, চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩–৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কুতুবউদ্দীন চৌ: উরকিরচর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, তার সাথে রয়েছে কিছু পুরুষ ও মহিলা সদস্য। তিনি এলাকার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তবে তার এ ধরনের কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেকগুলো বিষয়ের ওপর কর ধার্য করতে হয়।

৩। নিয়মানুযায়ী উরকিরচরে মোট কত জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত ?

ক. ৯ জন খ. ১২ জন

গ. ১৩ জন ঘ. ১৫ জন

৪। কুতুবউদ্দিন সাহেব কৃষকদের উন্নয়নের জন্য অধিক গুরুত্ব দিবেন–

i. সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ

ii. উন্নত বীজ, কীটনাশক, চারা ও সার বিতরণ

iii. বাঁধ নির্মাণ ও সেচের সুব্যবস্থা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৫। কুতুবউদ্দিন সাহেব তার ব্যয় নির্বাহের জন্য কর আরোপ করতে পারেন–

i. ঘরবাড়ির মূল্য ও জমির আয়ের ওপর

ii. গরুর গাড়ি, সাইকেল, রিক্সা ইত্যাদি যানবাহনের ওপর

iii. হাট–বাজার ও খেয়া ঘাট, জলমহাল-এর ওপর।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মি: বরকত একজন যুবক। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে চেয়ারম্যান হন। নির্বাচনী প্রচারণার সময় জনগণের কাছে উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজ করার অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা। এ লক্ষ্যে তিনি ইতিমধ্যে কাজও শুরু করেছেন এবং জনগণের কাছে নির্বাচনী অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থার সমর্থক।

ক. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ?

খ. ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের দুটি উৎস ব্যাখ্যা কর।

গ. ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে জনাব বরকতের নেতৃত্বের বিকাশ কীভাবে ঘটছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ''ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ একটি যথার্থ ব্যবস্থা'' –এ উক্তির সাথে তুমি কি একমত। তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জাতিসংঘ

পটভূমি ও গঠন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল 'লীগ অব নেশনস'। কিন্তু 'লীগ অব নেশনস' এর ব্যর্থতা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বিশ্বের তৎকালীন নেতারা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আরো একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।
'লীগ অব নেশনস' এর ধ্বংসাবশেষের ওপরই গড়ে উঠেছে জাতিসংঘ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীনই জাতিসংঘের জন্মপ্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ জন্মলাভ করে। তখন থেকে প্রতি বছর ২৪ অক্টোবরকে জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

সদস্য

জাতিসংঘ সনদের নিয়মকানুন মেনে চলতে আগ্রহী বিশ্বের যেকোনো শান্তিকামী দেশ জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার যোগ্য। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ১৯৩। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জন করে।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

জাতিসংঘ সনদে সুস্পষ্টভাবে জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণিত আছে। উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. শান্তি ভঙ্গের হুমকি ও আক্রমণাত্মক প্রবণতা দূর করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
২. সমমর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব জোরদার করা।
৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা।
৪. মানবাধিকার রক্ষা করা।
৫. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করা।
৬. উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের কার্যধারাকে পরিচালিত করা।

বিশ্বশান্তি বিধানে জাতিসংঘের ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উন্নতি, প্রগতি এবং সংহতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জাতিসংঘ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, লিবিয়া প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা লাভ জাতিসংঘের প্রচেষ্টার ফল। ১৯৪৭ সালে গ্রিসের সঙ্গে আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সুসম্পর্ক স্থাপনে জাতিসংঘের অবদান রয়েছে। এছাড়া, প্যালেস্টাইন যুদ্ধ, আরব-ইসরাইল সংঘর্ষ, সুয়েজ সংকট ইত্যাদি সমাধানে এবং দীর্ঘস্থায়ী ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিরসনে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইরাক-কুয়েত সংঘর্ষে জাতিসংঘ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ফিলিস্তিন-ইসরাইল শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ ভূমিকা পালন করেছে। নিরস্ত্রীকরণ এবং বর্ণবৈষম্য নীতি দূরীকরণ করতেও এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বব্যাপী সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন করতে জাতিসংঘ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক স্বার্থ, শিক্ষা, শ্রম, মানবাধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও জাতিসংঘ প্রশংসনীয় কাজ করে আসছে। তবে জাতিসংঘের ব্যর্থতাও অনেক। আজও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ-বিগ্রহ, কলহ-দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে। ফলে বিশ্ববিবেক ব্যথিত ও অপমানিত হচ্ছে। আফগান সমস্যা, বসনিয়া, চেচনিয়া ইত্যাদি সমস্যা তার প্রমাণ।

একথা সত্য যে, শান্তি রক্ষার প্রয়োজনে সংকটের মুহূর্তে বিশ্ববাসীর বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র এবং দুর্বলতম দেশগুলোর জন্য জাতিসংঘ এখনো শেষ আশ্রয়স্থল। জাতিসংঘ যত স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তার ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে, আগামী বিশ্ব তত বিপদমুক্ত থাকবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। হাসান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন সেনা সদস্য। ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের সময় জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা মিশনে হাসান কাজ করার সুযোগ পায় এবং শান্তি মিশনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

এক্ষেত্রে হাসানের দায়িত্ব হচ্ছে–

i বিশ্বের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা

ii বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা

iii বিশ্বের যুদ্ধ অবসানের জন্য কাজ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। লীগ অব নেশনস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

ক. ১৯১০ সালের ১০ জানুয়ারি

খ. ১৯১৫ সালের ১৫ জানুয়ারি

গ. ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি

ঘ. ১৯২৫ সালের ২০ জানুয়ারি।

৩। জাতিসংঘের প্রচেষ্টার ফলে স্বাধীনতা লাভ করেছে–

ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. ইসরাইল

গ. বাংলাদেশ ঘ. লিবিয়া

সৃজনশীল প্রশ্ন

বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। তাঁরা একমত ও একজোট হয়ে যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি বিশ্ব সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন জাতিসংঘ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উন্নতি, প্রগতি এবং সংহতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জাতিসংঘ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ব্যর্থতা থাকলেও শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে সংকটের মুহূর্তে বিশ্ববাসীর বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল দেশগুলোর জন্য জাতিসংঘ এখনো শেষ আশ্রয়স্থল।

ক. কখন আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ জন্ম লাভ করে?

খ. জাতিসংঘের সৃষ্টি কেন হয়?

গ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে জাতিসংঘ কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?

ঘ. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্থনীতির বিষয়বস্তু

ভূমিকা : সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুর অভাব বা প্রয়োজন বোধ করে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই এমনটি চলে আসছে। আধুনিক কালে মানুষের প্রয়োজন আরো বেড়ে গেছে। এ প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে মানুষ নানা ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকে এবং জীবিকা খুঁজে নেয়। এভাবে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং সে অর্থের বিনিময়ে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদির অভাব বা প্রয়োজন মেটায়।

অর্থনীতির সংজ্ঞা

মানুষের জীবনে অভাবের কোনো শেষ নেই। কিন্তু অভাব মেটাবার জন্য উপকরণ বা সম্পদ সীমাবদ্ধ। তাই মানুষ নানাবিধ কাজে নিয়োজিত থেকে অর্থ উপার্জন বা সম্পদ উৎপাদন করে এবং অভাব মেটায়। অর্থনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা সামাজিক মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণের জন্য সম্পদ উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের সাথে জড়িত কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। ইংরেজি Economics শব্দটি গ্রিক শব্দ Oikonomia হতে উদ্ভূত যার আভিধানিক অর্থ গৃহস্থালি বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা।

অর্থনীতির জনক এড্যাম স্মিথ (Adam Smith) এর মতে, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে।" সাম্প্রতিককালের অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে এল রবিনস এর সংজ্ঞা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা অসীম অভাব ও বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য মানুষের প্রচেষ্টার পর্যালোচনা করে।"

অর্থনীতির বিষয়বস্তু ও আওতা

সামাজিক মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি আলোচনাই অর্থনীতির বিষয়বস্তু। সমাজ বহির্ভূত কোনো মানুষ যেমন ফকির, সন্ন্যাসী কিংবা অসামাজিক কাজে লিপ্ত চোর, ডাকাতের কাজকর্ম অর্থনীতির আওতায় পড়ে না।

দ্বিতীয়ত, মানুষের সব কাজ অর্থনীতির আওতাভুক্ত নয়। কেবল অর্থনৈতিক কার্যাবলি নিয়েই অর্থনীতির আলোচনা। অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয়ের সাথে জড়িত কার্যাবলিকে বোঝায়। যেমন, কৃষকের কাজ, শ্রমিকের কাজ, শিক্ষকের কাজ, নার্সের কাজ ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, মানুষের অভাব অফুরন্ত, কিন্তু সম্পদ সীমিত। এই সীমিত সম্পদ দিয়ে অভাব মোচন করে সর্বাধিক তৃপ্তি কিভাবে পাওয়া যায় তাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

চতুর্থত, অর্থনৈতিক কাজকর্ম সুসম্পন্ন করার জন্য মুদ্রা ব্যবস্থা, ব্যাংক ব্যবস্থা, ব্যবসায়বাণিজ্য, সরকারি অর্থব্যবস্থা, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার আলোচনা অর্থনীতিতে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

সুতরাং মানুষের যে সমস্ত কাজ সম্পদের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের সাথে জড়িত তা অর্থনীতির আলোচনার বিষয়বস্তু।

সবশেষে, অপ্রাচুর্যের সমস্যা থেকে উদ্ভূত সমাজের নানা মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা, যেমন, কি উৎপাদন করতে হবে, কেমন করে উৎপাদন করতে হবে, কার জন্য উৎপাদন করতে হবে, অর্থনীতি এসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। অর্থনীতি শুধু এসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয় না, এগুলো সমাধানের উপায়ও নির্দেশ করে।

অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান জগতে মানুষের অধিকাংশ সমস্যাই অর্থনৈতিক সমস্যা। তাই অর্থনীতির জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনীতি পাঠের বাস্তব গুরুত্ব অপরিসীম।

এ দেশের বহুবিধ অর্থনৈতিক সমস্যা যথাযথভাবে চিহ্নিত করা এবং সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক। অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা নিচে বর্ণনা করা হল।

১। **মানুষের দৈনন্দিন জীবনে :** মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অফুরন্ত অভাব সীমিত সম্পদের সাহায্যে মেটানোর জন্য, কোন অভাবকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত এবং সম্পদের বিকল্প ব্যবহার কীভাবে তৃপ্তিকে সর্বাধিক করতে পারে তা বোঝার জন্য অর্থনীতির জ্ঞানের প্রয়োজন।

২। **সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার :** দেশের সীমিত সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করলে উৎপাদন সর্বাধিক হবে এবং নানাবিধ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে তা অর্থনীতি পাঠ থেকে জানা যায়।

৩। **ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে :** ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীদের নিকট অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব অসীম। কেননা একজন ব্যবসায়ী বা উৎপাদনকারীর ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণের জন্য বাজারে কোন দ্রব্যের কেমন চাহিদা থাকতে পারে, কত দামে কোন দ্রব্য বিক্রি হতে পারে ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে অনুমান করার জন্য অর্থনীতির জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে।

৪। **রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে :** রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তাদের দেশের অর্থনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। অর্থনৈতিক জ্ঞান না থাকলে দেশের কর নীতি, মুদ্রা নীতি, ঋণ নীতি, শিল্প নীতি, বাণিজ্য নীতি, আয় বণ্টন নীতি, বৈদেশিক ঋণ ও বাণিজ্য নীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

৫। **সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে :** বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা যেমন– দারিদ্র্য ও বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, অশিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার অভাব, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্যা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং তা সমাধান করতে হলে অর্থনীতির জ্ঞান অপরিহার্য।

৬। **শিল্প এবং শিল্প সংশ্লিষ্ট কাজে :** দ্রুত শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রমিকদের সমস্যা অনুধাবন এবং দাবি-দাওয়া আদায়, ন্যায্য মজুরি ও আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা, চাকরির নিশ্চয়তা, কাজের সময় নির্ধারণ, ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য অর্থনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৭। **প্রশাসকের ক্ষেত্রে :** দেশের ও প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন করতে, কর ধার্য করতে, সম্পদের সমাবেশ ঘটাতে, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করতে, বাৎসরিক পরিকল্পনা গ্রহণে, বিভিন্ন নীতি যেমন, কর নীতি, শিল্প নীতি, শ্রম নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

৮। **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে :** আধুনিক বিশ্বের প্রায় সব দেশই দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো না কোনো ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে অর্থনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৯। **সচেতন নাগরিকের নিকট :** একজন সচেতন নাগরিকের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন– জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ, শিক্ষার প্রসার, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, সুষ্ঠু পরিবেশ গঠনে সহায়তা দান ইত্যাদি কাজের অংশীদার। এসব উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের অর্থনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়–

ক. সামাজিক সমস্যা
খ. মানসিক সমস্যা
গ. অর্থনৈতিক সমস্যা
ঘ. পারিবারিক সমস্যা

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মানুষের সব কাজ অর্থনীতির আওতাভুক্ত নয়। কেবল অর্থনৈতিক কার্যাবলি নিয়েই অর্থনীতি আলোচনা করে। অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বোঝায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অভাবের কারণে বিভিন্ন রকম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

২। অর্থনৈতিক কাজ হচ্ছে–

i. মায়ের সেবা
ii. শিক্ষকের শিক্ষাদান
iii. নার্সের সেবা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

৩। বর্তমান জগতে মানুষের অধিকাংশ সমস্যাই–

ক. পারিবারিক সমস্যা
খ. সামাজিক সমস্যা
গ. অর্থনৈতিক সমস্যা
ঘ. রাজনৈতিক সমস্যা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪–৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রাহেলা বেগম পার্শ্ববর্তী বাড়িতে ঝি–এর কাজ করে। একদিন কাজ শেষে নিজ বাড়ি ফেরার পথে গৃহকর্ত্রী তাঁকে ১টি কমলা খেতে দেয়। সে কমলাটি নিজে না খেয়ে তার দুই সন্তানের জন্য বাড়ি নিয়ে আসে। বাড়িতে ফিরে এসে দু'সন্তানের মধ্যে কমলাটি ভাগ করে খেতে দিলে তারা উভয়ই কান্না জুড়ে দেয়। সন্তানের কান্না শুনে পাশের ঘরের রহিমার মা কারণ জিজ্ঞেস করে। জবাবে রাহেলা বেগম বলে যে, তার কাছে ১টি মাত্র কমলা আছে কিন্তু তার দু'সন্তানই ১টি করে কমলা খেতে চায়।

৪। ঝি-এর কাজ হচ্ছে –

ক. সামাজিক কাজ
খ. দৈনন্দিন কাজ
গ. অর্থনৈতিক কাজ
ঘ. সেবামূলক কাজ

৫। রাহেলা বেগমের সন্তানদের কান্না কোন মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার ইঙ্গিত করে ?

ক. খাদ্য সমস্যা
খ. স্বল্পতার সমস্যা
গ. পারিবারিক সমস্যা
ঘ. শিশুর সমস্যা

৬। অভাব পূরণে সম্পদ সীমিত হলেও তা কিন্তু–

ক. বিকল্প ব্যবহারযোগ্য
খ. বিনিময়ের যোগ্য
গ. হস্তান্তরযোগ্য
ঘ. সংরক্ষণযোগ্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা

মানুষের অভাব মেটাবার লক্ষ্যে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়। মানুষের অভাব অগণিত ও সীমাহীন। কিন্তু অভাব পূরণের উপকরণসমূহ সীমাবদ্ধ। তাই অসীম চাহিদা ও সীমাবদ্ধ সামর্থ্য এই দুই এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই হল মানব জীবনের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা।

অর্থনীতিবিদ পল স্যামুয়েলসন এর মতে, সম্পদের স্বল্পতা এবং বাছাই সমস্যা থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১। কোন কোন দ্রব্যসামগ্রী কী পরিমাণে উৎপাদন করা হবে?
২। কীভাবে উৎপাদন করা হবে?
৩। কার জন্য উৎপাদন করা হবে?

১। কোন কোন দ্রব্য সামগ্রী কী পরিমাণে উৎপাদন করা হবে : সীমাবদ্ধ উপকরণসমূহের কী পরিমাণ কাজে লাগিয়ে কতটা উৎপাদন করা হবে এটি একটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রত্যেক সমাজ তার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোন কোন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করা হবে এবং কী পরিমাণ উৎপাদন করা হবে তা প্রথমেই স্থির করে নেওয়ার সমস্যায় পড়ে।

২। কীভাবে উৎপাদন করা হবে : নির্বাচিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম কীভাবে উৎপাদন করা হবে তা নির্ধারণ করাও মানব জীবনের অন্যতম মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। একই দ্রব্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণে এবং উপকরণসমূহের বিভিন্ন অনুপাতের সংমিশ্রণে উৎপাদন করা যায়। যেমন, একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য কম মূলধন এবং বেশি শ্রম দ্বারা অথবা বেশি মূলধন ও কম শ্রম দ্বারা উৎপাদিত হতে পারে। কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা সুবিধাজনক হবে তা নির্ধারণ যেকোনো সমাজের দ্বিতীয় মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা।

৩। কার জন্য উৎপাদন করা হবে : কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই মানুষের অভাব পূরণ হয় না। উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বণ্টন করাও অপর একটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। মানব জীবনের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এগুলো হল ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মিশ্র অর্থব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা।

বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থা :

ধনতন্ত্র

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যক্তিমালিকানায় থাকে। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। সমাজের যাবতীয় কার্যকলাপ বেসরকারি পর্যায়ে, ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা সংঘটিত হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় প্রত্যেক উৎপাদনকারীর লক্ষ্য হল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা।

ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মূল্য ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূল্য ব্যবস্থায় চাহিদা এবং যোগানের ঘাত প্রতিঘাতে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ও দাম নির্ধারণ হয়। এ ব্যবস্থায় কোন দ্রব্য কতটা উৎপাদিত হবে তা উৎপাদন খরচ ও দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভোগের ক্ষেত্রেও ক্রেতা কোন দ্রব্য ক্রয় করবে তা ঐ দ্রব্যের দামের ওপর নির্ভর করে।

সমাজতন্ত্র : সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না। উৎপাদনের উপকরণ, উৎপাদন, বিনিয়োগ, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এবং পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়। কোন কোন দ্রব্য কী পরিমাণ উৎপন্ন করা হবে, কীভাবে বণ্টন করা হবে প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এই কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও উপকরণসমূহের বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফার কোনো স্থান নেই, তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগ দ্বারা অর্থনৈতিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত হয় না।

মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা : মিশ্র অর্থনীতি বা মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও উদ্যোগ এবং বেসরকারি উদ্যোগ ও স্বাধীনতা পাশাপাশি বিরাজ করে। মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। এ ব্যবসথায় কতকগুলো অর্থনৈতিক কাজের ভার বেসরকারি খাতের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং কতকগুলো অর্থনৈতিক কাজ সরকারি খাতে পরিচালনা করা হয়। মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, মুনাফা অর্জনের সুযোগ, ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। তবে এই স্বাধীনতা কখনো কখনো সীমিত আকারে থাকে। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ খাত, যেমন মৌলিক শিল্পসমূহ সরকারি খাতে পরিচালনা করা হয়।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা : আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান অনুসারে সমুদয় জাগতিক সম্পদের সামগ্রিক ও কল্যাণমুখী ব্যবস্থাপনাই ইসলামী অর্থব্যবস্থা। মানুষের কল্যাণের জন্য সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন, সুষ্ঠু বণ্টন ও ন্যায়সঙ্গত ভোগ নিশ্চিত করাই ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মানব জীবনের মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা হচ্ছে–

ক. সীমাহীন অভাব খ. সম্পদের স্বল্পতা
গ. দুষ্প্রাপ্যতা ঘ. বাহ্যিকতা

২। কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না?

ক. ধনতান্ত্রিক খ. মিশ্র অর্থনীতি
গ. সমাজতান্ত্রিক ঘ. ইসলামী অর্থনীতি

৩। পল স্যামুয়েলসনের মতে অর্থনৈতিক মূল সমস্যা হচ্ছে–

ক. মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ না হওয়া খ. সম্পদের স্বল্পতা এবং বাছাই সমস্যা
গ. ক্রমবর্ধমান খাদ্য ঘাটতি ঘ. উচ্চ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। এ ব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। অনেকের মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতি মিশ্র অর্থনীতি।

৪। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়–

i. উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যক্তিমালিকানায় থাকে
ii. উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে
iii. উৎপাদনকারীর লক্ষ্য হল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫। বাংলাদেশের অর্থনীতি মিশ্র অর্থনীতি; কারণ এ অর্থ ব্যবস্থায়–

i. সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা অর্জনের সুযোগ বিদ্যমান
ii. উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা স্বীকৃত
iii. ইসলামী অর্থব্যবস্থা পুরোপুরি স্বীকৃত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ইভা ক দেশের নাগরিক। তার দেশে বেসরকারি মালিকানায় কোনো শিল্প কারখানা নেই। কৃষি খামারগুলো পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত। সে খ দেশে বেড়াতে এসে নিজ দেশের বিপরীত চিত্র দেখতে পায়। সে জানতে পারে এদেশে উদ্যোক্তার লক্ষ্য হল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। ভোগের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। তবে সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্য আছে।

ক. ইভার দেশে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে?
খ. ক দেশে অর্থনৈতিক সমস্যার বিষয়ে কীভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
গ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে খ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্য নির্ণয় কর।
ঘ. খ দেশের উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতাকে তুমি কি সমর্থন করবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক ধারণা

অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় অর্থনীতিরও কতকগুলো মৌলিক ধারণা রয়েছে। অর্থনীতির সুষ্ঠু আলোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য এই মৌলিক ধারণা সমবন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নিচে অর্থনীতির কিছু মৌলিক ধারণা সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হল।

(ক) অভাব

অর্থনীতিতে অভাব বলতে যেকোনো দ্রব্যসামগ্রী পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে বোঝায়। এই দ্রব্যসামগ্রী বস্তুগত বা অবস্তুগত দুই প্রকারের হতে পারে। মানুষের সব অর্থনৈতিক কাজের মূলে রয়েছে অভাব। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন অভাবের সম্মুখীন হয় এবং এসব অভাব পূরণের জন্যই সে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়। মানুষের যদি অভাব না থাকত তবে অর্থনৈতিক কাজের প্রয়োজন হত না। তাই অভাব সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলির উৎস।

অভাবের শ্রেণীবিভাগ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভাবসমূহকে মোটামুটি তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা- ১. প্রয়োজনীয় অভাব, ২. আরামপ্রদ অভাব এবং ৩. বিলাসজাত অভাব।

১. **প্রয়োজনীয় অভাব :** মানুষের জীবনধারণের জন্য যে সকল দ্রব্য অপরিহার্য সে সকল দ্রব্যের অভাবকে প্রয়োজনীয় অভাব বলা হয়। যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি। প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

যথা- (ক) জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অভাব যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, (খ) দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় অভাব যেমন, পুষ্টিকর খাদ্য, ভালো বাসস্থান ইত্যাদি এবং (গ) অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয় অভাব যেমন, চা, পান, তামাক ইত্যাদির অভ্যাস।

২. **আরামপ্রদ অভাব :** কেবলমাত্র জীবন ধারণের জন্য নয় বরং জীবনের মান উন্নয়ন এবং আরামদায়ক জীবনযাপনের জন্য যেসব অভাব বোধ হয় তাকে আরামদায়ক দ্রব্যের অভাব বলে। যেমন– সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার, আরামদায়ক পোশাক, সুদৃশ্য বাসস্থান, উচ্চতর শিক্ষা এবং আরামদায়ক গাড়ি ইত্যাদি।

৩. **বিলাসজাত অভাব :** যেসব দ্রব্য মানুষ আত্মপ্রসাদ লাভ, মর্যাদা বৃদ্ধি বা জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করতে ব্যবহার করে সে সব দ্রব্যের অভাবকে বিলাসজাত অভাব বলা হয়। যেমন– প্রাসাদতুল্য বাড়ি, মূল্যবান অলংকার, মূল্যবান গাড়ি বা পোশাক, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ইত্যাদি।

(খ) দ্রব্য

সাধারণত 'দ্রব্য' বলতে কোনো বস্তুগত সম্পদকে বোঝায়। তবে যেসব বস্তুর উপযোগ আছে অর্থাৎ যে বস্তু মানুষের অভাব পূরণ করতে সক্ষম অর্থনীতির পরিভাষায় তাদেরকে 'দ্রব্য' বলা হয়। অর্থনীতিতে দ্রব্য বলতে বস্তুগত এবং অবস্তুগত উভয় প্রকার বস্তুকে বুঝায়। যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় ইত্যাদি বস্তুগত এবং নার্সের পরিচর্যা, গায়কের সুকণ্ঠ ইত্যাদি অবস্তুগত দ্রব্যকে সেবা বলা হয়। দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য হল তার উপযোগ।

দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ

দ্রব্যকে নিম্নরূপ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

১. **অবাধলভ্য দ্রব্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্য :** যে সমস্ত দ্রব্য বিনা পরিশ্রম ও বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাদেরকে 'অবাধ লভ্য দ্রব্য' বলা হয়। যেমন– আলো, বাতাস, নদীর পানি ইত্যাদি। অবাধলভ্য দ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি। অপরদিকে যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়ার জন্য মানুষকে পরিশ্রম করতে হয়, মূল্য প্রদান করতে হয়, তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলা হয়। যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, বই, চেয়ার ইত্যাদি। অর্থনৈতিক দ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় কম হয়।

২. **বস্তুগত দ্রব্য ও অবস্তুগত দ্রব্য :** যে সমস্ত দ্রব্য দেখা যায় এবং স্পর্শ করা যায় তাকে বস্তুগত দ্রব্য বলা হয়। যেমন– বই, কলম, চেয়ার, টেবিল। পক্ষান্তরে যে সমস্ত দ্রব্য দেখা যায় না বা স্পর্শ করা যায় না তাদেরকে অবস্তুগত দ্রব্য বলা হয়। যেমন– গায়কের সুকণ্ঠ, নার্সের সেবা, ব্যবসায়ের সুনাম ইত্যাদি। সাধারণত বস্তুগত দ্রব্যকে সামগ্রী এবং অবস্তুগত দ্রব্যকে সেবা বলে।

৩. ভোগ্য দ্রব্য ও উৎপাদক দ্রব্য : অভাব মেটাবার জন্য যে সমস্ত দ্রব্য সরাসরিভাবে ভোগ করা যায় তাকে ভোগ্যদ্রব্য বলে। যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেসব দ্রব্য প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করা যায় না কিন্তু ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে উৎপাদক দ্রব্য বলা হয়। যেমন, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি।

৪. ব্যক্তিগত দ্রব্য ও সরকারি দ্রব্য : মালিকানার ভিত্তিতে দ্রব্যকে ব্যক্তিগত দ্রব্য ও সরকারি দ্রব্য এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যে সমস্ত দ্রব্য ব্যক্তির মালিকানায় থাকে তাকে ব্যক্তিগত দ্রব্য বলে। যথা, নিজস্ব ঘর-বাড়ি, জামা-কাপড় ইত্যাদি। আর যে সমস্ত দ্রব্য সরকারের মালিকানাধীন থাকে এবং যা সমাজের সবাই ভোগ করতে পারে তাকে সরকারি দ্রব্য বলে। যেমন, রাস্তা-ঘাট, পার্ক, রেলপথ ইত্যাদি।

(গ) সম্পদ

সাধারণত সম্পদ বলতে ধন সম্পদ বা টাকা পয়সাকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে সম্পদ একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেসব দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগ আছে, যার যোগান সীমাবদ্ধ, যা মানুষের তৈরী এবং যার বিনিময় মূল্য আছে তাকেই অর্থনীতিতে সম্পদ বলে। বস্তুগত দ্রব্য যেমন, চেয়ার, টেবিল, ধান, পাট, কলম, ইত্যাদি হতে পারে, আবার অবস্তুগত সামগ্রী, যেমন, ব্যবসায়ের সুনাম সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য : অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্যকে সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হতে হলে তার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যেমন, ১. উপযোগ, ২. সীমাবদ্ধ যোগান, ৩. হস্তান্তর যোগ্যতা এবং ৪. বাহ্যিকতা।

১. উপযোগ : সম্পদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল উপযোগ। মানুষের অভাব মেটাবার ক্ষমতাকে উপযোগ বলা হয়। কোনো জিনিসকে সম্পদ হতে হলে অবশ্যই তার উপযোগ থাকতে হবে। উপযোগহীন দ্রব্যসামগ্রীর কোনো মূল্য নেই এবং এ জন্য তা সম্পদ হতে পারে না।

২. অপ্রাচুর্য বা সীমাবদ্ধ যোগান : সম্পদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল অপ্রাচুর্য বা সীমাবদ্ধ যোগান। সম্পদ হতে হলে দ্রব্যটির যোগান অবশ্যই সীমাবদ্ধ হতে হবে। যে দ্রব্য চাহিদার তুলনায় অঢেল এবং বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে সম্পদ বলা যায় না। যেমন, বাতাস, নদীর পানি, আলো, মরুভূমির বালু ইত্যাদি।

৩. হস্তান্তরযোগ্যতা : সম্পদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর হস্তান্তরযোগ্যতা। অর্থনীতিতে হস্তান্তরযোগ্যতা বলতে ঐ দ্রব্যের মালিকানা পরিবর্তনকে বুঝায়। যেমন, একখণ্ড জমির স্থানান্তরযোগ্যতা না থাকলেও তার মালিকানা পরিবর্তন করা যায় বলেই জমি সম্পদ। কিন্তু একজন কবির প্রতিভা বা গায়িকার কণ্ঠস্বর ইত্যাদি হস্তান্তরযোগ্য নয়। এজন্য এগুলো সম্পদ নয়।

৪. বাহ্যিকতা : সম্পদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল বাহ্যিকতা। সম্পদ হতে হলে তার বাহ্যিক অবস্থান থাকতে হবে। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ সম্পদ হতে পারে না। যেমন, মাতার স্নেহ, মমতা, কবির প্রতিভা, শিক্ষকের দক্ষতা ইত্যাদি হস্তান্তরযোগ্য নয় বলে এগুলোকে সম্পদ বলা যায় না। একমাত্র বাহ্যিক জিনিসের হস্তান্তরযোগ্যতা রয়েছে। যেমন, ঘরবাড়ি, পোশাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র ইত্যাদির বাহ্যিকতা আছে বলে এগুলো সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়।

(ঘ) উপযোগ

উপযোগ একটি মানসিক ধারণা। সাধারণ কথায় উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের উপকারিতাকে বোঝায়। তবে অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্য বা সেবার মধ্যে মানুষের অভাব মেটানোর যে ক্ষমতা থাকে তাকে উপযোগ বলে। যেমন, ভাত খেলে মানুষের ক্ষুধা মেটে, কাপড় পরলে লজ্জা নিবারণ, গান শুনলে মন ভালো লাগে ইত্যাদি দ্রব্য বা সেবা মানুষের বিভিন্ন অভাব মেটায়। মানুষ প্রকৃতি প্রদত্ত কোনো বস্তু বা পদার্থের রূপান্তর করে স্থানগত ও কালগত পরিবর্তন ঘটিয়ে এবং বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করতে পারে।

মোট উপযোগ : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে যে বিভিন্ন পরিমাণ উপযোগ পাওয়া যায় তাদের সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। মনে করি, কোনো ক্রেতা ক্রমান্বয়ে ৩টি কমলালেবু ক্রয় করে। সে প্রথমটি থেকে ৪.০০ টাকা, দ্বিতীয়টি থেকে ৩.০০ টাকা এবং তৃতীয়টি থেকে ২.০০ টাকার সমান উপযোগ লাভ করে। সুতরাং তার মোট উপযোগ হবে ৯.০০ টাকার সমান।

প্রান্তিক উপযোগ : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত একক ভোগ করে ভোগকারী যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করে তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। উপরিউক্ত কমলালেবুর ক্রেতা যদি অতিরিক্ত আর একটি কমলা অর্থাৎ চতুর্থ কমলা ক্রয় করে এবং ১.০০ টাকার সমান উপযোগ লাভ করে তবে তার প্রান্তিক উপযোগ হবে ১.০০ টাকার সমান। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে স্বাভাবিকভাবে দ্রব্যের ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হয়। কারণ অন্যান্য সকল অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন ভোক্তা একটি দ্রব্যের ভোগ ক্রমাগত বাড়াতে থাকলে অতিরিক্ত এককগুলো থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উপযোগ কমতে থাকে। এটাই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি। উল্লেখ্য, প্রান্তিক উপযোগ শূন্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হলে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হয়।

(ঙ) চাহিদা

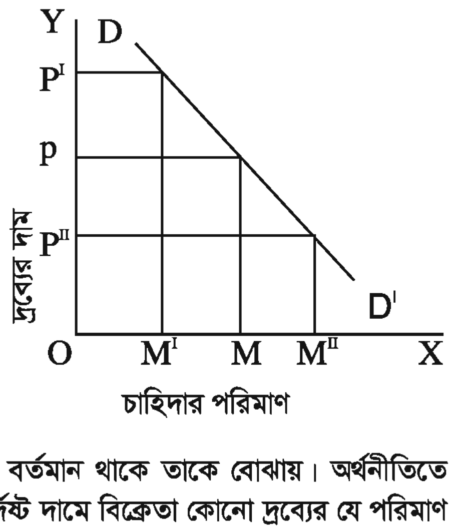
সাধারণ অর্থে চাহিদা বলতে কোনো জিনিস পাবার আকাঙ্ক্ষাকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। শর্তগুলো হল (১) আকাঙ্ক্ষা (২) সামর্থ্য (৩) অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা। সুতরাং কোনো জিনিস পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য ও জিনিসটি ক্রয় করার জন্য অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছাকে অর্থনীতির ভাষায় চাহিদা বলে। একজন ভিখারির গাড়ি কেনার চাহিদা থাকতে পারে না, যেহেতু তার ক্রয়ক্ষমতা নেই; তেমনি একজন কৃপণের ক্রয়ক্ষমতা থাকলেও অর্থ ব্যয় করে গাড়ি কেনার ইচ্ছে বা আকাঙ্ক্ষা নেই, তাই সেটা চাহিদা নয়।

চাহিদা বিধি

চাহিদার সাথে দামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণত কোনো পণ্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। পণ্যের দাম ও চাহিদার পরিমাণের এই যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক তাকে চাহিদা বিধি বলে। এই বিধি অনুযায়ী "অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে" পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা হ্রাস পায় এবং পণ্যের দাম হ্রাস পেলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য অবস্থা হল নিম্নরূপ–
(১) সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম (২) ক্রেতার আয় (৩) ক্রেতার অভ্যাস ও রুচি (৪) সময়

রেখাচিত্রের সাহায্যে চাহিদা বিধিটি প্রকাশ করা হল :

চিত্রে OX ভূমিতল অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY লম্ব অক্ষে দাম দেখানো হয়েছে। মনে করি OP দামে চাহিদার পরিমাণ OM, দাম হ্রাস পেয়ে OP^{II} হওয়ায় চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে OM^{II} হয়েছে। এখানে দ্রব্যের দাম হ্রাস পাওয়ার দরুন চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার দাম বৃদ্ধি পেয়ে OP^{I} হলে চাহিদার পরিমাণ কমে OM^{I} হয়েছে। এখানে দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। DD^{I} চাহিদা রেখা। এই রেখা দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক প্রকাশ করছে।



(চ) যোগান

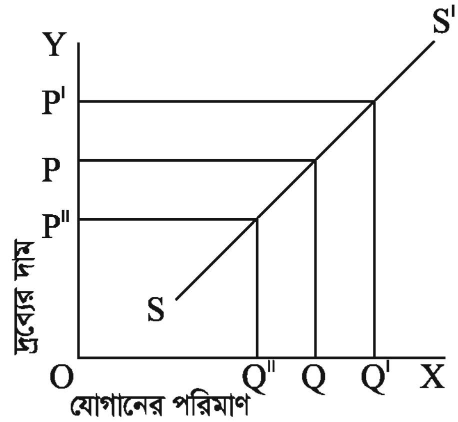
সাধারণত যোগান বলতে কোনো বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ যা বাজারে বর্তমান থাকে তাকে বোঝায়। অর্থনীতিতে যোগান শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বাজারে বিক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে অর্থনীতিতে তাকে সেই দ্রব্যের যোগান বলে।

যোগান বিধি

যে বিধি দামের সাথে দ্রব্যের যোগানের সম্পর্ক প্রকাশ করে তাকে যোগান বিধি বলে। যোগান অনুসারে "অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে", দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে যোগান বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে যোগান হ্রাস পায়। দাম ও যোগানের সম্পর্ক সব সময় সরাসরি ও সমমুখী। অর্থাৎ কোনো জিনিসের দাম বাড়লে বিক্রেতা ঐ দ্রব্যের যোগান বাড়াবে এবং দাম কমলে দ্রব্যটির যোগান কমাবে।

যোগানের এ নিয়মটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হল :

চিত্রে OX ভূমিতল অক্ষে যোগানের পরিমাণ এবং OY লম্ব অক্ষে প্রতি একক দ্রব্যের দাম দেখানো হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন OP তখন যোগানের পরিমাণ OQ^1 দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে OP^1 হলে যোগানের পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে OQ^1 হয়। অনুরূপভাবে দাম হ্রাস পেয়ে OP^{11} হলে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে OQ^{11} হয়। SS^1 হল যোগান রেখা। এই রেখা দাম ও যোগানের মধ্যে সরাসরি ও সমমুখী সম্পর্ক প্রকাশ করছে। অর্থাৎ দাম ও যোগান একই সঙ্গে বাড়ে এবং কমে।



(ছ) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সঞ্চয় : আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগে ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ব্যক্তি যে আয় করে তার সবটুকুই সে বর্তমানে ভোগের জন্য ব্যয় না করে একটি অংশ ভবিষ্যতে ব্যয় করার জন্য জমা রাখে। সঞ্চয় হল আয়ের সেই অংশ যা বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয়িত না হয়ে ভবিষ্যতের জন্য রক্ষিত হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তির মাসিক আয় ২,০০০ টাকা এবং মাসিক ব্যয় ১,৫০০ টাকা হলে তার মাসিক সঞ্চয় হল ৫০০ টাকা। আয় ও ভোগ পরস্পর সমান হলে সঞ্চয় করা যায় না। সঞ্চয় থেকে মূলধনের সৃষ্টি হয়। সঞ্চয় যেসব বিষয় বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল সেগুলো হল আয়, ব্যয়, দূরদৃষ্টি, পারিবারিক দায়িত্ববোধ, সামাজিক নিরাপত্তা, সুদের হার, বিনিয়োগের সুবিধা ইত্যাদি।

বিনিয়োগ : সঞ্চয়কে যখন উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োগ করা হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। অর্থনীতির ভাষায় কোনো নির্দিষ্ট সময়ে মজুদ মূলধন ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে যতটুক অতিরিক্ত মূলধন ও যন্ত্রপাতি যুক্ত করা হয় সেটাই বিনিয়োগ। ধরা যাক একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কারখানায় এক লক্ষ টাকার মূলধন সামগ্রী আছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেখানে আরও ২০ হাজার টাকার মূলধন দ্রব্য যোগ করা হলে ঐ নতুন সংযোজনকে বিনিয়োগ বলে। কোনো দেশের বিনিয়োগের পরিমাণ মূলত সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। সঞ্চিত অর্থ মূলধন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয় করলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ে। তাই সঞ্চয় হল বিনিয়োগের ভিত্তি।

(জ) বাজার

সাধারণ অর্থে 'বাজার' শব্দের দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না। বরং বাজার বলতে কোনো দ্রব্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় বিক্রয় করাকে বোঝায়। যেমন, পাটের বাজার, সোনার বাজার ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা একই স্থানে মিলিত হতে পারে অথবা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে পারে।

বাজারের কয়েকটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হল :

(১) এক বা একাধিক দ্রব্য
(২) এক দল ক্রেতা ও বিক্রেতা
(৩) এক বা একাধিক অঞ্চল বা সমগ্র পৃথিবী
(৪) ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ

(ঝ) জাতীয় উৎপাদন : একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা পরিমাপের জন্য মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) হিসেবে করা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত ১ বছরে একটি দেশ কর্তৃক চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে। দেশীয় উৎপাদনের উপকরণ যা বিদেশে নিয়োজিত থেকে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আবার বিদেশি উৎপাদনের উপকরণ যা দেশে নিয়োজিত থেকে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন গণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়না। যেমন, একজন বিদেশি বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে অবস্থান করে যে অর্থ উপার্জন করে তা বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে আমরা নীট জাতীয় উৎপাদন পাই।

মোট দেশজ উৎপাদন : জাতীয় উৎপাদন গণনার আর একটি বিকল্প পরিমাপ হল মোট দেশজ উৎপাদন (GNP)। সাধারণত ১ বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত দেশি এবং বিদেশি সকল উৎপাদনের উপকরণ কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে।

(ঞ) জাতীয় আয় : একটি দেশের জাতীয় আয় থেকেও আমরা সে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। একটি দেশের সকল উৎপাদনের উপকরণ যেমন, ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন থেকে যে আয় হয় তার সমষ্টি হল জাতীয় আয়। অতএব, খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফার যোগফলই হল জাতীয় আয়। আবার, মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ও পরোক্ষ কর বাদ দিয়ে আমরা নীট জাতীয় আয় বের করতে পারি।

মাথাপিছু আয় : কোনো দেশের মোট জাতীয় আয়কে এর মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

$$\text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

কোনো দেশের মাথাপিছু আয় হচ্ছে ঐ দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির নির্দেশক ও লোকের জীবনযাত্রার মান নির্ধারক।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। একটি নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্য ও সেবার অভাব অফুরন্ত কিন্তু সম্পদ সীমিত। অতএব, মানুষ অবশ্যই–

ক. সম্পদ বৃদ্ধি করবে　　খ. অভাব কমাবে
গ. বিকল্প দ্রব্য ও সেবা বেছে নেবে　　ঘ. দ্রব্য ও সেবার ভোগ কমাবে।

২। বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনকে বাংলার গৌরব বলা হলেও তাঁর সংগীত প্রতিভা সম্পদ নয়; কারণ–

i. তার গান মানুষের কোনো অভাব পূরণ করতে পারে না
ii. তার কণ্ঠস্বর অন্যজনকে দেওয়া যাবে না
iii. তার কণ্ঠসর অন্তর্নিহিত গুণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. ii
গ. i ও ii　　ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সুবা স্কুল থেকে ফিরে খুব বিরক্তি প্রকাশ করে, কারণ ঘরে বিদ্যুৎ নেই। মাকে সে আই.পি.এস-এর কথা বলাতে তিনি বললেন তার বাবা সময় পেলেই তা কিনবেন।

৩। সুবার আই.পি.এস এর আকাঙ্ক্ষাকে কী বলে?

ক. উপযোগ　　খ. সম্পদ
গ. চাহিদা　　ঘ. অভাব

৪। সুবার বাবা আই.পি.এস কিনতে গেলে যে শর্ত পূরণ করতে হবে–

i. অবশ্যই তার সামর্থ্য থাকতে হবে
ii. ক্রয় করার ইচ্ছে থাকতে হবে
iii. সুবার বাবাকে কৃপণ হতে হবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

৫। এ আই.পি.এস কী ধরনের দ্রব্য ?

ক. পারিবারিক খ. সামাজিক
গ. অর্থনৈতিক ঘ. উৎপাদক

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জসিম সাহেব বাজারে আম কিনতে গিয়ে যে আচরণ প্রদর্শন করে তা নিম্নের সূচিতে দেখানো হল।

প্রতিটি আমের দাম	ক্রয়ের পরিমাণ
১৫ টাকা	২৪ টি
১২ টাকা	৩৬ টি
১০ টাকা	৪০ টি
৫ টাকা	৪৮ টি

ক. এখানে যে বিধিটি প্রযোজ্য তা উল্লেখ কর।
খ. জসিম সাহেবের আম ক্রয়ের পরিমাণের সাথে প্রধান নিয়ামকটির সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
গ. উপরিউক্ত সূচি থেকে একটি চাহিদারেখা অংকন কর।
ঘ. চাহিদা রেখার আকৃতি এরূপ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২। সুজাতা কলেজ থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে যখন পাখা চালাতে গেল দেখল ঘরে বিদ্যুৎ নেই। তার মেজাজটা খুব খারাপ হল। তখন তার মনে হল যদি তাদের ঘরে আই.পি.এস বা জেনারেটর থাকত তবে এ অবস্থার সৃষ্টি হত না। কথাটা তার মায়ের কাছে বলতেই তিনি বললেন তোমার এ আকাঙ্ক্ষা ঠিক নয়। কারণ আমাদের দেশে অনেক মানুষ এত অভাবে আছে যাদের ঘরে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পাখা পর্যন্ত নেই। তাছাড়া তোমার বাবার এমন সামর্থ্য নেই যে, তিনি আই.পি.এস বা জেনারেটর কিনবেন।

ক. সুজাতার আই.পি.এস বা জেনারেটর পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কী?
খ. এ ধরনের আকাঙ্ক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
গ. সুজাতার জেনারেটর বা আই.পি.এস এর অভাব কোন শ্রেণীর অভাব বলে তুমি মনে কর।
ঘ. সুজাতার আকাঙ্ক্ষা পূরণে তার বাবার সামর্থ্য নেই – উক্তিটি চাহিদার ধারণার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৩। চাহিদা সূচি

দ্রব্যের দাম	দ্রব্যের চাহিদা
১০	১০ টি
৮	১৫ টি
৫	২০ টি

উল্লিখিত সূচির ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. চাহিদা কাকে বলে?
খ. উল্লিখিত সূচিতে দামের সাথে চাহিদার সম্পর্ক বর্ণনা কর।
গ. সূচিটিকে চাহিদা রেখায় রূপান্তরিত করে এর ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অন্যান্য অবস্থা আপরিবর্তিত থেকে ক্রেতার আয় এবং সময় পরিবর্তন হলে চাহিদার ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটবে তা ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উৎপাদন

ভূমিকা

সাধারণত উৎপাদন বলতে কোনো দ্রব্য সৃষ্টি করাকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে উৎপাদন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বস্তুত মানুষ কোনো পদার্থ সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। মানুষ শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত কোন বস্তু বা পদার্থের রূপান্তর বা স্থানান্তর ঘটিয়ে, আকার পরিবর্তন করে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং উৎপাদন মানে নতুন উপযোগ সৃষ্টি। যেমন, তাঁতী তুলা থেকে কাপড় তৈরি করে। এভাবে অতিরিক্ত বা নতুন উপযোগ সৃষ্টি হয়। অর্থনীতিতে উৎপাদনের অর্থ হল বস্তুর অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে সৃষ্ট এ উপযোগের বিনিময় মূল্যও থাকতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়যোগ্য হতে পারে।

উৎপাদনের উপাদানসমূহ

কোনো দ্রব্য বা সেবাকর্ম উৎপাদন করতে যে উপাদান বা উপকরণের সাহায্য প্রয়োজন হয় এগুলোকে উৎপাদনের উপাদান বলা হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা– ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন। নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হল :

১। **ভূমি :** ভূমি বলতে সাধারণভাবে ভূ-পৃষ্ঠকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে ভূমি বলতে উৎপাদনের সহায়ক সব রকমের প্রাকৃতিক সম্পদকে বোঝায়। যেমন, ভূ-পৃষ্ঠ, আবহাওয়া, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, মাটির উর্বরা শক্তি, খনিজদ্রব্য, বনভূমি, পানিসম্পদ, নদনদী, পাহাড় পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্গত। ভূমি উৎপাদনের আদি ও মৌলিক উপাদান।

২। **শ্রম : উ**ৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক কাজ ও সেবাকে অর্থনীতিতে শ্রম বলে। একজন কৃষক, জেলে বা রিকশা চালকের শারীরিক প্রচেষ্টা যেমন শ্রম, তেমনি একজন শিক্ষকের বা ডাক্তারের বুদ্ধিজাত প্রচেষ্টাও শ্রমরূপে গণ্য হয়। শ্রম বাদে কোনো উৎপাদন সম্ভব নয়। শ্রমের মর্যাদা সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত। ভূমির মতো শ্রমও উৎপাদনের একটি আদি ও মৌলিক উপাদান।

৩। **মূলধন :** সাধারণ অর্থে মূলধন বলতে ব্যবসায়ে নিয়োজিত টাকা পয়সাকে বুঝায়। অর্থনীতিতে মূলধন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত এবং যেগুলো সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলে। অর্থাৎ মূলধন হল উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। যেমন, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, কাঁচামাল ইত্যাদি। আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূলধনের অভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৪। **সংগঠন :** উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধনকে একত্রিত করে উৎপাদন কাজ পরিচালনাকে সংগঠন বলে। সংগঠন উৎপাদনের এমন একটি সক্রিয় উপকরণ যা উৎপাদন ক্ষেত্রে অন্যান্য উপকরণকে ক্রিয়াশীল করে তোলে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠকের নৈপুণ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাকেই ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করতে হয়।

সুযোগ ব্যয়

উৎপাদনের উপকরণগুলোর পরিমাণ সীমাবদ্ধ এবং এগুলোর বিকল্প ব্যবহার সম্ভব। যখন কোনো একটি উৎপাদনের উপকরণ একটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন অন্য ক্ষেত্রে এর দ্বারা যা উৎপাদন করা যেত, তা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় কোনো একটি পণ্যের উৎপাদনের দরুন অন্য যেসব পণ্য উৎপন্ন হতে পারল না তা প্রথম পণ্যের সুযোগ ব্যয়। সম্পদ ও সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণেই সুযোগ ব্যয় ধারণার উৎপত্তি। সুযোগ ব্যয় প্রকৃত হিসাব নয় বরং এটি একটি মানসিক হিসাবে। যেমন, ধরা যাক, কোনো একটি জমিতে ১০ কুইন্টাল ধান অথবা ৬ কুইন্টাল গম উৎপন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে কৃষক যদি ১০ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করতে মন স্থির করে তবে তাকে ৬ কুইন্টাল গম উৎপাদনের সুযোগ ত্যাগ করতে হয়। অতএব ১০ কুইন্টাল ধান উৎপাদনের সুযোগ ব্যয় হল ৬ কুইন্টাল গম। কিংবা ৬ কুইন্টাল গম উৎপাদন করলে ১০ কুইন্টাল ধান উৎপাদনের সুযোগ ত্যাগ করতে হয়। অতএব ৬ কুইন্টাল গম উৎপাদনের সুযোগ ব্যয় হল ১০ কুইন্টাল ধান।

শ্রম : শ্রমের যোগান

উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ উপার্জিত হয়, অর্থনীতিতে তাকে মজুরি বলে।

আর কোনো দেশের কর্মক্ষম ব্যক্তিরা বিভিন্ন মজুরিতে যে পরিমাণ শ্রম বিক্রি করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে সে দেশের শ্রমের যোগান বলে। একটি দেশের শ্রমের যোগান প্রধানত দুইটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যথা- (১) শ্রম সংখ্যা (২) শ্রমের দক্ষতা।

কোনো দেশের শ্রমের যোগান প্রধানত জনসংখ্যার ওপর নির্ভরশীল। তবে যে দেশের শ্রমিক যত বেশি দক্ষ সে দেশের শ্রমের যোগান তত বেশি।

শ্রম বিভাগ

আধুনিক বিশ্বে উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শ্রম বিভাগ। উৎপাদন পদ্ধতিতে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে শ্রমিকদের মধ্যে দক্ষতা অনুযায়ী কাজের একটি স্তর বা অংশের দায়িত্ব অর্পণ করাকে শ্রম বিভাগ বলে।

বৃহদায়তন শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল শ্রম বিভাগ। উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রমিক বিভিন্ন কাজ করে এবং দক্ষতা অর্জন করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শার্ট তৈরির কারখানায় শ্রম বিভাগের ফলে কেউ কাপড় সংগ্রহ করে, কেউ কাপড় কাটে, কেউ শার্টের কলার তৈরি করে, কেউ হাতা তৈরি করে, কেউ সংযোগ করে, কেউ ইস্ত্রি করে, কেউ সুতা কাটে, কেউ ভাজ করে, কেউ প্যাকেট করে। এভাবে প্রত্যেকের সহযোগিতায় একটি শার্ট তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়। শ্রম বিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা নিম্নরূপ :

শ্রম বিভাগের সুবিধা

শ্রম বিভাগের অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে। এ সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

১. **উৎপাদন বৃদ্ধি :** শ্রম বিভাগের ফলে উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের দামও কম হয়।

২. **দক্ষতা ও কর্মনৈপুণ্য বৃদ্ধি :** উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রম বিভাগ প্রবর্তনের ফলে একজন শ্রমিক কোনো একটি কাজ বার বার করতে থাকে। ফলে ঐ কাজে সে ক্রমান্বয়ে দক্ষ ও নিপুণ হয়ে ওঠে।

৩. **নতুন যন্ত্র আবিষ্কার :** শ্রম বিভাগের দরুন একটি বিশেষ যন্ত্রের সঙ্গে শ্রমিকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। এর ফলে এ ধরনের যন্ত্রের ক্ষেত্রে তার পক্ষে নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়।

৪. **বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার :** শ্রমবিভাগ যত বেশি মাত্রায় প্রবর্তিত হয়, উৎপাদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার তত সহজ হয়। শ্রম বিভাগের ফলেই আধুনিক যুগে কলকারখানায় নিত্যনতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

৫. **সময়ের সদ্ব্যবহার :** শ্রম বিভাগের ফলে একজন শ্রমিক একটিমাত্র কাজে নিয়োজিত থাকে। ফলে তাকে এক কাজ থেকে অন্য কাজে যেতে হয় না বলে সময়ের সদ্ব্যবহার হয়।

৬. **যন্ত্রপাতির সদ্ব্যবহার :** শ্রম বিভাগের দরুন একজন শ্রমিককে সবসময়ই একই যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে হয়। এ জন্য কোনো যন্ত্রই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে না। ফলে যন্ত্রপাতির সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়।

৭. **যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ বণ্টন :** শ্রম বিভাগের দরুন যে শ্রমিক যে কাজে দক্ষ তাকে সে কাজে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করা সম্ভব হয়। এর ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে তার শক্তির ও দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার ঘটে।

৮. **শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি :** শ্রম বিভাগের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে বলে বিভিন্ন শিল্পে অনেকগুলো কাজের মিল দেখা যায়। ফলে এক শিল্পের শ্রমিক সহজে অন্য শিল্পে কাজ পায়।

৯. **কর্মসংস্থান :** শ্রম বিভাগের ফলে কাজের সংখ্যা ও প্রকার বাড়ে। বৃহদায়তন কলকারখানায় নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এতে বেকারত্ব কমে।

১০. **শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি :** শ্রম বিভাগের ফলে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। ফলে তার মজুরি বাড়ে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

শ্রম বিভাগের অসুবিধা

শ্রম বিভাগ কোনো ত্রুটিমুক্ত উৎপাদন পদ্ধতি নয়। এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। এর অসুবিধাগুলো নিচে লিপিবদ্ধ করা হল :

১. **একঘেয়েমি সৃষ্টি :** শ্রম বিভাগের ফলে একজন শ্রমিককে সব সময় একই কাজ করতে হয়। ফলে কাজটি তার কাছে একঘেয়ে ও আকর্ষণহীন হয়ে পড়ে।

২. **সৃষ্টির আনন্দ নেই :** শ্রম বিভাগের ফলে শ্রমিক কোনো দ্রব্যের কেবলমাত্র একটি অংশ উৎপাদন করে। ফলে সে সম্পূর্ণ দ্রব্য তৈরির অপার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।

৩. **সাধারণ কর্মদক্ষতা হ্রাস :** শ্রম বিভাগের কারণে একজন শ্রমিককে সবসময়ই কোন একটি সুনির্দিষ্ট কাজ করতে হয়। ফলে ঐ কাজে তার দক্ষতা বাড়ে ঠিকই। তবে অন্যান্য কাজে তার সাধারণ কর্মদক্ষতা কমে যায়।

৪. **সাময়িক বেকারত্বের সৃষ্টি :** শ্রম বিভাগের দরুন কোনো শ্রমিক কেবলমাত্র একটি কাজ করতে শেখে। কোনো কারণে কাজটি হারালে সে অন্য কোনো কাজে নিযুক্ত হতে পারে না। ফলে হঠাৎ সে বেকার হয়ে পড়ে।

৫. **শ্রেণী সংগ্রামের উদ্ভব :** শ্রম বিভাগের ফলে সমাজ শ্রমিক ও মালিক– এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মালিকরা শ্রমিকদের বঞ্চিত ও শোষণ করতে চায়। শ্রমিকশ্রেণী টিকে থাকতে সংগ্রামে লিপ্ত হলে সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের উদ্ভব হয়।

৬. **পরিবেশ দূষণ :** শ্রম বিভাগের দরুন দেশে বহু রকম কলকারখানা গড়ে ওঠে। এগুলো তাদের পরিত্যক্ত অংশ ও আবর্জনা আশপাশের এলাকায় ফেলে। তাছাড়া কারখানা এলাকায় সংকীর্ণ ও জনাকীর্ণ বস্তি গড়ে ওঠে। এর ফলে পরিবেশ দূষিত হয়।

৭. **মানসিক উন্নতি ব্যাহত :** শ্রম বিভাগের ফলে একজন শ্রমিক বারবার একই কাজ কিংবা একই যন্ত্র পরিচালনা করে। এর ফলে তার মানসিক উন্নতি ব্যাহত হয় এবং দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

৮. **পারিবারিক জীবন বিপন্ন :** শ্রম বিভাগের দরুন কাজ সংক্ষিপ্ত ও সহজসাধ্য হয় বলে শিশু শ্রমের উদ্ভব হয়। শ্রম বিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে, তবে এর সুবিধাই বেশি। তাই উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রম বিভাগ প্রবর্তন করে এর অসুবিধাগুলো দূর করার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত।

মূলধন ও মূলধন গঠন

মূলধন হল উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। মানুষের শ্রমে উৎপন্ন পণ্য বা সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে পরবর্তী উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকেই মূলধন বলে। মূলধন গঠন বলতে মূলধন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বোঝান হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুলাংশে মূলধন গঠনের ওপর নির্ভরশীল। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের মূলধনের নীট বৃদ্ধিকে মূলধন গঠন বলে।

মূলধন গঠন কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করে

মূলধন গঠন প্রাথমিকভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল। সঞ্চিত অর্থ সুষ্ঠুভাবে বিনিয়োগ করলে মূলধন বৃদ্ধি হয়। মূলধন বৃদ্ধি প্রধানত তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যথা, (১) সঞ্চয়ের সামর্থ্য, (২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং (৩) বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা।

১। **সঞ্চয়ের সামর্থ্য :** মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ্য তার আয়ের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল। আয় যত বেশি হবে সঞ্চয়ের সামর্থ্য তত বেশি হবে। লোকের আয় যদি এমন হয় যে তাদের জীবন ধারণের ব্যয় নির্বাহের পরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে সঞ্চয় সম্ভবপর হয়। সুতরাং সঞ্চয়ের সামর্থ্যের ওপরই সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। গরিব দেশের লোকের আয় কম বলে তাদের সঞ্চয়ের সামর্থ্য কম।

২। **সঞ্চয়ের ইচ্ছে :** সঞ্চয়ের পরিমাণ কেবল সঞ্চয়ের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে না। সঞ্চয়ের ইচ্ছের ওপর বরং অধিক নির্ভর করে। এমন অনেক লোক আছে যাদের প্রচুর আয় থাকা সত্ত্বেও কোনো সঞ্চয় নেই, কেননা সঞ্চয়ের প্রতি তারা গুরুত্ব দেয় না। অথচ নিম্ন আয়ের লোক, যেমন, গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত লোক, ইচ্ছে থাকার কারণে সঞ্চয় করতে সক্ষম হন।

৩। **বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা :** কোনো দেশের সঞ্চয়ের পরিমাণ বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধার ওপরও নির্ভর করে। অবশ্য এর জন্য প্রথম প্রয়োজন হল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলা এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। দেশে যথেষ্ট সংখ্যক ব্যাংক, বীমা কোম্পানি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে জনসাধারণ সে সব ক্ষেত্রে অর্থ খাটানোর সুযোগ পায়। ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের সুযোগ সুবিধার অভাব থাকলে স্বাভাবিকভাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। পরিশেষে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকে সঞ্চয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে।

সংগঠন

উৎপাদনের চতুর্থ ও সর্বশেষ উপাদান হল সংগঠন। ভূমি, শ্রম, পুঁজি প্রভৃতি উপাদান একত্রীকরণ ও সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়াকে সংগঠন বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এদের মধ্যে সমন্বয় ও সংযোগ সাধন এবং সর্বোপরি ব্যবসার সব ঝুঁকি বহনসহ কার্যকরী তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাই হল সংগঠন।

সংগঠক

যে ব্যক্তি উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিচালনা করেন তিনিই সংগঠক। সংগঠককে উদ্যোক্তাও বলা হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠনের ভূমিকা

বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠন বা উদ্যোক্তাকে বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। নিচে সংগঠকের কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল :

১। **উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ :** সংগঠকের অন্যতম প্রধান কাজ হল কারবারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং নীতি নির্ধারণ করা। কোনো দ্রব্য/সেবা উৎপাদন করা হবে, কী পরিমাণ উৎপাদন করা হবে, কীভাবে উৎপাদন করা হবে প্রত্যেকটি বিষয়ে সংগঠককে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

২। **উপাদান সংগ্রহ ও সমন্বয় সাধন :** সংগঠকের অন্য একটি প্রধান কাজ হল উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। উৎপাদন শুরু করার জন্য জমি সংগ্রহ করা, কারখানার জন্য গৃহ নির্মাণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়, শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি কাজ সংগঠককেই করতে হয়।

৩। **উৎপাদন কাজ তত্ত্বাবধান :** সংগঠকের অন্যতম কাজ হল উৎপাদন কাজ তত্ত্বাবধান এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করা। কর্মচারীগণ তাদের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করছে কিনা সেদিকে নজর রাখা। বৃহদায়তন শিল্পে বেতনভুক্ত কর্মচারীকে পরিচালনার বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

৪। **ঝুঁকি গ্রহণ :** সংগঠকের সর্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ কাজ হল ব্যবসায়ের সকল প্রকার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করা। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপন্ন দ্রব্য বাজারজাতকরণের অনেক আগেই সংগঠককে ভবিষ্যৎ চাহিদার পূর্বাভাসের ভিত্তিতে উৎপাদন কাজ শুরু করতে হয়। কিন্তু মানুষের অভ্যাস, রুচি, প্রযুক্তি ইত্যাদি পরিবর্তনের ফলে চাহিদা হ্রাস পেতে পারে। এর ফলে প্রত্যাশিত মুনাফার পরিবর্তে বিরাট লোকসানও হতে পারে। তাই চাহিদার পরিবর্তনের ফলে যে লোকসান হতে পারে তার ঝুঁকি সংগঠককেই নিতে হয়।

৫। **বণ্টনের কাজ :** সংগঠককে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের আয় তাদের মাঝে বণ্টন করতে হয়। যেমন, জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরি, কাঁচামালের দাম, মূলধনের সুদ প্রভৃতি। এসব দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই সংগঠকের প্রাপ্য।

৬। **উদ্ভাবন :** ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য সংগঠককে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হয়। এ ছাড়া দ্রব্যের বাজার উদ্ভাবন করা সংগঠকের মুনাফা বাড়ানোর একটি অন্যতম উপায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উৎপাদনের উপাদান হচ্ছে–

ক. ৩ টি খ. ৪ টি
গ. ৫ টি ঘ. ৬ টি

২। নিচের কোনটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদন নয় –

(ক) কাঠ থেকে চেয়ার তৈরি (খ) বাড়িতে শখে বাগান করা
(গ) সিলেটের আনারস ঢাকায় আনয়ন (ঘ) একটি টেলিভিশন সেট মেরামত করা

৩। ঝুঁকি গ্রহণ করার অর্থ হল–

(ক) উৎপাদন কাজ তত্ত্বাবধান করা
(খ) লাভ বা লোকসানের অনিশ্চয়তা বহন করা
(গ) উপাদান সংগ্রহ ও সমন্বয় করা
(ঘ) শ্রমিক কর্মচারীদের পরিচালনা করা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রকিব একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে গত দশ বছর যাবত চাকরি করে আসছেন। তাঁর কাজ হচ্ছে শার্ট সেলাই করা। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ছোট একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে করছেন। কিন্তু এত মূলধন যোগান দেবে কে?

৪। রকিবের সর্বমোট সেলাই করার কাজটিকে অর্থনীতির পরিভাষায় কী বলা হয়?

ক. শ্রমের যোগান খ. শ্রম বিভাগ
গ. শ্রমের মর্যাদা ঘ. শ্রমের দক্ষতা

৫। মুলধন বৃদ্ধি নির্ভর করছে–

i. সঞ্চয়ের সামর্থ্য, সঞ্চয়ের ইচ্ছে ও বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা
ii. উৎপাদন ক্ষমতা, প্রযুক্তি ও সাংগঠনিক ক্ষমতা
iii. প্রাকৃতিক সম্পদ, কর্মনৈপুণ্য ও পণ্যের চাহিদা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নাজনীন বেগম ঝি এর কাজ করে ৫০০ টাকা বেতন পেতেন। ভাল বেতন পেয়ে, সে ঝি এর কাজ ছেড়ে একটি পোশাক তৈরির কারখানায় ১০০০ টাকা বেতনে চাকরি নেয়। তার কাজ শুধু শার্টের বোতাম লাগানো।

ক. নাজনীন বেগমের পোশাক তৈরির কারখানায় চাকরির সুযোগ ব্যয় কত?
খ. পোশাক উৎপাদনে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি ব্যাখ্যা কর।
গ. নাজনীন বেগমের পোশাক শিল্পের কাজ থেকে শ্রমবিভাগের সুবিধাগুলো চিহ্নিত কর।
ঘ. শুধু শার্টের বোতাম লাগানো নাজনীন বেগমের জন্য একঘেয়ে এবং নিরানন্দের; ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

ভূমিকা

প্রাচীন কালে প্রত্যেক ব্যক্তি বা পরিবার তার নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করত। তখন সমাজে সবাই ছিল স্বনির্ভর। মানুষের প্রয়োজনও ছিল সীমিত। কালক্রমে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের বহুমুখী অভাব দেখা দিল। এই বহুমুখী অভাব মেটানো কোনো মানুষের একার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে মানুষ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন থেকেই মানুষ নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন না করে নিজের দক্ষতা ও পারদর্শিতা অনুযায়ী একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন করতে শুরু করে। যেমন, চাষী খাদ্য উৎপাদন করে, জেলে মাছ ধরে, তাঁতি কাপড় বোনে, কুমার হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করে। এ অবস্থায় মানুষের অভাব মেটানোর জন্য প্রয়োজন দেখা দিল দ্রব্য বিনিময়ের। দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমেই একজন মানুষ তার নিজের উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিনিময়ে অন্যের উৎপাদিত দ্রব্য সংগ্রহ করে তার প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ পায়। এভাবে দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু হয়।

দ্রব্য বিনিময় প্রথা

প্রাচীনকালে মানব সমাজে কোনো টাকাকড়ির প্রচলন ছিল না। তখন সরাসরি দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য একটি দ্রব্যের বিনিময় হত। যেমন, জেলে তার মাছের বিনিময়ে কৃষকের কাছ থেকে চাল, তাঁতি কাপড়ের বিনিময়ে কামারের কাছ থেকে ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি সংগ্রহ করত। এভাবে দ্রব্যের পরিবর্তে সরাসরি বিনিময়কে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলা হয়।

দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাসমূহ

দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্য বিনিময়ে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। নিম্নে সংক্ষেপে সেগুলোর বিবরণ দেওয়া হল :

১। **অভাবের অসামঞ্জস্যতা :** দ্রব্য বিনিময়ের প্রধান অসুবিধা হল দ্রব্য বিনিময়কারীদের অভাবের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা। বিভিন্ন লোকের মধ্যে অভাবের সামঞ্জস্য খুঁজে বের করা বেশ কষ্টকর ছিল। যেমন, কোনো একজন জেলে মাছের পরিবর্তে চাল চায়। কিন্তু যার চাল আছে সে মাছ না চেয়ে বরং কাপড় চায়। তাহলে জেলেকে এমন একজন গ্রাহক খুঁজতে হবে যার চাল আছে এবং সে মাছের সাথে চাল বিনিময় করতে চায়। বাস্তব ক্ষেত্রে এ ধরনের লোক খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য।

২। **দ্রব্যের অবিভাজ্যতা :** দ্রব্য বিনিময়ের অন্যতম অসুবিধা হল দ্রব্যের অবিভাজ্যতা। এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায় না। যেমন, একজন লোকের শার্টের প্রয়োজন। কিন্তু তার গরু ছাড়া বিনিময় করার মতো আর কিছুই নেই। স্বভাবতই সে গরুর বিনিময়ে শার্ট পেতে চাইবে। কিন্তু গরুর মূল্য শার্টের মূল্যের চাইতে অনেক বেশি। এমতাবস্থায় শার্টের অভাব পূরণ করতে হলে গরুটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে এক অংশের বিনিময়ে সে শার্ট পেতে পারে। কিন্তু এটি সম্ভব নয়। কারণ গরু অবিভাজ্য।

৩। **মূল্য পরিমাপের অসুবিধা :** দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নির্ধারণের জন্য কোন সাধারণ পরিমাপক ছিল না। এ অবস্থায় বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য নির্ধারণ কঠিন হয়ে পড়ে। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক দ্রব্যের সাথে অন্যান্য দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন বিনিময় হার থাকায় মূল্য পরিমাপের কোন সাধারণ মানদণ্ড ছিল না।

৪। **সঞ্চয়ের অসুবিধা :** দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় সঞ্চয় করতে হলে সরাসরি দ্রব্য মজুদ করেই সঞ্চয় করতে হত। কিন্তু অধিকাংশ দ্রব্যই পচনশীল। অক্ষত অবস্থায় সেগুলো বেশি দিন সঞ্চয় করে রাখা যেত না। তাই ইচ্ছে ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সঞ্চয় করতে জনসাধারণকে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত।

৫। **ঋণ পরিশোধের অসুবিধা :** দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় ঋণ পরিশোধেও যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি হত। এ ব্যবস্থায় দ্রব্যের মাধ্যমে ঋণ প্রদান বা গ্রহণ করতে হত। ফলে ঋণ পরিশোধের সময়ও ঠিক যে জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করেছিল অবিকল সেই জাতীয় দ্রব্যের ফেরত সম্ভব ছিল না। তাই দ্রব্য বিনিময় প্রথায় ঋণ লেনদেনে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত।

এসব অসুবিধার কারণে কালক্রমে দ্রব্য বিনিময় প্রথা অচল হয়ে পড়ে এবং পরিত্যক্ত হয়। বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম হিসেবে সমাজে অর্থের প্রচলন শুরু হয়।

অর্থের আবিষ্কার

দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূরীকরণে অর্থের প্রচলন হয়। প্রাচীন সমাজে বিভিন্ন দ্রব্য যেমন, গরু, ছাগল, চাল সকলেরই প্রয়োজন এমন দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চালু ছিল। পরবর্তী সময়ে কড়ি অর্থ হিসেবে সমাজে চালু হয়। আফ্রিকার অশিক্ষিত লোকের সমাজে নানান রকম চুড়ি ও অলংকার অর্থ হিসেবে গণ্য ছিল। আমেরিকায় ব্যবহৃত হয়েছিল তামাক পাতা। কিছু কাল পূর্বে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা হিসেবে চালু ছিল। আধুনিক যুগে কাগজের মুদ্রাই সব দেশে প্রচলিত। সে সঙ্গে ধাতব মুদ্রাও চালু রয়েছে।

অর্থ

অর্থ হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম। সুতরাং যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য এবং ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে আইনসিদ্ধ তাই অর্থ। অর্থনীতিবিদ সেয়ার্স এর মতে, "যে বস্তু দেনা-পাওনা মেটাবার কাজে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় তাকেই অর্থ বলে।" অর্থনীতিবিদ কোল বলেন, "অর্থ এমন একটি জিনিস যা সাধারণভাবে সবাই দেনা-পাওনা মেটাতে এবং ঋণ পরিশোধ করতে ব্যবহার করে।"

অর্থের কার্যাবলি

বর্তমান যুগে অর্থ নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। অর্থের কার্যাবলি নিচের ছত্র দুইটির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় :
"অর্থের কার্য হল চার
মাধ্যম, পরিমাপক, মান ও ভাণ্ডার।"

১। **বিনিময়ের মাধ্যম :** অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সব দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম অর্থের বিনিময়ে লেনদেন হয়। বিনিময়ের সবচেয়ে সহজ ও গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হল অর্থ। অর্থ প্রবর্তনের ফলে দ্রব্য বিনিময় প্রথার সব সমস্যা দূর হয়েছে।

২। **মূল্যের পরিমাপক :** অর্থ মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে। কোনো পণ্যের বা সেবাকর্মের মূল্য অর্থের মাধ্যমেই হিসেব করা হয়। মিটার, মিলিমিটার, সেন্টিমিটার দিয়ে যেমন কোনো বস্তু বা জিনিসের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ পরিমাপ করি, তেমনি অর্থ দিয়ে কোনো দ্রব্য ও সেবার মূল্য অতি সহজেই নির্ণয় করতে পারি।

৩। **স্থগিত লেনদেনের মাধ্যম :** অর্থ মানুষের ভবিষ্যতে দেনা পাওনার হিসাব নিকাশে সাহায্য করে। আধুনিক সমাজে আর্থিক লেনদেনের বেশির ভাগই চলে ঋণের ভিত্তিতে। সব দেনা-পাওনার হিসাব অর্থের মাধ্যমে করা হয়। কারণ, অর্থের মূল্য সহজে পরিবর্তিত হয় না। এ জন্য অর্থকে স্থগিত লেনদেনের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৪। **সঞ্চয়ের বাহন :** অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে। দ্রব্য সামগ্রীর মাধ্যমে উদ্বৃত্ত আয় সঞ্চয় করতে গেলে নানা ঝুঁকি ও বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। অধিকাংশ পণ্যই ক্ষণস্থায়ী ও পচনশীল। অন্যদিকে, অর্থের মূল্য অপেক্ষাকৃতভাবে স্থির। তাই অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করা নিরাপদ ও সুবিধাজনক। অর্থই সঞ্চয়ের উত্তম বাহন।

৫। **ঋণের ভিত্তি :** অর্থ ঋণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র লেনদেন পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, চেক, ব্যাংক ড্রাফট, হুন্ডি ইত্যাদি। আমানত হিসেবে জমাকৃত নগদ অর্থের ভিত্তিতেই ব্যাংক এ সকল ঋণপত্র প্রচলন করে থাকে। সুতরাং অর্থই হল সকল প্রকার ঋণের ভিত্তি।

৬। **তারল্যের মান :** অর্থ তারল্যের মান হিসেবেও কাজ করে। অর্থের তারল্য যেকোনো বস্তু অপেক্ষা বেশি। অর্থ দ্বারা যেকোনো দ্রব্য যেকোনো সময় ক্রয় করা যায়। অর্থাৎ অর্থকে যেকোনো সময় অন্য দ্রব্যে রূপান্তরিত করা যায়।

উপরিউক্ত কার্যাবলি ছাড়াও অর্থের আরো কার্যাবলি রয়েছে। যেমন, অর্থ সামাজিক মর্যাদা ও নিশ্চয়তার প্রতীক, অর্থ মানুষের তৃপ্তি বৃদ্ধি করবার উপায় ইত্যাদি। সব মিলিয়ে আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থ বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে

ব্যাংক

ব্যাংক হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা জনসাধারণের গচ্ছিত অর্থ জমা রাখে এবং ঋণ গ্রহীতাদের বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসাধারণ তাদের আয় বা উদ্বৃত্ত অর্থ নিরাপদে সঞ্চয়ের জন্য ব্যাংকে জমা রাখে। কোনো কোনো জমা থেকে জনসাধারণ সুদ হিসেবে আয়ও করে। ব্যাংক এই গচ্ছিত অর্থ ব্যবসায়ী ও ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ দেয় এবং এ ধরনের ঋণের টাকার ওপর অধিক হারে সুদ আদায় করে। এ জন্য ব্যাংককে ঋণের কারবারী বলা হয়। এই মুনাফার ওপর ভিত্তি করে ব্যাংক টিকে আছে।

ব্যাংকের প্রকারভেদ : উদ্দেশ্য ও কার্যাবলির ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহ প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) কেন্দ্রীয় ব্যাংক (২) বাণিজ্যিক ব্যাংক (৩) বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

১। **কেন্দ্রীয় ব্যাংক :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাংক দেশের অর্থ বাজার, মুদ্রা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য ব্যাংকসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে বলেই এর নাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক। দেশের কাগজী মুদ্রা প্রচলনের একমাত্র অধিকারী হল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। **বাণিজ্যিক ব্যাংক :** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বাণিজ্যিক লাভের উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, উত্তরা, পূবালী, ন্যাশনাল, ইসলামী ব্যাংক ইত্যাদি বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক।

৩। **বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান :** বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে এবং বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশেষ ব্যাংক আছে। যেমন, শিল্প উন্নয়নের জন্য শিল্প ব্যাংক, কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষি ব্যাংক, গৃহনির্মাণ ঋণ মঞ্জুরির জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ দান সংস্থা, সমবায় ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

আধুনিক অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণ-কেন্দ্র স্বরূপ। এই ব্যাংকের কার্যাবলি নিচে বর্ণনা করা হল :

১। **আমানত গ্রহণ করা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হল জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা। ব্যাংকের আমানত সাধারণত তিন প্রকার - (ক) চলতি আমানত, (খ) সঞ্চয়ী আমানত ও (গ) স্থায়ী আমানত। যে আমানতের অর্থ যে কোনো সময় তোলা যায় তাকে চলতি আমানত বলে। এই আমানতের জন্য ব্যাংক আমানতকারীকে কোনো সুদ প্রদান করে না। সঞ্চয়ী আমানত থেকে সপ্তাহে এক বার বা দুই বার অর্থ উঠানো যায়। এর জন্য ব্যাংক আমানতকারীকে অল্প সুদ প্রদান করে। আর যে আমানত একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার পর তোলা যায় তাকে স্থায়ী আমানত বলে। স্থায়ী আমানতের জন্য আমানতকারীকে উচ্চ হারে সুদ প্রদান করা হয়।

২। **ঋণদান করা :** ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হল ঋণ প্রদান করা। জনসাধারণের কাছ থেকে গৃহীত অর্থের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ গচ্ছিত রেখে অবশিষ্ট অর্থ ব্যাংক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদেরকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। ব্যাংক সাধারণত মূল্যবান সম্পত্তি বন্ধক রেখে এই ঋণদান করে।

৩। **বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি :** বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ হল বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা। বর্তমানকালে নোট প্রচলন করার ক্ষমতা কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের থাকলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ চেক, ব্যাংক ড্রাফট, হুন্ডি, ভ্রমণকারীর ঋণপত্র ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে। উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ লেনদেনই এসব বিনিময়ের মাধ্যম দ্বারা সম্পন্ন হয়।

৪। **হুন্ডি বাট্টা করা :** বাট্টা ধার্য করে হুন্ডি বা বিনিময় বিল ভাঙ্গিয়ে দেওয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই টাকার প্রয়োজন হলে হুন্ডির মালিক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে হুন্ডি ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা পেতে পারে। এই কাজে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

৫। **অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা :** বাণিজ্যিক ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতাদের দেনাপাওনা নিষ্পত্তিতে সাহায্য করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমেই বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশ কাজ পরিচালিত হয়।

৬। **অর্থ স্থানান্তর করা :** বাণিজ্যিক ব্যাংক নিরাপদে এবং দ্রুত টাকা স্থানান্তর করে। চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, ভ্রমণকারীর চেক, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার প্রভৃতি সহজ উপায়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণে আমাদের সহায়তা করে।

৭। **অন্যান্য :** উপরিউল্লিখিত কার্যাবলি ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের সুবিধার্থে আরও অনেক কার্যাবলি সম্পাদন করে গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসেবে। যেমন–

(ক) বন্ড, স্টক, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ক্রয়-বিক্রয় করে।

(খ) বাড়ি ভাড়া, আয়কর, বীমার প্রিমিয়াম, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল প্রভৃতি পরিশোধ করে।

(গ) মূল্যবান অলংকার, দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

যে ব্যাংক অন্যান্য সমস্ত ব্যাংকের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে, দেশের মুদ্রা প্রচলন ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকারের প্রতিনিধি ও আর্থিক পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে নিচে তা বর্ণনা করা হল :

১। **নোট প্রচলন করা :** বর্তমান যুগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাগজী নোট প্রচলনের একমাত্র অধিকারী। দেশের কাগজী মুদ্রার প্রচলন ও মুদ্রা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রাই দেশের 'বিহিত মুদ্রা' এবং এর অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্য যাতে স্থিতিশীল থাকে তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

২। **সরকারের ব্যাংক :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিনা খরচে বিভিন্ন উৎস থেকে সরকারের পাওনা আদায় এবং বিভিন্ন খাতে সরকারের দেনা পরিশোধ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের হিসাব-নিকাশ করে ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এই ব্যাংক সুদ ছাড়া সরকারের অর্থ জমা রাখে এবং প্রয়োজন বোধে সরকারকে ঋণ দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে আর্থিক ব্যাপারে পরামর্শ দেয়।

৩। **অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য ব্যাংকে তাদের মূলধনের নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই জমার পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

৪। **ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হল ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ দেশের মোট মুদ্রার যোগানের অন্তর্ভুক্ত। অতিরিক্ত ঋণ সৃষ্টির দরুন মোট অর্থের পরিমাণ যদি বেড়ে যায়, তাহলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মোট মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যথাসম্ভব সমতা বিধান করে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করে। মুদ্রা সংকোচন ও মুদ্রাস্ফীতি এড়ানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে।

৫। **ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সর্বশেষ পর্যায়ের ঋণদাতা হিসেবে কাজ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যখন আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয় এবং অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ গ্রহণে ব্যর্থ হয় তখন বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ দিয়ে আর্থিক সংকটের হাত থেকে রক্ষা করে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল।

৬। **নিকাশঘর :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের পারস্পরিক দেনাপাওনার ক্লিয়ারিং হাউজ বা নিকাশ ঘর হিসেবে কাজ করে। দৈনন্দিন ব্যবসা বাণিজ্য চেক আদান প্রদানের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে দেনা-পাওনার সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে চেকের মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক দেনাপাওনা মিটিয়ে থাকে।

৭। **বৈদেশিক বিনিময়ের হার রক্ষা :** অন্যান্য দেশের মুদ্রার সাথে দেশের মুদ্রার নির্দিষ্ট বিনিময় হার কেন্দ্রীয় ব্যাংক রক্ষা করে। এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে।

৮। **উন্নয়নমূলক কার্যাবলি :** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা, জাতীয় বাজেট প্রণয়নে সাহায্য করা ইত্যাদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ।

৯। **অন্যান্য কার্যাবলি :** উপরিউক্ত কার্যাদি ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরো অনেক কাজ সম্পন্ন করে থাকে। যেমন, প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজ দেশে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু এবং উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করে।

বিশেষ ঋণদানকারী সংস্থাসমূহ বা বিশেষ ধরনের ব্যাংকসমূহ

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশে বিশেষ ঋণদানকারী সংস্থা আছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল :

ক) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

খ) বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

গ) বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ সংস্থা

ঘ) গ্রামীণ ব্যাংক

ক) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক : স্বাধীনতা লাভের পর পরই বাংলাদেশে অবস্থিত সাবেক কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গঠিত হয়। এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হল ২০ কোটি টাকা এবং আদায়কৃত মূলধনের পরিমাণ হল ১৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি নিচে দেওয়া হল :

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে। হালের বলদ, বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, পানি সেচের জন্য শক্তিচালিত পাম্প, গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন প্রভৃতি কাজের জন্য কৃষি ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে। বর্তমানে কৃষি কাজ ছাড়াও হাঁস-মুরগি ও পশু পালন, মৎস্য উৎপাদন, গুঁটি পোকার চাষ, ফলের চাষ, ফুলের চাষ ও কুটির শিল্পের জন্যও এই ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে কৃষি ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

খ) বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক : দেশে শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে সাবেক শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক ও ইকুইটি পার্টিসিপেশন ফান্ড নিয়ে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের প্রধান কাজ হল সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই শিল্প স্থাপনে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করা। এই ঋণ সর্বাধিক ২০ বছরের জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে। নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর আধুনিকীকরণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য ঋণ প্রদান করা শিল্প ব্যাংকের দায়িত্ব। এছাড়াও শিল্প ব্যাংক সম্ভাব্য ঋণ গ্রহীতাদের কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

গ) বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা : স্বাধীনতা লাভের পর সাবেক গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থার সকল দায় ও সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার অনুমোদিত মূলধন হল ১০ কোটি টাকা। এ মূলধনের সবটাই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত।

বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থার প্রধান কাজ হল শহরাঞ্চলে আবাসিক গৃহনির্মাণের জন্য ঋণ প্রদান করা। অতীতে এই সংস্থার ঋণদান কার্যক্রম কেবল বড় বড় শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ের শহরেও এই সংস্থার ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।

ঘ) গ্রামীণ ব্যাংক : গ্রামীণ ব্যাংক একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটি পল্লীর ভূমিহীন পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান।

গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি

(১) দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের বিনা জামানতে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান।

(২) গ্রামীণ মহাজনদের শোষণ হতে গরিব মানুষকে রক্ষা করা।

(৩) বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য স্ব-কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

(৪) সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। যে কোনো সময় অর্থ উত্তোলন করা যায়–

ক. চলতি আমানত
খ. সঞ্চয়ী আমানত
গ. স্থায়ী আমানত
ঘ. মেয়াদী আমানত থেকে

২। দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা হচ্ছে–

i. ক্রেতা বিক্রেতার অভাবের অসামঞ্জস্যতা
ii. দ্রব্য মূল্য নির্ধারণের সাধারণ পরিমাপকের অভাব
iii. অধিকাংশ দ্রব্য পচনশীল বিধায় সঞ্চয় করা অসম্ভব

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে। দেশে মুদ্রা প্রচলন ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকারের প্রতিনিধি ও আর্থিক পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক জাতীয় বাজেট প্রণয়নে সাহায্য করে থাকে।

৩। জাতীয় বাজেট প্রণয়নে সাহায্য করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোন ধরনের কাজ ?

ক. গবেষণামূলক কাজ
খ. সরকারের ব্যাংক
গ. উন্নয়নমূলক কাজ
ঘ. অন্যান্য কাজ

৪। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক–

ক. বিভিন্ন উৎস থেকে সরকারের পাওনা আদায় করে
খ. আর্থিক সংকটে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ দান করে
গ. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধকল্পে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করে
ঘ. বিভিন্ন ব্যাংকের পারস্পরিক দেনা পাওনা মিটিয়ে থাকে

৫। নিচের কোনটি বিশেষায়িত ব্যাংক

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক
খ. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক
গ. সোনালী ব্যাংক
ঘ. গ্রামীণ ব্যাংক

সৃজনশীল প্রশ্ন

মিসেস আজিম এর একটি বুটিক শপ আছে। প্রথমে নিজের ক্ষুদ্র মূলধন নিয়ে তিনি এ ব্যবসা শুরু করেন। পরে তিনি গ্রামীণ ব্যাংক থেকে কোনো জামানত ছাড়া ঋণ নেন। যখন এ ব্যবসায় বেশ প্রসার লাভ করেন, তখন তিনি বাণিজ্যিক ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব খুলেছেন। তিনি তার ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য প্রয়োজনে শিল্প ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার আশ্বাসও পেয়েছেন।

ক. চলতি হিসাব কী?
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।
গ. মিসেস আজিম এর ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য শিল্প ব্যাংক কীভাবে অবদান রাখতে পারে বলে তুমি মনে কর।
ঘ. ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে কোনো জামানত ছাড়া ব্যাংক কোনো ঋণ দিতে পারে না, এ আলোকে গ্রামীণ ব্যাংকের নীতি ও কার্যক্রমের সফলতা মূল্যায়ন কর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সরকারি আয় ব্যয়

ভূমিকা

আধুনিক যুগে রাষ্ট্রকে বহুবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয়। রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হল জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা। এ ছাড়াও দেশ রক্ষা, প্রশাসন পরিচালনা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং জনকল্যাণমূলক কাজ প্রভৃতিও রাষ্ট্র সম্পাদন করে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরূপ বহুবিধ কার্য সম্পাদন করতে রাষ্ট্রের বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এ ব্যয় মেটাতে রাষ্ট্র করের হার বৃদ্ধি করে, নতুন নতুন কর আরোপ করে এবং কর বহির্ভূত আয়ের ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

নিচে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎসসমূহের বিবরণ দেওয়া হল :

১। **বাণিজ্য শুল্ক :** বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হল দেশের আমদানি ও রপ্তানিকৃত দ্রব্যের ওপর ধার্যকৃত বাণিজ্য শুল্ক। অর্থাৎ বিদেশ থেকে বাংলাদেশ যেসব দ্রব্য আমদানি করে, আমদানিকৃত সে সব দ্রব্যের ওপর সরকার আমদানি শুল্ক ধার্য করে। আবার যেসব দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে তার ওপর সরকার রপ্তানি শুল্ক ধার্য করে।

২। **আবগারি শুল্ক :** দেশে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর ধার্যকৃত করকে আবগারি শুল্ক বলা হয়। বাংলাদেশ সাধারণত চা, তামাক, চিনি, সিগারেট, বিড়ি, দিয়াশলাই, কেরোসিন, স্পিরিট, ওষুধ, মদ, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি দ্রব্যের ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য করে। সাম্প্রতিক কালে আবগারি শুল্ক ও বিক্রয় কর মিলিয়ে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) চালু করা হয়েছে।

৩। **আয়কর ও করপোরেশন কর :** বাংলাদেশ সরকারের আয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হল আয়কর ও করপোরেশন কর। জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয়ের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আয়কর বলে। তাছাড়া, বিভিন্ন কোম্পানির আয়ের ওপর করপোরেশন কর ধার্য করা হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে কৃষি আয়করকে আয়করের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

৪। **বিক্রয় কর :** দেশীয় বাজারে পণ্য বিক্রয়ের ওপর ধার্য করকে বিক্রয় কর বলে। এই কর বিক্রয়কারীদের ওপর ধার্য করা হলেও ক্রেতাদেরকেই এই করের বোঝা বহন করতে হয়। এটি একটি পরোক্ষ কর।

৫। **মূল্য সংযোজন কর :** ১৯৯১-৯২ সাল থেকে আবগারি শুল্ক ও বিক্রয় করকে একত্রীভূত করে অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও মূল্য সংযোজন কর চালু করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর থেকে গত কয়েক বছরের কর সংগ্রহের পরিমাণ প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬। **ভূমি রাজস্ব :** বাংলাদেশ সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস হল ভূমির মালিকদের ওপর ধার্যকৃত ভূমি রাজস্ব কর। সরকার ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেওয়ার ফলে এই খাতে সরকারের আয় যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

৭। **রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ :** যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে সেখান থেকে সরকারের কিছু আয় হয়।

৮। **ডাক, তার ও দূরালাপনী :** অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের ডাক, তার ও দূরালাপনী সরকারের আয়ের একটি বিশেষ উৎস।

৯। **রেলওয়ে :** বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম আয়ের উৎস হল রেলওয়ে। রেলওয়েতে যাত্রীবহন ও দ্রব্যসামগ্রী পরিবহনের ভাড়া বাবদ সরকারের আয় হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার এই খাতে লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে।

১০। **স্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেশন :** বিভিন্ন দলিলপত্র ও মামলা মোকদ্দমার আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য স্ট্যাম্প ও কোর্ট ফী ব্যবহার করা হয়। এগুলো সরকারের আয়ের একটি উৎস।

১১। **বন :** দেশের বন সরকারি সম্পত্তি। বনের প্রচুর কাঠ, বাঁশ, মধু ও অন্যান্য বনজ সম্পদ বিক্রয় করে আমাদের সরকার যথেষ্ট আয় করে।

১২। **মোটর ও যানবাহন কর :** সরকার মোটরগাড়ি ও অন্যান্য যানবাহনের ওপর কর ধার্য করে যথেষ্ট আয় করে থাকে।

১৩। **মুদ্রা ও টাকশাল :** বাংলাদেশ সরকার মুদ্রা ও টাকশাল থেকে প্রচুর আয় করে থাকে। আয়ের উপরিউক্ত উৎস ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার আরো কতকগুলো উৎস থেকে আয় করে থাকে। যেমন, সেতুর টোল, মাদক শুল্ক, প্রমোদ কর, সেচ কর, দান কর, বিদ্যুৎ কর, ভ্রমণের ওপর কর ইত্যাদি।

বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ

বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ নিচে বর্ণনা করা হল :

১। **প্রতিরক্ষা :** বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হল প্রতিরক্ষা। অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়, প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ, বেতন, ভাতা প্রভৃতি বাবদ সরকার প্রচুর ব্যয় করেন।

২। **বেসামরিক প্রশাসন :** বেসামরিক প্রশাসন-কার্য পরিচালনার জন্য প্রতি বছর সরকারকে প্রচুর ব্যয় করতে হয়। সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত বিভাগসমূহের পরিচালনা ও উন্নয়ন, কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদির জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে।

৩। **শিক্ষা :** বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হল শিক্ষা। শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সরকারকে সাম্প্রতিককালে শিক্ষা খাতে প্রচুর ব্যয় করতে হচ্ছে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদরাসার জন্য অনুদান ও শিক্ষা বিস্তারের নতুন নতুন কার্যক্রমে যথেষ্ট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ :** বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমূলক কর্মসূচিকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছে। হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন, বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। জনসংখ্যা সমস্যাকে সরকার এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যও সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।

৫। **পরিবহন ও যোগাযোগ খাত :** উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত এবং এ খাতের কার্যক্রমও ব্যয়বহুল। রাস্তাঘাট উন্নয়ন, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি খাতে বাংলাদেশ সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে।

৬। **পুলিশ, আনসার ও বাংলাদেশ রাইফেলস :** দেশের অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ ও আনসার বাহিনী এবং সীমান্ত তদারকির জন্য বাংলাদেশ রাইফেলস বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। এ সকল বাহিনীর প্রশিক্ষণ, বেতন, ভাতা প্রভৃতি বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়।

৭। **বিচার বিভাগ ও কারা বিভাগ :** বিচার বিভাগ ও কারাগার ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারকে যথেষ্ট ব্যয় করতে হয়।

৮। **বেসামরিক পূর্ত কাজ :** সরকার প্রতি বছর বেসামরিক পূর্ত কর্মসূচিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। রাস্তাঘাট নির্মাণ, ব্রিজ, কালভার্ট প্রভৃতি এই খাতের অন্তর্ভুক্ত।

৯। **রাজস্ব আদায়কারী বিভাগসমূহ :** বাংলাদেশ সরকার আয়কর বিভাগ, বাণিজ্য শুল্ক বিভাগ, আবগারি শুল্ক বিভাগ, ভূমি রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতির ব্যয়ভার মেটাবার জন্য রাজস্বের এক বিরাট অংশ ব্যয় করে।

১০। **ঋণ ও সুদ পরিশোধ :** বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে যে সমস্ত ঋণ গ্রহণ করে সেই ঋণ পরিশোধ এবং তার সুদ প্রদানের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং এ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ অব্যাহতভাবে বেড়েই চলেছে।

১১। **বৈদেশিক বিষয়াবলি :** বিদেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, বিদেশে স্বার্থ রক্ষার জন্য দূতাবাস প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য সরকারকে প্রতি বছর যথেষ্ট ব্যয় করতে হয়।

১২। **অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা :** অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের জন্য সরকারকে ব্যয় করতে হয়।

১৩। **সমাজ ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম :** জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম বাবদ সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১৪। **অপ্রত্যাশিত ব্যয় :** দেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য সরকারকে প্রভূত অর্থ ব্যয় করতে হয়। এর জন্য সরকার একটি সংরক্ষিত তহবিল রাখেন।

উপরিউল্লিখিত আলোচনায় দেখা যায় বর্তমান যুগে সরকার যেমন বিভিন্ন উৎস থেকে আয় করে তেমনি সেই আয় থেকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণের স্বার্থে ব্যয় করে। সরকারি আয় ও ব্যয় উভয়ের লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ সাধন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সরকারি ব্যয়ের প্রধান উদ্দেশ্য–

(ক) জনগণের কল্যাণ (খ) সরকারের প্রভাব বৃদ্ধি

(গ) শৃঙ্খলা বিধান করা (ঘ) প্রশাসন পরিচালনা

২। নিচের সারণিতে বাজেট উপাত্ত দেয়া হল।

বছর	সরকারি ব্যয় (বিলিয়ন টাকা)	সরকারি আয় (বিলিয়ন টাকা)
১	৯৫০	৮০০
২	১০০০	১০০০
৩	১১০০	১২০০

কোন শব্দগুচ্ছ বাজেটের প্রবণতাকে ভালভাবে বর্ণনা করে ?

ক. উদ্বৃত্ত থেকে ঘাটতি খ. ঘাটতি থেকে উদ্বৃত্ত

গ. ঘাটতি বেড়েছে ঘ. উদ্বৃত্ত বেড়েছে।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আধুনিক যুগে রাষ্ট্রকে নানাবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয়। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হল জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা। এসব কার্য সম্পাদনের জন্য সরকারকে জনসাধারণের ওপর কর আরোপ করতে হয়।

৩। রাষ্ট্রের নানাবিধ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হয়–

i. বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার

ii. বিপুল অর্থের

iii. বিপুল জনশক্তির

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও iii

৫। সরকার সিগারেট, দিয়াশলাই, স্পিরিট, ঔষধ প্রভৃতির ওপর ধার্য করেন–

ক. মূল্যসংযোজন কর খ. আবগারি শুল্ক

গ. বাণিজ্য শুল্ক ঘ. বিক্রয় কর

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ও সমাধানের উপায়

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে অনেকগুলো মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা বিদ্যমান। নিচে এ দেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল :

১। স্বল্প মাথাপিছু আয় ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান : বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে একটি। বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এই স্বল্প মাথাপিছু আয়ের কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার মান দারিদ্র্যসীমার নিচে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের কিছু ধনী, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের মাথাপিছু আয়ের তালিকা নিচে দেওয়া হল :

দেশ		**মাথাপিছু আয়** (ইউ এস ডলার)	**দেশ**		**মাথাপিছু আয় (ইউ এস ডলার)**
১.	সুইজারল্যান্ড	৫৭২৩০	৭.	মালয়েশিয়া	৫৪৯০
২.	জাপান	৩৮৪১০	৮.	ইরান	৩০০০
৩.	সুইডেন	৪৩৫৮০	৯.	শ্রীলঙ্কা	১৩০০
৪.	যুক্তরাষ্ট্র	৪৪৯৭০	১০.	পাকিস্তান	৭৭০
৫.	যুক্তরাজ্য	৪০১৮০	১১.	বাংলাদেশ	*৫২০
৬.	কোরিয়া	১৭৬৯০			

২। **কৃষি অনগ্রসরতা :** কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ২০০১ সালের আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী সারা দেশে জাতীয় আয়ের শতকরা ৩২ ভাগ আয় আসে কৃষি থেকে। বাংলাদেশে এখনো প্রাচীন চাষ পদ্ধতি চালু রয়েছে। জমিগুলো খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন, বিনিয়োগের মাত্রাও স্বল্প। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, উন্নত উপকরণ, সেচ সুবিধা, উত্তম বীজ ও সার ব্যবহার এখনো অত্যন্ত সীমিত। এই অনুন্নত চাষ পদ্ধতির কারণে বাংলাদেশের উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব কম।

৩। **শিল্পের অনগ্রসরতা :** বাংলাদেশ শিল্পে অত্যন্ত অনগ্রসর। মূলধনের স্বল্পতা, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির অভাব, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, দক্ষ শ্রমিকের অভাব সর্বোপরি কুশলী উদ্যোক্তার অভাবে এ দেশ শিল্পের দিক দিয়ে অনুন্নত রয়ে গেছে।

৪। **জনসংখ্যা বিস্ফোরণ :** বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। আয়তনের তুলনায় এখানে লোকসংখ্যা এত অধিক যে জনসংখ্যাধিক্যের সমস্যা আমাদের উন্নয়ন প্রয়াসকে ব্যাহত করছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৮% এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৭৬* জন লোক বাস করে। বিবিএস রিপোর্ট ২০০৭ অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে ১.৪১ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৫৩ জনে দাঁড়িয়েছে। এই বিপুল জনসংখ্যার চাপ বাংলাদেশের অন্যতম মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা।

৫। **দক্ষ জনশক্তির অভাব :** বাংলাদেশের আর একটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা হল দক্ষ জনশক্তির অভাব। আমাদের পর্যাপ্ত জনশক্তি আছে; কিন্তু দক্ষ জনশক্তির যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

৬। **দক্ষ সংগঠকের অভাব :** বাংলাদেশে উন্নয়নের জন্য দক্ষ সংগঠক প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অল্প। ফলে শিল্প ও কলকারখানা বা স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থান গড়ে তোলার মতো ঝুঁকি গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তি খুবই কম।

৭। **মূলধনের স্বল্পতা :** বাংলাদেশের লোকের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম, তাই সঞ্চয়ের হারও কম। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মূলধন গঠনের হার কম। আমাদের সঞ্চয়ের হার ৭% মাত্র। উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার জন্য সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের হার কমপক্ষে ২৫% হওয়া প্রয়োজন।

৮। **বেকার সমস্যা :** বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা হল বেকার সমস্যা। বাংলাদেশে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে , সে হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে না ফলে বেকার সমস্যা বেড়েই চলেছে। আমাদের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪০ ভাগ বেকার।

৯। **অনুন্নত অবকাঠামো :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কতকগুলো মৌলিক সুযোগ সুবিধা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠা প্রয়োজন। যেমন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, রেলপথ, বাঁধ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, বন্দর, ব্যাংক ইত্যাদি। অনুরূপভাবে সামাজিক বুনিয়াদ বা অবকাঠামো, যেমন, স্কুল, কলেজ, কারিগরি জ্ঞান, প্রশাসনিক দক্ষতাও গড়ে ওঠা প্রয়োজন। অথচ বাংলাদেশে এর কোনটিই তেমন উন্নত নয়। অনুন্নত অবকাঠামোর জন্য এখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি অত্যন্ত মন্থর।

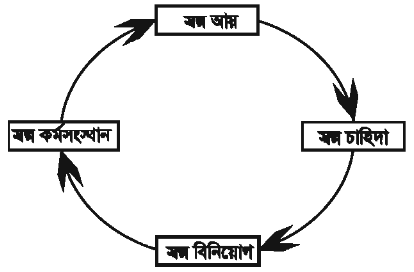
১০ **প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা ও অপূর্ণ ব্যবহার :** বাংলাদেশের লভ্য প্রাকৃতিক সম্পদ জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। প্রয়োজনীয় মূলধন ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে আমাদের খনিজ সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ ও উত্তোলন কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। ভারি শিল্প গড়ে তোলার জন্য লোহা, কয়লা ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ আমাদের দেশে কম। শিল্পায়ন প্রয়াস এজন্য ব্যাহত হচ্ছে।

১১। **বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি :** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আমাদের আমদানির তুলনায় রপ্তানি কম। বাণিজ্যের এ ঘাটতি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট বাধা।

১২। **সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অসুবিধা :** স্বাধীনতার পর যে কয়টি পাঁচশালা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার ভিত্তি বা বাস্তবায়নের মান কোনটিই আশানুরূপ হয়নি। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সব সময়ই অবহেলিত ছিল। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা বা কুটির শিল্পের যথোপযুক্ত উন্নয়ন এখনো ঘটেনি। নগর জীবনেও নানান জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচন বা মানুষের জীবনের গুণগত মান উন্নয়ন কোনটিকেই কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়নি।

১৩। **মুদ্রাস্ফীতি :** বাংলাদেশে দ্রব্য সামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশে অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি বিরাজমান। এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিরাট বাধা।

১৪। **দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র :** বাংলাদেশের অন্যতম মৌলিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল, এখানে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র (Vicious Circle) বিদ্যমান। এখানে লোকের আয় কম বলে বাজারে পণ্যের চাহিদা কম, পণ্যের চাহিদা কম বলে বিনিয়োগের পরিমাণ কম। বিনিয়োগ কম হবার ফলে কর্মসংস্থান কম। এটাকে বৃত্তাকারে দেখান হল :



এ চক্রের নামই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। অধ্যাপক র‍্যাগনার নার্কস এ ধারণার প্রবক্তা। বাংলাদেশের স্বল্প মাথাপিছু আয় ও নিম্ন জীবনযাত্রার মানের অন্যতম কারণ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র।

অর্থনৈতিক সমস্যাবলি সমাধানের উপায়সমূহ

বাংলাদেশে বহুবিধ মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা বিরাজমান। এগুলোর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

(১) **কৃষি আধুনিকীকরণ :** বাংলাদেশ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। তাই কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা উচিত। উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি উপকরণাদির যোগান বৃদ্ধি, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, কৃষি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, কৃষি পণ্যের বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, ভূমিসত্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

(২) **শিল্পায়ন :** জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির পাশাপাশি শিল্প কারখানা গড়ে তোলা প্রয়োজন। শিল্পকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন কল্পনা করা যায় না। কৃষিজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টি বা কৃষিজাত কাঁচামালের সদ্ব্যবহার করতে হলে শিল্পোন্নয়ন জরুরি। বৃহদায়তন শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ইত্যাদি পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে দেশের অবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব।

(৩) **মূলধন গঠন :** বর্তমান কালে শিল্প ও কৃষি উন্নয়ন মূলধন যোগানের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। জনসাধারণকে তাই অধিক সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে হবে। ব্যাংকসহ অন্যান্য অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্প্রসারণ ও ব্যাংকসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপরও মূলধন গঠন নির্ভর করে।

(৪) **প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার :** বাংলাদেশের যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তার উপযুক্ত ও সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। দেশের জলবিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

(৫) **অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ :** দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। রাস্তাঘাট, পুল, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, ব্যাংক, যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের প্রয়োজন রয়েছে। তেমনি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা সম্প্রসারণ করে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের অনুকূলে আনতে হবে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে।

(৬) **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ জাতীয় স্বার্থে একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কার্যক্রম। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ সম্ভব। এ জন্য শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে হবে।

(৭) **শিক্ষার বিস্তার :** দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির জন্য সর্বজনীন শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। একই সঙ্গে কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে আধুনিক প্রযুক্তি সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে কারিগরি ও প্রকৌশলগত শিক্ষাবিস্তার একান্ত প্রয়োজন।

(৮) **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :** দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা দূর করতে হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রযুক্তিগত উত্তরণ এজন্য আবশ্যক। স্বউদ্যোগে কর্মসংস্থান গড়ে তুলতে এক দিকে গ্রামাঞ্চলে যেমন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তুলতে হবে, তেমনি মাছ, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু, ফুল ও ফল চাষের সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। বিলম্বে হলেও বাংলাদেশ এ ব্যাপারে সম্প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে।

(৯) **বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্যতা আনয়ন :** বাংলাদেশের বাণিজ্যিক লেনদেন ক্ষেত্রে যে ঘাটতি বা ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করছে তা দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং মুষ্টিমেয় কয়েকটি দ্রব্যের রপ্তানির বদলে অধিক সংখ্যক দ্রব্যের রপ্তানি উৎসাহিত করতে হবে। একই সঙ্গে আমদানি কমাতে হবে।

(১০) **বৈদেশিক সাহায্যের উপযুক্ত ব্যবহার :** বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বার্থে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা স্বাধীনতাপূর্ব ও উত্তর উভয় কালেই লক্ষণীয়। বিপুল পরিমাণে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য, ঋণের সুষ্ঠু ও উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারলে দেশ সমৃদ্ধি লাভ করবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব হবে।

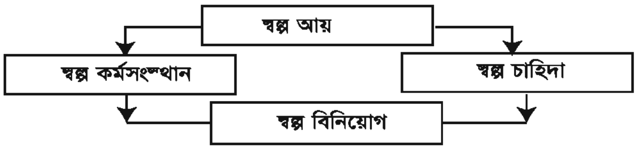
(১১) **সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন :** বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি তথা প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং মানব সম্পদের উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতা অর্জন আমাদের পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(১২) **মুদ্রাস্ফীতি রোধ :** বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির হার বেশি থাকায় মুদ্রাস্ফীতি জনজীবনকে বিপন্ন করে তোলে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুদ্রাস্ফীতি অনেকটা রোধ করা সম্ভব হয়েছে। জনস্বার্থে এ প্রয়াস অব্যাহত রাখা আবশ্যক।

(১৩) **দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম :** অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হতে হবে দারিদ্র্য বিমোচন কেন্দ্রিক। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেদ করার লক্ষ্যে সঞ্চয় বৃদ্ধি, ভোগ হ্রাস, উৎপাদনশীল খাতে বৈদেশিক মূলধন ব্যবহার, অধিক উৎপাদন প্রভৃতি ব্যবস্থা নিতে হবে। অনুরূপভাবে দারিদ্র্য বিমোচন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজের বিত্তহীনদের জন্য বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচি নিতে হবে, যাতে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের অন্তরায় অপসৃত হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন



১। **এটি কীসের চক্র ?**
ক. দুর্যোগ চক্র — খ. কর্মসংস্থান চক্র
গ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র — ঘ. অর্থনৈতিক চক্র

২। মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা সমাধানের উপায় হচ্ছে
i. ভোগ–ব্যয় হ্রাস
ii. মুদ্রার সরবরাহ হ্রাস
iii. উৎপাদন বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i — খ. ii
গ. iii — ঘ. i, ii ও iii

প্রদত্ত তথ্য থেকে ৩–৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নিচে বিশ্বের কিছু দেশের মাথাপিছু আয়ের তালিকা দেওয়া হল–

দেশ	মাথাপিছু আয় (ডলার)
সুইজারল্যান্ড	৫৭,২৩০
জাপান	৩৮,৪১০
যুক্তরাষ্ট্র	৪৪,৯৭০
যুক্তরাজ্য	৪০,১৮০
বাংলাদেশ	৫২০

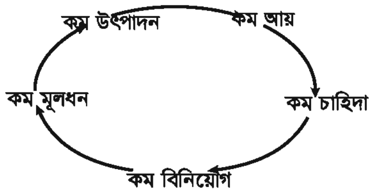
৩। **জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয়ের পার্থক্য কত ?**
ক. ৫৪৫০ — খ. ৪৯৫০
গ. ৪৪৫০ — ঘ. ৬৫৬০

৪। তালিকাভুক্ত দেশগুলো কী–
i. উন্নত
ii. উন্নয়নশীল
iii. স্বল্পোন্নত

নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i — খ. ii
গ. iii — ঘ. i ও ii

৫। বাংলাদেশের সর্বনিম্ন মাথাপিছু আয়ের অন্যতম কারণ হচ্ছে–
ক. দুর্নীতি — খ. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ
গ. মুদ্রাস্ফীতি — ঘ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র

সৃজনশীল প্রশ্ন



উপরের চিত্র অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. এই চক্রটির নাম কী?
খ. এই নামে চক্রটিকে চিহ্নিত করার একটি কারণ বর্ণনা কর।
গ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশে বর্তমানে এ চক্রটি কার্যকর আছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষা বিস্তরণের মাধ্যমে এই চক্রটি থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে, বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্যবসায় বাণিজ্য

বৈদেশিক বাণিজ্য

পৃথিবীর কোনো দেশই তার প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না। যে সব পণ্য উৎপাদনের খরচ বেশি সেগুলো সংগ্রহের জন্য একটি দেশকে অন্য দেশ বা দেশসমূহের ওপর নির্ভর করতে হয়। যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্য বিনিময় বেড়ে গেছে। প্রত্যেক দেশই অন্যান্য দেশে নিজের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করে এবং অন্যান্য দেশ হতে নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করে। এ কারণেই বাংলাদেশের কৃষকের উৎপাদিত শাকসবজি বা পণ্য যেমন বিদেশের বাজারে স্থান পেয়েছে, তেমনি নানান দেশের রকমারি পণ্য আমাদের দেশের বাজারে আজ সহজলভ্য। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের উৎপাদন ক্ষমতার বিভিন্নতার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে পারদর্শিতা অর্জন করেছে। পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দুইটি বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী যে বাণিজ্য পরিচালিত হয় তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। যেমন, বাংলাদেশ পাট, চা বা তৈরি পোশাক অন্য দেশে রপ্তানি করে বা শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে। এই বাণিজ্য যখন দেশের অভ্যন্তরে দুই পক্ষের মধ্যে পরিচালিত হয় তখন তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। যেমন, টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি ঢাকা বা রাজশাহীতে এবং রাজশাহীর সিল্কশাড়ি ঢাকা বা চট্টগ্রামে বিক্রয় হলে তা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য

বাংলাদেশ প্রধানত কৃষিজাত পণ্য ও কাঁচামাল রপ্তানি করে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ সকল পণ্যের পাশাপাশি বেশ কিছু শিল্পজাত দ্রব্য ও অন্যান্য পণ্য রপ্তানি করছে। এগুলোকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- প্রচলিত দ্রব্যসমূহ এবং অপ্রচলিত দ্রব্যসমূহ। নিচে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

(ক) প্রচলিত দ্রব্যসমূহ

১। **পাটজাত দ্রব্য :** বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পাটজাত দ্রব্য। এগুলো হল দেশের পাটকলে উৎপাদিত চট, থলে, বস্তা, গালিচা প্রভৃতি। ১৯৮৪-৮৫ সালে পাটজাত দ্রব্য থেকে আয় হয় সর্বোচ্চ ৩৫৮ মা. ডলার। এরপরে এই রপ্তানি মূল্য হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৯২-৯৩ সালে রপ্তানি আয় নেমে ১৯৫ মা. ডলার হয়। বাংলাদেশের পাটজাত দ্রব্য প্রধানত যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, রাশিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়।

২। **কাঁচাপাট :** বাংলাদেশের অপর গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি দ্রব্য হল কাঁচাপাট। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়। এক সময় কাঁচা পাট রপ্তানি করেই এ দেশ সর্বাধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত। কিন্তু নানা কারণে বর্তমানে কাঁচাপাট রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

৩। **চামড়া :** চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য বাংলাদেশের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে গরু, মহিষ, ছাগলের চামড়া পাওয়া যায়। তাই চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪। **চা :** বাংলাদেশের সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম জেলাসমূহে ১৫৮টি চা বাগান রয়েছে। বাংলাদেশের চায়ের প্রধান ক্রেতা হল পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, হল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, মিসর, জাপান ইত্যাদি দেশ।

৫। **মাছ ও হিমায়িত খাদ্য :** মাছ ও হিমায়িত খাদ্য বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি পণ্য। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার টাটকা মাছ, শুকনা মাছ, হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

৬। **নেফ্তা ও ফার্নেস তৈল :** বাংলাদেশ সিঙ্গাপুরে অবস্থিত শেল ইস্টার্ন পেট্রোলিয়াম লিঃ এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যৌথভাবে পেট্রোল শোধনের কাজ করে আসছে। সংশোধিত নেফ্তা ও ফার্নেস তৈল থেকে বাংলাদেশ যথেষ্ট পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

(খ) অপ্রচলিত পণ্য

বর্তমানে বাংলাদেশ প্রচলিত পণ্য ছাড়াও কিছু সংখ্যক নতুন ও অপ্রচলিত পণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করে থাকে।

১। **তৈরী পোশাক :** তৈরী পোশাক বর্তমানে বাংলাদেশের অপর একটি উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্য। বাংলাদেশের সুতি বস্ত্র ও পোশাকের ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

২। **হস্ত-শিল্পজাত দ্রব্য :** সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ হস্তশিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করছে। এ দ্রব্যের চাহিদা ধীরে ধীরে বিদেশের বাজারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩। **অন্যান্য পণ্য :** বাংলাদেশ থেকে আরো কিছু সংখ্যক নতুন পণ্য অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে রপ্তানি হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অশোধিত সার, চিটাগুড়, দিয়াশলাই, পারটেক্স, রেয়ন, খেলনা, ইলেকট্রিক সামগ্রী, পান, মসলা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্য

বাংলাদেশ বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ ভোগ্যপণ্য, শিল্পের জন্য কাঁচামাল, কলকারখানার যন্ত্রপাতি, কলকব্জা আমদানি করে। উপরন্তু, মাঝেমধ্যেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত এই দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য গড়ে বছরে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশ যে বিভিন্ন প্রকার পণ্য আমদানি করে তাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) ভোগ্যপণ্য ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য, (২) শিল্পের কাঁচামাল ও (৩) মূলধন দ্রব্য।

নিচে বাংলাদেশের প্রধান আমদানি পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

১। ভোগ্যপণ্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য আমদানি বাংলাদেশের মোট আমদানির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২। খাদ্যশস্য ও জীবন্ত প্রাণী আমদানির জন্য বাংলাদেশকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। মোট আমদানির আনুমানিক ১৭ ভাগ এই ধরনের আমদানি।

৩। যন্ত্রপাতি ও পরিবহন সরঞ্জাম আমদানি করতে বাংলাদেশকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। মোট আমদানির প্রায় ২৮ ভাগ ব্যয় হয় এ খাতে।

৪। খনিজ ও জ্বালানী এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্য আমদানির জন্য ১৯৮৪-৮৬ সালে মোট আমদানির প্রায় ১০% ব্যয় হত।

৫। রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষুধপত্র আমদানির জন্য শতকরা ৭.৫ ভাগ আমদানি ব্যয়ের প্রয়োজন হয়।

৬। উপরে বর্ণিত দ্রব্যাদি ছাড়াও বাংলাদেশ বহুবিধ দ্রব্য আমদানি করে। যেমন, অভোজ্য তেল, প্রাণিজ ও ভেষজ তেল, চর্বি, পানীয় দ্রব্য, তামাক, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, চলচ্চিত্র এক্সরে ফিল্ম, বইপত্র, সাময়িকী, শিশুখাদ্য, ঢেউটিন ইত্যাদি।

এ সকল দ্রব্য প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, সুইডেন, হল্যান্ড, পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, কোরিয়া, তাইওয়ান, ভারত, চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশ থেকে আমদানি করা হয়।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

বর্তমান যুগে নানা ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। যথা- (১) এক মালিকানা কারবার, (২) অংশীদারী কারবার (৩) যৌথ মূলধনী কারবার (৪) সমবায় কারবার (৫) রাষ্ট্রীয় কারবার। নিচে এসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

(১) এক মালিকানা কারবার : এক মালিকানা কারবারে একজন মালিক থাকে যে নিজে ব্যবসায়ে মূলধন যোগাড় করা থেকে ঝুঁকি গ্রহণ করা পর্যন্ত সব কাজ একা করে। এছাড়া ব্যবসায়ের পরিকল্পনা গ্রহণ, স্থান নির্ধারণ, শ্রমিক নিয়োগ, কাঁচামাল ও মূলধন সংগ্রহ করা ও উৎপাদনের ব্যবস্থা করা, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করা যাবতীয় কাজ সে একা সমাধা করে। এক কথায় এক মালিকানা কারবারে ব্যবসায়ের সকল দায়িত্ব একা মালিক বহন করে। তেমনি ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানও মালিকের।

(২) অংশীদারী কারবার : অংশীদারী কারবারের জন্য কমপক্ষে দুইজন সদস্য প্রয়োজন হয়। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে অংশীদারী কারবার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অংশীদারী কারবারের মালিকগণ কারবারের মূলধন সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নিজেরাই করে। মূলধনের অনুপাতে তারা লাভ গ্রহণ করে এবং ঝুঁকি বহন করে।

(৩) যৌথ মূলধনী কারবার : বর্তমান যুগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হল যৌথ মূলধনী কারবার। যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বহু লোকের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত হয় তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে। এই প্রকারের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রধানত বৃহদায়তন শিল্পের জন্য অপরিহার্য। কারণ বৃহদায়তন শিল্পে সাধারণত অধিক মূলধন প্রয়োজন হয় যা একা বা কয়েকজন ব্যক্তির পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন। যৌথ মূলধনী কারবারের সমুদয় দায়-দায়িত্ব সদস্যগণ বহন করেন। যৌথ মূলধনী কারবার পরিচালনার জন্য একটি পরিচালকমণ্ডলী থাকে।

(৪) সমবায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান : যখন কয়েকজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পরস্পরের সাথে মিলে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাকে সমবায় কারবার বলে। সকলে মিলে একত্রে কাজ করার নীতির ভিত্তিতে সমবায়ের উৎপত্তি। সমবায়ী ব্যবসায়ের সদস্যগণই এর মালিক। এই পদ্ধতিতে শ্রমিক মালিকের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। এখানে সবাই সমান।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির জন্য সমবায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত উপযোগী। বাংলাদেশের জনগণ নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সমবায় পদ্ধতির কারবার গঠন করে এই ব্যবসায়ের সুফল ভোগ করতে পারে।

(৫) সরকারি কারবার : সরকারি মালিকানাধীন ব্যবসায়কে সরকারি কারবার বলে। সাধারণত দেশের জনগণের কল্যাণ ও নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার যে সকল ব্যবসায়ের মালিকানা গ্রহণ করে তাকে সরকারি কারবার বলা হয়।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বেকার সমস্যা রোধ, সামাজিক কল্যাণ ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জনে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এক মালিকানা, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী কারবার এবং রাষ্ট্রীয় কারবার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসায় সংগঠন রয়েছে। ব্যবসায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই ব্যবসায়ের সাফল্যের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ করা যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল–

ক. শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি　　খ. কাঁচামাল রপ্তানি

গ. বিলাস দ্রব্য রপ্তানি　　ঘ. বিমান পথে অধিক বাণিজ্য

২। বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিনটি হল–

ক. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, রেয়ন, মশলা

খ. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, দিয়াশলাই, পান

গ. তৈরী পোশাক, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, চিটাগুড়

ঘ. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, ইলেকট্রিক সামগ্রী, পারটেক্স।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

কাশেম সাহেব বাংলাদেশের একজন শিল্পপতি। তিনি তার তৈরী পোশাক ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করছেন। তিনি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আরো ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করেন।

৩। কাশেম সাহেব এর তৈরী পোশাক রপ্তানি কোন বাণিজ্যের অন্তর্গত?

ক. আমদানি বাণিজ্য | খ. রপ্তানি বাণিজ্য
গ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য | ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্য

৪। কাশেম সাহেবের তৈরী পোশাক রপ্তানি–

i. অপ্রচলিত পণ্য সামগ্রীর একটি প্রধান খাত
ii. প্রচলিত পণ্য সামগ্রীর একটি প্রধান খাত
iii. ভোগ্যপণ্য সামগ্রীর একটি প্রধান খাত

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i | খ. iii
গ. iii | ঘ. i, ii ও iii

৫। ব্যবসায়ের মাধ্যমে প্রধানত–

i. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়
i. বিভিন্ন ব্যবসায় সংগঠন গড়ে ওঠে
iii. কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i | খ. iii
গ. iii | ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নাজমুল সাহেব কোরবানী ঈদের পর গরু, ছাগল ও মহিষের চামড়া বিদেশে পাঠান। আবার মাছ ও হিমায়িত খাদ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির জন্য সদ্য একটি এল. সি. খুলেছেন তার বন্ধু শাপুরকে নিয়ে। তবে নাজমুল সাহেব একজন সফল গাড়ি ব্যবসায়ী।

ক. নাজমুল সাহেব যে দুটি জিনিস বিদেশে পাঠান সেগুলো কী ধরনের দ্রব্য?
খ. নাজমুল সাহেবের বন্ধুর সাথে ব্যবসা কী ধরনের কারবার তা ব্যাখ্যা কর।
গ. বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির উপায়সমূহ চিহ্নিত কর।
ঘ. বাংলাদেশের বেকার সমস্যা রোধে কোন ধরনের ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত, যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর প্রভাব

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসম্পদ উভয়েরই ভূমিকা আছে। জনসংখ্যার সঠিক ব্যবহার জনসম্পদ গড়ে তোলে। জনসংখ্যা একটি সক্রিয় উপাদান যা প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অধিক সম্পদ সৃষ্টি করে। বস্তুত, একটি কাম্য পরিমাণ বিশিষ্ট, শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মানুষ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে। জনগণের এই প্রয়োজন মেটাতে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই জনসংখ্যাকে দেশের সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

অপর দিকে, অনেক সময় অনেক দেশে জনসংখ্যা দায় বা বোঝা হিসেবেও বিবেচিত হয়। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হলে অপ্রতুল সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে মাথাপিছু আয় ও উৎপাদন কম হয়, জীবনযাত্রার মান নেমে যায়, খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় এবং বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায়। সব মিলিয়ে উন্নয়নের গতি মন্থর হয়। দেশের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সামগ্রিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার প্রভাব

জনসংখ্যা ও ভূমির পরিমাণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। দেশের মোট ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে সীমিত ভূমির ওপর চাপ পড়ে। ফলে মাথাপিছু উৎপাদন ও সঞ্চিত মূলধন হ্রাস পায় এবং ভোগ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, জনসংখ্যার তুলনায় ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ বেশি থাকলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ক্ষুদ্র আয়তনের এদেশে প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটেছে। সারণি-১ এ বিষয়টি দেখানো হল।

সারণি-১

বিংশ-একবিংশ শতাব্দিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ

বছর	মোট জনসংখ্যা (কোটি)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির % হার
১৯০১	২.৮৯	০.৯০
১৯১১	৩.১৬	০.৯৪
১৯২১	৩.৩৩	০.৬০
১৯৩৪	৩.৫৬	০.৭৪
১৯৪১	৪.২০	১.৭০
১৯৫১	৪.১৯	০.৫০
১৯৬১	৫.৫২	২.২৬
১৯৭৪	৭.৬৪	২.৪৮
১৯৮১	৮.৯৯	২.৩৫
১৯৯১	১১.১৫	২.০৪
২০০১	১২.৯৩	১.৪৮
২০০৭	১৪.৬	১.৪১

সারণি- ১ এ দেখা যায় যে, ১৯০১ সালে বাংলাদেশ ভূখন্ডে মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২.৮৯ কোটি। ১৯০১ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল কিছুটা মন্থর। কিন্তু ১৯৬১ সাল থেকে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ করা যায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৪৮ ছিল ১৯৭৪ সালে। এরপর ক্রমশ এই হার কমতে কমতে ২০০৭ সালে তা শতকরা ১.৪১ এ দাঁড়ায়। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৫.৫২ কোটি। কিন্তু মাত্র ৩০ বছরে অর্থাৎ ১৯৯১ সালে তা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় ১১.১৫ কোটিতে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে পরবর্তী ৪৭ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। বাংলাদেশের বর্তমান আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। আয়তন প্রায় একই থাকছে অথচ জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকসংখ্যার ঘনত্ব বাড়ছে। ১৯৮১ সালে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৬২৪ জন। ১৯৯১ সালে এই ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭৫৫ জনে এবং ২০০৭ সালে তা পৌঁছেছে ৯৫৩ জনে। বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ।

সারণি-২ **

বাংলাদেশসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব

দেশ	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)
বাংলাদেশ	৯৫৩
ভারত	৩৪৯
পাকিস্তান	২০৯
শ্রীলঙ্কা	৩২২
চীন	১৩৯
ইন্দোনেশিয়া	১২৪
মালয়েশিয়া	৭৭
দক্ষিণ কোরিয়া	৪৯৮

বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা যে কত অধিক তা সারণি-২ থেকে বোঝা যায়। কয়েকটি নগর-রাষ্ট্র ও দ্বীপ-দেশ ব্যতিরেকে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এত কম জায়গায় এত অধিক লোক বাস করে না।

ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান লোকের চাহিদা অনুযায়ী বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট, কল-কারখানাসহ বিভিন্ন শিল্প ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে আবাদযোগ্য জমি কমছে। বন কেটে বসতি গড়ে উঠেছে। গাছপালা কেটে বনজঙ্গল উজাড় করার ফলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্বিকভাবে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ কারণে বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলি

১। **গণদারিদ্র্য ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান :** বাংলাদেশের জনসাধারণ অত্যন্ত দরিদ্র ও তাদের জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্ন পর্যায়ের। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবলতর। ফলে দারিদ্র্যের আরো প্রসার ঘটছে। মাথাপিছু আয় খুবই কম। ২০০৭ সালে এ আয় দাঁড়ায় ৫২০ ইউ এস ডলার *। নিম্ন আয়ের জন্য দরিদ্র দেশে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কম হয়। উন্নত দেশের লোকের তুলনায় আমাদের দেশের মতো গরিব দেশের লোকেরা নানা বঞ্চনার শিকার হয়। বিশুদ্ধ পানির অভাব, স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব, ডাক্তারের অভাব, নার্সের অভাব ইত্যাদি জীবনকে পীড়াদায়ক করে তোলে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে সমস্যা সৃষ্টি করে।

২। **খাদ্য ঘাটতি :** বিগত তিন দশক ধরে বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি বিরাজ করছে। আমাদের কৃষি উন্নয়নের হারও খুব বেশি সন্তোষজনক নয়, যে জন্য প্রতি বছর অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২১.১৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন। সম্প্রতি আমরা খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছি।

* আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট, আগস্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

** বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটাশিট, ২০০১,২০০৮ (est.)

** বিবিএস-২০০৭

কিন্তু অব্যাহত জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।

৩। **কৃষি জমির ওপর চাপ :** অপরিকল্পিত ও দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের আবাদযোগ্য জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮১ সালে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল ০.৩৩ একর। ২০০১ সালে এই পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ০.২৮ একর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমি আরো বেশি খন্ড-বিখন্ড হয়ে পড়েছে। দরিদ্র কৃষকগণ আরো দরিদ্র হয়ে পড়ছে। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান ক্রমশ খারাপ হচ্ছে।

৪। **বেকার সমস্যা :** অপরিকল্পিতভাবে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের বেকার সমস্যা ক্রমাগত তীব্র আকার ধারণ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি না হওয়াতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা সীমিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়ছেই।

৫। **শিল্পায়নসহ উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত :** দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান এ জনগোষ্ঠীর ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভোগ্যপণ্য আমদানি করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। ফলে, শিল্পায়নের জন্য যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি ব্যাহত হচ্ছে।

৬। **মূলধন গঠন ব্যাহত :** অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজ বৃদ্ধির জন্য মূলধন গঠন একান্ত প্রয়োজন। পরিবারের লোকসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের আয় বৃদ্ধি তার তুলনায় নগণ্য। তাই আমাদের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার খুবই কম।

৭। **নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি :** ১৫ বছরের কম এবং ৬৪ বছরের বেশি বয়সের মানুষকে অনুৎপাদনশীল ও পরনির্ভরশীল ধরা হয়। বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নির্ভরশীলতার হারও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তবে ১৯৯১ সাল থেকে ধীরে ধীরে এই হার কমতে শুরু করলেও ১৯৯৯ সালে শতকরা ৪৬ ভাগে দাঁড়িয়েছে। এই বিরাট অনুৎপাদনশীল ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ।

৮। **অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সকলের কাছে পৌঁছে না :** অপরিকল্পিতভাবে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশের জনসাধারণের অনেকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল ভোগ থেকে বঞ্চিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাড়তি সুযোগ সুবিধা ক্রমবর্ধমান জনগণের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না।

৯। **স্বাস্থ্যহীনতা ও অপুষ্টি :** ব্যাপক গণদারিদ্র্য ও দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য সুবিধা আমাদের দেশে খুব কম। ফলে সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যহীনতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে মায়েদের স্বাস্থ্য আরো বেশি খারাপ। প্রসূতি অবস্থায় চাহিদা অনুযায়ী সেবা সুবিধা না থাকায় মা ও শিশু মৃত্যুহারও অত্যন্ত বেশি।

১০। **সামাজিক পরিবেশের অবনতি :** আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুতগতির সাথে তাল রাখতে পারছে না। ফলে বিপুল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও হতাশার মধ্যে জীবনযাপন করছে। এ পরিস্থিতিতে বসবাস করে অসহায় মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায়-অন্যায়বোধ হারিয়ে ফেলছে। ফলে সমাজে অহরহ চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই ও খুন-খারাবী প্রভৃতি সামাজিক অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। হতাশাগ্রস্ত তরুণ ও যুবক মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে এবং তারা ক্রমশ আরো নানারকম নৈতিকতাবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ছে। তারা মাদক ব্যবসা, চোরাচালান ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হচ্ছে। বর্তমানে মাদকাসক্তি সারাদেশে তরুণদের মধ্যে আশঙ্কাজনকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশা ও ব্যভিচার বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের শ্লীলতাহানি, শারীরিক নির্যাতন, খুন এবং তাদের প্রতি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে। মেয়ে শিশুরাও নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নারী ও শিশু পাচারের মতো অপরাধও সংঘটিত হচ্ছে এবং অপহৃত নারী ও শিশুদেরকে নানারকম অমানবিক ও নৈতিকতাবিরোধী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিকভাবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে এবং মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে।

১১। **দুরারোগ্য রোগ :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে এবং অনেক দেশে নারী-পুরুষের অবৈধ ও অবাধ মেলামেশার বিস্তার ঘটছে। এর পরিণতিতে 'এইডস' নামক এক প্রকার দুরারোগ্য ও সংক্রামক রোগ দেখা দিয়েছে। হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস নামক এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম ভাইরাসের সংক্রমণ দ্বারা মানবদেহে এই রোগের সৃষ্টি হয়। রোগটির পুরো নাম হল Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

বর্তমানে বহু দেশে এ রোগের বিস্তার ঘটেছে বলে জানা গেছে। কোনো কোনো পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে পৃথিবীতে প্রায় ২৯.৪ মিলিয়ন (আইসিপিডি ঘোষণা) মানুষ এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানে এর সংখ্যা বিপজ্জনক সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এইডস রোগের কার্যকর কোনো প্রতিরোধ বা প্রতিষেধক ওষুধ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। এই মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করতে হবে এবং ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী জীবনযাপনসহ সুন্দর ও সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশেও এ রোগে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে। এ রোগ থেকে আমাদেরকে রক্ষার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে হবে এবং সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে হবে।

সুতরাং সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়, নিম্ন জীবনযাত্রার মান, দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতা, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, খাদ্য ঘাটতি, নৈতিক অবক্ষয় প্রভৃতি সমস্যার মূলে রয়েছে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণসমূহ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হারের পেছনে বহুবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :

(ক) সামাজিক কারণ

১) **শিক্ষার অভাব :** বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার এখনো অনেক কম। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে দূরদর্শিতা ও দায়িত্ববোধের অভাব রয়েছে। শিক্ষার অভাবে দেশের জনসাধারণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে অনুভব করতে পারে না। সেজন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে দীর্ঘ সময় লাগছে।

২) **নারী শিক্ষার অভাব :** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। শিক্ষার অভাব ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারীগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তারা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতেও যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে না।

৩) **সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার :** বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। শিক্ষার নিম্নহারের জন্য সমাজ আজো কুসংস্কার ও গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন। এই গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারও আমাদের দেশে উচ্চ জন্মহারের জন্য অনেকখানি দায়ী।

৪) **বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ :** বাংলাদেশে, বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জনগণ এখনো সচেতন নয় তাই অধিক হারে বাল্যবিবাহ হচ্ছে। ফলে সংশ্লিষ্ট পরিবারে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রামে ১৮ বছর বয়স হওয়ার পূর্বেই অনেক মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা কম বয়সে বৈবাহিক জীবন শুরু করে। ফলে দীর্ঘ বৈবাহিক জীবনকালে তারা অধিক সন্তান লাভ করে। এছাড়া বহুবিবাহও এদেশে উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য কাবিন নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কাবিন নিবন্ধন না করা শাস্তিমূলক অপরাধ। কাবিনের শর্তাবলি ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্য জানা উচিত।

৫) **পুত্র সন্তান কামনা :** বাংলাদেশের অনেক পিতামাতা পরপর কয়েকটি কন্যা সন্তানের পরও পুত্র সন্তানের আশায় সন্তান গ্রহণ করে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরো বেড়ে যায়।

(খ) অর্থনৈতিক কারণ

১) **দারিদ্র্য :** বাংলাদেশে উচ্চ জন্মহারের একটি প্রধান কারণ হল জনসাধারণের দারিদ্র্য। সাধারণত দরিদ্র পরিবারে সন্তান উৎপাদন প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, চিত্তবিনোদনের সুযোগের অভাব, পরিকল্পিত জীবন-ধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি এদেশের উচ্চ জন্মহারের জন্য দায়ী।

২) **জীবনযাত্রার নিম্নমান :** জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার সুযোগ-সুবিধার ওপর। এসব সুবিধাদি বাংলাদেশে অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। এদেশের মানুষের

উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে উপলব্ধি কম। পরিবারে কম সন্তান থাকলে সাধারণত জীবনযাত্রার মান বেড়ে যায়, তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ ও তাদের লালন পালন সম্বন্ধেও তারা উদাসীন। ফলে তারা অধিক সন্তানের পিতামাতা হতে দ্বিধাবোধ করে না।

৩) **কৃষিপ্রধান অর্থনীতি :** বাংলাদেশের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। কৃষক সমাজ কৃষিকাজের সুবিধার জন্য অধিক সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন অনুভব করে। এটাও উচ্চ জন্মহারের একটি প্রধান কারণ।

৪) **শিশু মৃত্যুর হার :** বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি। যেহেতু অনেক শিশু জন্মের পর বেঁচে থাকে না, তাই বেশি সংখ্যক শিশু যাতে বেঁচে থাকে এজন্য বেশি সন্তান জন্মের ব্যাপারে বাবা-মা আগ্রহী হয়।

৫) **নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশে নির্ভরশীলতার হার বেশি। তাই অধিক সন্তান জন্ম দেবার প্রবণতাও বেশি। বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকায় একাধিক সন্তানের ওপর এই নির্ভরশীলতার জন্য বাবা-মা অধিক সন্তান কামনা করে।

বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও গত ৩-৪ দশক যাবৎ মৃত্যুহার হ্রাস পাচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেলেও একদিকে উচ্চ জন্মহার এখনো অব্যাহত রয়েছে, অন্যদিকে মৃত্যুহার হ্রাস পাচ্ছে, ফলে নীট জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যার পরিমাণ এবং এর বৃদ্ধির হার উভয়ই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ। জন্মহার আরো হ্রাস করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নলিখিত উপায়ে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে :

১) **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম প্রধান উপায় হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, দ্রুত শিল্পায়ন, কৃষির আধুনিকীকরণ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে। উন্নত জীবনের ছোঁয়া পেলে সাধারণ মানুষ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে আগ্রহী হবে।

২) **জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন :** বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার জনবসতির ঘনত্বের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। যেমন- ঢাকা ও কুমিল্লা জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। অথচ সে তুলনায় হাওর অঞ্চল ও পাহাড়ী এলাকা এবং উত্তরাঞ্চলের এলাকাগুলোতে এই ঘনত্ব অনেক কম। এমতাবস্থায় জনসংখ্যার পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে।

৩) **আন্তর্জাতিক স্থানান্তর :** পৃথিবীর যেসব দেশ ঘনবসতিপূর্ণ সেসব দেশ থেকে কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশে লোক পাঠানো যেতে পারে। কারণ কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। অতীতে এরূপ এক দেশ বা অঞ্চল থেকে অন্য দেশ বা অঞ্চলে লোক স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে যেত। কিন্তু বর্তমানে এরূপ ব্যবস্থা ও সুযোগ সীমিত। কেননা অনেক দেশই আইন করে বিদেশীদের আগমনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে।

৪) **শিক্ষার প্রসার :** শিক্ষার প্রসার জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করতে পারে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী জীবনযাত্রার মান উঁচু রাখার জন্য পরিবারের লোকসংখ্যা সীমিত রাখে। তাই ছোট পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষিত পরিবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনে।

৫) **বহুমুখী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :** বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুটির শিল্প স্থাপন, হাঁস-মুরগি পালন, পশুপালন, মৎস্য চাষ, পোশাক শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংযোজন শিল্প ইত্যাদি গড়ে তুলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে পারলে, বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং জনসংখ্যার চাপ লাঘব হবে।

৬) **আইন প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন :** বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের ঘোষিত আইন কার্যকর করে এ সমস্যার সমাধান করা যায়। বাল্যবিবাহ রোধকল্পে আইন করে বিয়ের জন্য পুরুষের ২১ বছর এবং মেয়েদের ১৮ বছর ন্যূনতম বয়স বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই আইনের প্রয়োগ খুবই কম। ব্যাপক প্রচার ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে আইনটির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৭) পরিকল্পিত পরিবার কর্মসূচি বাস্তবায়ন : জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হল পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলা। সুপরিকল্পিত উপায়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করাকে পরিবার পরিকল্পনা বলে। শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে, সচেতনতা সৃষ্টি করে, সমাজের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি দূর করে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জনপ্রিয় করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা যায়।

৮) মা ও শিশুর স্বাস্থ্য : মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি হলে জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পায়। মা যদি পর পর অধিক সন্তান জন্ম দেয়, তাহলে শিশু ও মা উভয়ই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে মা শিশুর লালনপালন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা করতে পারে না। মা পরিবারে কাজকর্ম এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ করতেও অক্ষম হয়। তাই মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে অধিক সন্তান জন্মদান রোধ করলেও জনসংখ্যা কমবে।

৯) নারীর ক্ষমতায়ন : আমাদের দেশে সাধারণ পরিবার-কাঠামোর মধ্যে মায়েরা (অর্থাৎ মেয়েরা) সেবাদানকারী আর বাবারা (অর্থাৎ পুরুষেরা) উপার্জনকারী। যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে বর্তমানকালে নারী-পুরুষের এই চিহ্নিত ভূমিকার রদবদল হয়েছে, তবুও নারীর ভূমিকাকে ছোট করে দেখার সনাতন মানসিকতা দূর হয়নি। পুরুষের পাশাপাশি নারীরা আজকাল ব্যাপকভাবে আয় রোজগারে অংশগ্রহণ করছে। তাতে সংসারে সাশ্রয় হচ্ছে। পুরুষের কাঁধের বোঝা অনেক হালকা হয়েছে। কিন্তু পুরুষেরা গৃহস্থালী কাজে নারীর সহায়ক ভূমিকা পালন করছে না। সন্তান প্রতিপালন, সেবাদান এবং অন্যান্য ঘরোয়া কাজ তাদের ওপরই ন্যস্ত থাকছে। ফলে নারীদেরকে মাত্রাতিরিক্ত দায়িত্বভার বহন করতে হচ্ছে। এরপরেও পুরুষের কর্তা সুলভ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারী ও শিশুরা তাদের কাছে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাধারণত নারীর মতামতকে মূল্য দেওয়া হয় না। কর্মক্ষেত্রেও তাদের পারিশ্রমিক ও মর্যাদা নিম্ন স্তরের। এভাবে নারীদের শক্তি ও সম্ভাবনা প্রায় সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এই বিরাট জনশক্তিকে বাইরে রেখে কখনোই দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। তাই নারী শিক্ষার প্রসার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং পরিবার, সমাজ, কর্মক্ষেত্রে (অর্থাৎ সর্বত্র) তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। পুরুষের পাশাপাশি তাদেরকেও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিতে হবে। নারীর এরূপ ক্ষমতায়ন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অবদান রাখবে।

সমাজ জীবনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

ব্যক্তিকে নিয়ে পরিবার, পরিবারকে নিয়ে সমাজ, সমাজের সমন্বয়ে জাতি। দেহের যে কোনো অঙ্গে অসুখ হলে যেমন গোটা দেহ ও মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে তেমনি দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিও ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় জীবনে সমস্যা বা প্রভাব সৃষ্টি করে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হল :

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিবারের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও অনেক ক্ষেত্রেই সহায় সম্পত্তি বা জমিজমার পরিমাণ একই থেকে যায়। পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে কলহের সূত্রপাত হয়, পারিবারিক সম্প্রীতি ব্যাহত হয়। মানবিক মূল্যবোধের হানি ঘটে। যে সম্পত্তি একটি পরিবারের জন্য অপর্যাপ্ত ছিল তা আরো কয়েকটি পরিবারের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়াতে প্রত্যেক পরিবারের কষ্ট বেড়ে যায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সামাজিক সুবিধা প্রাপ্তিতেও টান পড়ে। যেমন- আগে যেখানে ফলের বাগান ছিল তা এখন আবাদী জমিতে পরিণত হচ্ছে। বনভূমি সাফ করে বসতবাড়ি গড়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক শোভা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। খেলাধুলার মাঠ থাকছে না, গরু-বাছুর, ছাগল চরাবার কোনো চারণক্ষেত্র থাকছে না। ঘনবসতিজনিত অসুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিবেশ দূষণ বাড়ছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পারিবারিক জীবনে অভাব অনটন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছেলেমেয়েদেরকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার সঙ্গতি ও মানসিকতার অভাবে তারা বিপথগামী হয়ে পড়ছে। স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক সুবিধাদির অভাবে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। পড়াশুনার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে এবং উচ্ছৃঙ্খলতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নানা ধরনের অনভিপ্রেত কলহ, সংঘর্ষ, হানাহানি বৃদ্ধি পাচ্ছে ও সন্ত্রাস বাড়ছে। সব মিলিয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। স্কুলে, কলেজে, কলকারখানায় অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও মূল্যবোধের অভাব দিন দিন প্রকটতর হচ্ছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে, আর এ কারণে আজকের সমাজ অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। প্রতিবেশী ও মহল্লার ছেলেমেয়েদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়টি পূর্বের মতো দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। ছেলেমেয়েরা নিজেদের খুশিমত অবাধ আচার আচরণ ও মেলামেশা করছে। ফলে অনেক সম্ভাবনাময় ছেলেমেয়ে বিপথগামী হচ্ছে এবং সঙ্গদোষে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

এভাবে পৃথিবীর বহুদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নেশাগ্রস্তদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং এদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ, যেমন- গনোরিয়া, সিফিলিস, এইডস ইত্যাদি সংক্রমিত হচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে সনাতন মূল্যবোধগুলো পূর্বের মত গুরুত্ব পাচ্ছে না। যেমন- অন্যায় ও অবাঞ্ছিতভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়াকে অনেকেই সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের উপায় বলে মনে করছে। বস্তুত এরূপ সামাজিক অবক্ষয়ের পরোক্ষ কারণ হচ্ছে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

আদমশুমারি এবং এর প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সাধারণত ১০ বছর অন্তর আদমশুমারি পরিচালনা করা হয়। এ সময়ে সকলের বয়স, স্ত্রী-পুরুষ সংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জন্মহার, মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার ইত্যাদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান নির্দিষ্ট ছকে সংগ্রহ করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গণনাকারীগণ বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেন। নতুন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্মের পর ১৯৭৪ সালে প্রথম, ১৯৮১ সালে দ্বিতীয় ও ১৯৯১ সালে তৃতীয় এবং বাংলাদেশে ২০০১ সালে চতুর্থ আদমশুমারি পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস (বিবিএস) এই আদমশুমারি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। এ কাজে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি নির্দেশনার দায়িত্বে থাকেন। তথ্য সংগৃহীত হবার পর এগুলো প্রক্রিয়াজাত করা হয়। প্রথমে জেলাভিত্তিক প্রতিবেদন বা খণ্ড রিপোর্ট তৈরি করা হয়। পরে জাতীয় ভিত্তিক একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

বিবিএস এর নিজস্ব বিক্রয় বা প্রদর্শনী কেন্দ্র থেকে বা পুস্তকালয় থেকে আদমশুমারির বিভিন্ন খণ্ড রিপোর্ট বা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ক্রয় করা যায়। বিভিন্ন আদমশুমারির রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সময়ের একটি নির্দিষ্ট পরিসরে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, গড় আয়ু, স্ত্রী-পুরুষের হার, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব, জনপ্রতি জমির পরিমাণ, নারী-পুরুষের শিক্ষার হার, নারী শিক্ষার হার, উচ্চ শিক্ষার হার ইত্যাদির তুলনামূলক হ্রাস বা বৃদ্ধির তথ্য পাওয়া যায়। জেলাভিত্তিক বা এলাকাভিত্তিক বা জাতীয়ভিত্তিক এসব তথ্যের ভিত্তিতে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যায়। জনসংখ্যার গতি ও প্রকৃতি নিরূপণ করা যায়। বস্তুত জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় যে কোন তথ্য সংগ্রহের উৎস হল আদমশুমারি রিপোর্ট।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রিপোর্ট থেকে অনুরূপ তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন দেশের অবস্থান সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণা করা যায়। এগুলো হল জনসংখ্যার ঘনত্ব, মাথাপিছু আয়, জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, গড় আয়ুষ্কাল ইত্যাদির সমন্বয়ে সারণি-৩ এ একটি তুলনামূলক তথ্য দেওয়া হল।

সারণি-৩ **

নির্বাচিত কয়েকটি দেশের তুলনামূলক তথ্য

দেশ	প্রতিবর্গ কিলোমিটার জনসংখ্যা	মাথাপিছু আয় (ইউএস ডলার)	জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার %	প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল
বাংলাদেশ**	৯৫৩**	৫২০**	২০.৬**	৫.৬**	১.৪১**	৬৫.৪**
নেপাল	২০১**	২৯০***	৩৫*	১১.০*	২.২০****	৫৭.৮*
ভারত	৩৪৯	৮২০	২৬	৯.০	১.৪০	৬২.৫
পাকিস্তান	২০৯	৭৭০	৩৯	১১.০	২.০৩	৬১.১
শ্রীলংকা	৩২২	১৩০০	১৮	৬	০.৭৯	৭১.৮
ইন্দোনেশিয়া	১২৪	১৪২০	২৩	৬	১.৪৫	৬৮
চীন	১৩৯	২০১০	১৫	৬	০.৫৮	৭১.৪
জাপান	৩৩৭	৩৮৪১০	৯	৮	০.০৫	৮০.৭
কানাডা	০৩	৩৬১৭০	১১.০	৭.০	০.৯০	৭৯.৪
যুক্তরাষ্ট্র	৩১	৪৪৯৭০	১৫.০	৯.০	০.৯২	৭৭.১*

উপরের সারণি-৩ থেকে দেখা যায় যে, আমাদের দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব উল্লিখিত দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এবং তা অন্য দেশগুলোর তুলনায় খুবই সামঞ্জস্যহীন। আমাদের মাথাপিছু আয় এখনো সর্বনিম্ন পর্যায়ে। উন্নত দেশগুলোর কথা বাদ দিলেও আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার মাথাপিছু আয়ও আমাদের চেয়ে বেশি। তবে আশাব্যঞ্জক চিত্রটি এই যে, আমাদের জন্মহার ও মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এদিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে আশাব্যঞ্জক। এখানে লক্ষণীয় যে শ্রীলংকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাংলাদেশের চেয়ে কম হলেও তা মৃত্যুহার বেশি থাকার কারণে হয়েছে। প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের দিক থেকেও শ্রীলংকা ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ কিছুটা অগ্রসরমাণ।

সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, বাংলাদেশে অধিক জনসংখ্যা কিন্তু বিভিন্ন সম্পদ এমনকি জমির পরিমাণও তুলনামূলকভাবে খুবই কম। ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকারী সামগ্রী, যা সার্বিকভাবে সামাজিক অবস্থার মাপকাঠিরূপে বিবেচিত হয়, তার মাথাপিছু পরিমাণ খুবই কম। যেমন স্বাস্থ্যসেবার অভাব, খাদ্যশস্যের অভাব, পরিমিত ক্যালরির অভাব, পানীয় জলের অভাব ইত্যাদি।

এছাড়াও অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব দেখা যায়। এসবই অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অপরিকল্পিত ও অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল।

---

* বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০১, world life Expectancy Chart- 2000 ও 1998

** বিবিএস -২০০৬ ও ২০০৭ (১২৬, ১২৯, ১১ পৃ:)

*** Attp : //www.finfacts.com/biz10/global world incomepercapita.htm

**** http : //www.photius.com/rankings/population growth rate 2005.1html

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পুত্র সন্তান কামনা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কী ধরনের কারণ ?

ক. সামাজিক   খ. রাজনৈতিক
গ. অর্থনৈতিক   ঘ. ধর্মীয়

২। দেশের মোট ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে–

i. মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাস পায়
ii. ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়
iii. ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii
গ. i ও ii   ঘ. i, ii ও iii

নিচে প্রদর্শিত ছবির ভিত্তিতে ৩ এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৩। উপরের ছবিতে বাংলাদেশে বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত কোন প্রথাটি প্রদর্শিত হচ্ছে?

ক. শুভবিবাহ   খ. বাল্যবিবাহ
গ. মুসলিম বিবাহ   ঘ. হিন্দু বিবাহ

৪। মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহের ন্যূনতম বয়স

ক. ২১ বছর   খ. ২০ বছর
গ. ১৯ বছর   ঘ. ১৮ বছর

সৃজনশীল প্রশ্ন

সুমন ও ইমন একই শ্রেণীতে পড়ালেখা করে। তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। সুমনের দাদা এবং ইমনের দাদা সহোদর ছিল। কিন্তু ইমনের দাদার পরিবারে সন্তান সংখ্যা কম থাকায় তার পিতা পৈতৃক সূত্রে অধিক জমি ও সম্পত্তির মালিক। পক্ষান্তরে সুমনের দাদার পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি থাকায় তার পিতা কম সম্পদের মালিক হয়। এর পরিণতিতে সুমনের পরিবারে জীবনযাত্রার মান ইমনের পরিবারের তুলনায় নিম্নপর্যায়ের। সুমনের পিতা দারিদ্র্যের কবলে পড়ে নানা বঞ্চনার শিকার হলেও ইমনের পিতা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সক্ষম হয়।

ক. ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ সীমিত থাকলে জনসংখ্যা অধিক হওয়ায় পরিণতি কী হবে?

খ. পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সুমনের পরিবার কেন দারিদ্র্যের কবলে পতিত হল?

গ. সুমনের পরিবার কীভাবে দারিদ্র্য অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে, তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে 'পরিকল্পিত পরিবার কর্মসূচি' এর কার্যকরিতা মূল্যায়ন কর।

সপ্তম অধ্যায়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতি বছরই আমাদের জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের বিপুল ক্ষতি সাধন করে থাকে। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থিতিই এসব দুর্যোগের অন্যতম কারণ। নদীমাতৃক, প্রায় সমতল এদেশটির উত্তরে বিশাল হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীসমূহের উৎস হয় ভারতে না হয় নেপালে। দক্ষিণাঞ্চলে পাহাড়, পর্বত, টিলা বা এমন কোনো প্রাকৃতিক বাধা নেই, যা ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার ফলে হিমালয়ে পুঞ্জীভূত বরফগলা পানি নিচে নামতে শুরু করলে অথবা অতিবৃষ্টি হলে আমাদের দেশে বন্যা হয়ে থাকে। অপরদিকে উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত বলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এ থাকাসহ অন্যান্য কারণে সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরূপ ভৌগোলিক বাস্তবতার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়েই আমাদের থাকতে হচ্ছে।

তাই আমাদের মত দুর্যোগপ্রবণ দেশের প্রতিটি নাগরিকের বিপর্যয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। দুর্যোগ হচ্ছে এরূপ ঘটনা, যা সমাজের স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রচণ্ডভাবে বিঘ্ন ঘটায় এবং জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের পক্ষে নিজস্ব সম্পদ দিয়ে এই ক্ষতি মোকাবিলা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে বাইরের সাহায্য বা হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে বিপর্যয় (Hazard) বলতে বুঝানো হয়েছে কোনো এক আকস্মিক ও চরম প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট ঘটনাকে। এই ঘটনা জীবন, সম্পদ ইত্যাদির ওপর প্রতিকূলভাবে আঘাত করে পরবর্তীতে দুর্যোগ (Disaster) এর সৃষ্টি করতে পারে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে দুর্যোগ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহের সমষ্টি এবং এগুলোর প্রায়োগিক কাজ, যা প্রশাসনিক সকল স্তরের দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়সমূহের কার্যক্রমকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এরূপ একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান যার আওতায় পড়ে–যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম। দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগজনিত সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উদ্দেশ্যে কাজ করাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য। সম্ভাব্য দুর্যোগ সংঘটন কমানো এবং এর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আসন্ন দুর্যোগের বিষয়ে সতর্ক সংকেত প্রচারের ব্যবস্থাদি প্রস্তুত রাখা, দুর্যোগপ্রবণ এলাকার অবস্থাদি সর্বদা পরিবীক্ষণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পর্যালোচনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য হল তিনটি :

(ক) দুর্যোগের সময় জীবন, সম্পদ এবং পরিবেশের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা এড়ানো বা ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা;

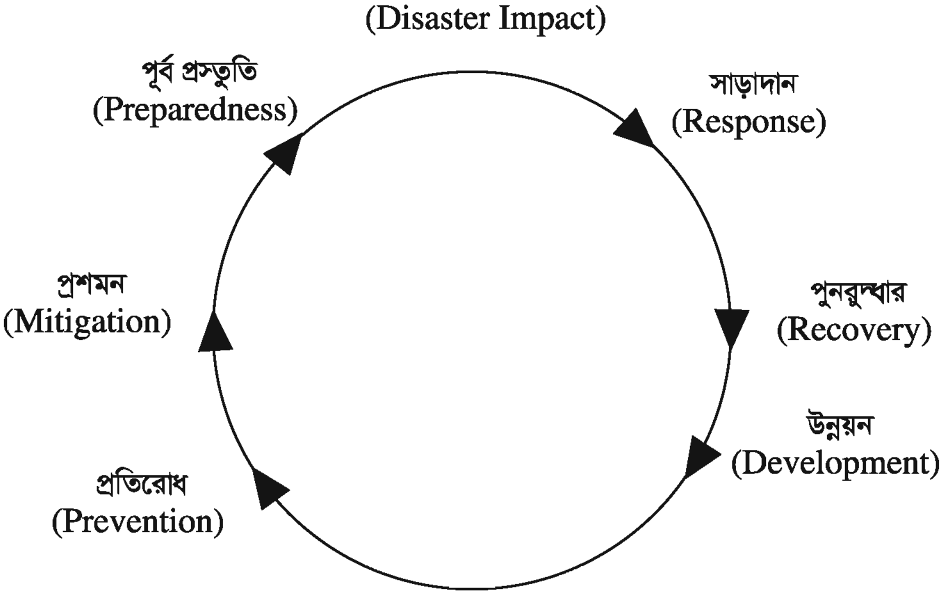
(খ) প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে অল্প সময়ে সকল প্রকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং

(গ) দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করা।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী সময়ের কার্যক্রমকে বুঝায়।

নিম্নে প্রদত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপাদানসমূহ ও দুর্যোগের কোন্ স্তরে কী ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হল –

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র



অতীতে দুর্যোগ সংঘটনের পরপরই ব্যাপক ত্রাণকার্য পরিচালনাকেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলে মনে করা হত। বস্তুত ত্রাণকার্য সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি উপাদান মাত্র। উপরের চক্রে দেখা যাচ্ছে যে, দুর্যোগপূর্ব কার্যকলাপ যেমন, দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মুখ্য উপাদান। এসব উপাদানের সার্বিক বাস্তবায়ন দুর্যোগ সংঘটনের পূর্বে নিশ্চিত করার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। এর যে কোনোটি অসম্পূর্ণ থাকলে গোটা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিপর্যয় দেখা দেবে। সুতরাং দুর্যোগকে কার্যত মোকাবিলার লক্ষ্যে দুর্যোগপূর্ব সময়েই এর ব্যবস্থাপনার বেশি কাজ সম্পন্ন করতে হয়।

দুর্যোগ সংঘটনের পরপরই এর ব্যবস্থাপনার অন্যান্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাড়াদান, পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন। অতীতে দুর্যোগে সাড়াদানকেই সম্পূর্ণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলে ধরে নেওয়া হত। সাড়াদান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি অংশ মাত্র। দুর্যোগের পরপরই উপযুক্ত সাড়াদানের প্রয়োজন হয়। সাড়াদান বলতে নিরাপদ স্থানে অপসারণ, তল্লাশি ও উদ্ধার, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমকে বুঝায়।

দুর্যোগে সম্পদ, পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ইত্যাদির যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনাকেই পুনরুদ্ধার বুঝায়। এক্ষেত্রে সরকারি, অসরকারি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পরপরই ঐ এলাকার উন্নয়ন কাজে হাত দিতে হয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়ার পূর্বে এলাকার ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের ওপর লক্ষ রাখতে হবে।

যদিও বাংলাদেশ একটি প্রায় সমভূমি অঞ্চল, তথাপি এর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দুর্যোগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভোলা বা অন্যান্য দ্বীপসমূহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রবণ এবং উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী ইত্যাদি খরাপ্রবণ অঞ্চল। এ দুইটি বৈশিষ্ট্য সামনে রেখে আমরা যদি সরকারি ভবনসমূহ যেমন থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র, স্কুল ভবন এবং সরকারি অফিসাদি নির্মাণ করি তবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লোকজন যথাযথভাবে নির্মিত এসব ভবনকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহার করতে পারে। এতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সরকারকে পৃথকভাবে ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে না। সুতরাং উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেওয়ার পূর্বে এলাকাভিত্তিক ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহের দিকে নজর দেওয়া দরকার।

প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও এর ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ব্যাপারে প্রতিরোধ কার্যক্রম সুফল বয়ে আনতে পারে। দুর্যোগ প্রতিরোধের কাঠামোগত (Structural) এবং অকাঠামোগত (Non-structural) প্রশমনের ব্যবস্থা রয়েছে। কাঠামোগত প্রশমনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্মাণ কার্যক্রম যথা- বেড়িবাঁধ তৈরি, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, পাকা ও মজবুত ঘরবাড়ি তৈরি, নদী খনন ইত্যাদি বাস্তবায়নকেই বুঝায়। কাঠামোগত দুর্যোগ প্রশমন খুবই ব্যয়বহুল, যা অনেক দরিদ্র দেশের পক্ষে বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অকাঠামোগত দুর্যোগ প্রতিরোধ যেমন- প্রশিক্ষণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, পূর্বপ্রস্তুতি ইত্যাদি কার্যক্রম স্বল্প ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এতে এককালীন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় না। গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে সরকার দুর্যোগ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো জুন, ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার লোককে দুর্যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। দেশের সকল শ্রেণীর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার কোর্সে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ওপর অন্তত দু'ঘণ্টার একটি অধিবেশন রাখাও আবশ্যিক করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকর্তা সরকারি সফরে গ্রামাঞ্চলে গেলে সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির ওপর জনসাধারণের নিকট অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করার জন্যও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন।

তাই আমাদের এ দরিদ্র দেশে দুর্যোগের অকাঠামোগত প্রতিরোধের ব্যাপারে জোরালো এবং অর্থবহ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফলে দুর্যোগের ক্ষতি হ্রাসের জন্য আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া, প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দুর্যোগের দীর্ঘস্থায়ী হ্রাস এবং দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতিকেই দুর্যোগ প্রশমন বলা হয়। মজবুত পাকা ভবন নির্মাণ, শস্য বহুমুখীকরণ, ভূমি ব্যবহারে বিপর্যয় হ্রাসের কৌশল নির্ধারণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শক্ত অবকাঠামো নির্মাণ, কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লোক স্থানান্তর; প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম দুর্যোগ প্রশমনের আওতাভুক্ত। দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ প্রশমন ব্যয়বহুল হলেও সরকার সীমিত সম্পদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বেড়িবাঁধ নির্মাণ, নদী খনন, আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

দুর্যোগ প্রস্তুতি বলতে দুর্যোগপূর্ব সময়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থাসমূহকে বুঝায়। আগে থেকে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ড্রিল (Drill) বা ভূমিকা অভিনয় এবং রাস্তাঘাট, যানবাহন, বেতারযন্ত্র ইত্যাদি দুর্যোগের পূর্বে প্রস্তুত রাখা দুর্যোগ প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত।

যেহেতু আমাদের দেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল, সেহেতু দুর্যোগ বিষয়ে আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। এ অভিজ্ঞতার আলোকে সরকারের দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি সংশ্লিষ্ট সকলের অবশ্যই পালনীয়। এতে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দফতর ও সংস্থাসমূহের দায়দায়িত্ব এবং বিভিন্ন পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট আটটি কমিটি এবং ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে একটি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা আছে। জাতীয় পর্যায়ের এসব কমিটিবিষয়ক আলোচনা পরবর্তী পৃষ্ঠায় করা হল–

(ক) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ কাউন্সিলের সভাপতি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীবর্গ, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ এ কাউন্সিলের সদস্য। এ কাউন্সিলের প্রধান কাজ হল দুর্যোগ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

(খ) আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এ কমিটির সভাপতি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকবৃন্দ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রধানগণ কমিটির সদস্য। কমিটির প্রধান দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ে সমন্বয় সাধন, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থা কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত নীতিসমূহের বাস্তবায়ন এবং কাউন্সিলকে যথাযথ পরামর্শদান ইত্যাদি।

(গ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি। দুর্যোগপ্রবণ এলাকা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়, অসরকারি সংস্থা (এনজিও), সাহায্যদাতা সংস্থা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি থেকে দুর্যোগ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, রেড ক্রিসেন্ট ও চেম্বার অব কমার্স এর চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স এর প্রেসিডেন্ট, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এসোসিয়েশন, কৃষি ব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমিটির সদস্য। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালক কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এ কমিটি প্রধানত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে। সংঘটিত দুর্যোগসমূহের মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রমের পোস্টমর্টেম ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে কমিটি সরকার ও বিভিন্ন কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে।

(ঘ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এ বোর্ডের সভাপতি। তাছাড়া মহাপরিচালক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, 'স্পারসো' এর চেয়ারম্যান, আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বোর্ডের সদস্য রয়েছেন এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি এর পরিচালক বোর্ডের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বোর্ডের প্রধান দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম পর্যালোচনা করা এবং যথাসময়ে ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

(ঙ) দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট 'ফোকাল পয়েন্ট'দের কার্যক্রম সমন্বয়কারী দল- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালক সমন্বয়কারী দলের সভাপতি। স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রভৃতি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকগণ, আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক, 'স্পারসো' এর চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের প্রধানগণ দলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর পরিচালক (পরিকল্পনা) দলের সদস্য-সচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত। সমন্বয়কারী দলের প্রধান কাজের মধ্যে রয়েছে, বিভিন্ন বিভাগের দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন, বিভিন্ন বিভাগের দুর্যোগ বিষয়ক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনা, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা এবং এসবের সম্ভাব্য সমস্যা ও প্রয়োগের ব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তাছাড়া দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন এলাকায় সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে খাদ্যদ্রব্য, ওষুধ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুদ রাখার ব্যাপারেও আলোচনা করা।

(চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত টাস্কফোর্স- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালক 'টাস্কফোর্স' এর সভাপতি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যেসব সরকারি এবং অসরকারি সংস্থা প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কাজ করে, তারা ঐ 'টাস্কফোর্স' এর সদস্য। 'টাস্কফোর্স' এর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন, প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বিষয়ক পাঠ্যসূচির পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করা।

(ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বয় কমিটি- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালক এ কমিটির সভাপতি। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এর মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অসরকারি সংস্থাসমূহের প্রধানগণ কমিটির সদস্য। কমিটির প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সরকারি ও অসরকারি কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় সাধন, সরকারি ও অসরকারি প্রচেষ্টার দ্বৈততা পরিহার এবং পরিকল্পিত উপায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা।

(জ) দুর্যোগ সংক্রান্ত সংকেতসমূহ দ্রুত প্রচার সম্পর্কিত কমিটি- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালক এ কমিটির সভাপতি। বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, গণসংযোগ অধিদপ্তর, ফিল্ম ও পাবলিসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকগণ, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, বন্যা পূর্বাভাসের পরিচালক, আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক এবং 'স্পারসো' এর চেয়ারম্যান কমিটির সদস্য। কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার সংকেতসমূহ দ্রুত প্রচার নিশ্চিত করা এবং এ ব্যাপারে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জাতীয় পর্যায়ে আটটি কমিটি ছাড়াও দেশের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ রয়েছে–

(অ) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি- সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক কমিটির সভাপতি। জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের প্রধানগণ, ঐ জেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ, বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি এ কমিটির সদস্য। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এ কমিটির সদস্য-সচিব। কমিটির প্রধান কাজ হচ্ছে উপজেলা দুর্যোগব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, দুর্যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা, জেলা পর্যায়ে দুর্যোগপ্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থা এবং দুর্যোগকালে উপযুক্ত সাড়াদানসহ ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(আ) থানা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি- সংশ্লিষ্ট থানা/উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ কমিটির সভাপতি। উপজেলার সব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, উপজেলায় কর্মরত সংশ্লিষ্ট সরকারি ও আধাসরকারি দপ্তরসমূহের প্রধানগণ, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সভাপতি, উপজেলায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি কমিটিতে সদস্য আছেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কমিটির সদস্য-সচিব। কমিটির প্রধান দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে উপজেলায় অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নসমূহের জন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং ঐ কমিটিগুলোকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দান এবং সক্রিয়করণ। প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা কার্যক্রম ছাড়াও দুর্যোগ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্যোগকালে সাড়াদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

(ই) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি- সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এ কমিটির সভাপতি। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ইউনিয়নে কর্মরত শিক্ষক প্রতিনিধি, ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মচারী ও অসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি প্রমুখ কমিটিতে সদস্য রয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের সেক্রেটারি কমিটির সদস্য-সচিব। কমিটির প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, দুর্যোগ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ, ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্যোগকালে উপযুক্ত সাড়াদান ইত্যাদি।

দুর্যোগপূর্বে, দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সারাদেশে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটির এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি, আধাসরকারি ও অসরকারি সংস্থা/দপ্তরের বহুমুখী বিশাল কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সরকারি দপ্তরের প্রয়োজনীয়তা দেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হতে থাকে। ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের মারাত্মক বন্যা এবং ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পর সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাছে বিষয়টি আরো প্রবলভাবে অনুভূত হয়। ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন, দুর্যোগ ব্যাপারে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা ও সেবা কার্যের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর থেকে ব্যুরো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করে আসছে। সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব ব্যুরোর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়কের ভূমিকায় 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি' বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির একটি অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। সংগঠনটি ঘূর্ণিঝড়ে সাড়াদান, যোগাযোগ রক্ষা, প্রস্তুতি এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এ কর্মসূচির আওতায় উপকূলীয় জেলাসমূহে বত্রিশ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবী ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতি, উদ্ধার ও পুনর্বাসন কাজ এবং ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত যোগাযোগের ব্যাপারে খুবই প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেমন- ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, খরা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদিকে তাৎক্ষণিক মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল আবহাওয়ার তথ্যভিত্তিক সময়মত পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ। এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য সরকারি পেশাভিত্তিক দপ্তর হিসেবে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কাজ করে থাকে। পাশাপাশি মহাকাশ গবেষণার জন্য সরকারি আর একটি সংস্থা হচ্ছে 'স্পারসো'। স্পারসো ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মেঘচিত্র সরবরাহ করে আবহাওয়া অধিদপ্তরকে পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে সহায়তা করছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আবহাওয়ার উপাত্ত সংগ্রহ করে, রাডার চিত্র নিয়ে অঙ্কন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র বন্যা সংক্রান্ত পূর্বাভাস দান ও প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে। যদিও ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার কোনো কলাকৌশল অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি, তথাপি রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়। জরুরি পরিস্থিতিতে আর্তদের চিকিৎসা, উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসন কাজে আমাদের সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ বেসামরিক প্রশাসনকে সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতা দান করে থাকেন। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন দুর্যোগ সংক্রান্ত সংকেতসমূহ প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কর্মরত অসরকারি সংস্থাসমূহ যেমন- অক্সফাম, ডিজাস্টার ফোরাম, কেয়ার বাংলাদেশ, কারিতাস, প্রশিকা, সিসিডিবি, বিডিপিসি (বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্র) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যক্রম যেমন- উন্নয়ন, প্রতিরোধ, প্রশমন ও প্রস্তুতি ইত্যাদি স্বাভাবিক সময়েই অর্থাৎ দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় সফলভাবে পরিচালিত করলে দুর্যোগকালীন সময়ে আমরা দুর্যোগের হাত থেকে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশকে বহুলাংশে রক্ষা করতে সক্ষম হব। তাই যথাযথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ মোকাবিলার স্বার্থে আমাদেরকে দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত আপদকালীন পরিকল্পনা, ব্যক্তি, পরিবার, গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে তৈরি করে অনুশীলনের মাধ্যমে এসবের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা উচিত। ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগের সংকেত সম্পর্কে ধারণা, নিকটবর্তী আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া এবং কিল্লাসমূহে গবাদিপশু প্রেরণ, প্রাথমিক চিকিৎসা, শুকনা খাবার, পানীয় জল, দিয়াশলাই ও মোমবাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখার বিষয়গুলো আমাদের জেনে রাখা আবশ্যক। ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান ও এগুলোর সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখার পদ্ধতি এবং দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য দ্রব্যাদি সাধ্য অনুযায়ী সংরক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয় সামনে রেখে পারিবারিক বা স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা পূর্বাহ্নেই তৈরি করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের মনে রাখতে হবে, আগে থেকে সতর্ক ও প্রস্তুতি থাকলেই যে কোনো বিপদের যথাযথ মোকাবেলা করা সম্ভব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে হ্রাস করার গুরুত্বপূর্ণ উপায় কী ?

ক. দুর্যোগের ওপর গণসচেতনা বৃদ্ধি
খ. দুর্যোগের কর্মপরিকল্পনা তৈরি
গ. পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণ
ঘ. অধিক হারে বৃক্ষরোপণ

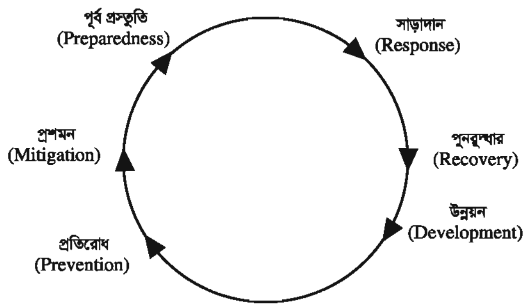
২। বাংলাদেশে বন্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী–

i. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া
ii. মৌসুমি বায়ুর প্রভাব
iii. হিমালয়ের পুঞ্জীভূত বরফ গলে যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii

নিম্নে প্রদর্শিত চিত্রের ওপর ভিত্তি করে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৩। উপরিল্লিখিত চক্রটিকে বলা হয়–

ক. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র
খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র
গ. দুর্যোগ প্রতিরোধ চক্র
ঘ. দুর্যোগ প্রশমন চক্র

৪। ওপরের চক্রে দুর্যোগপূর্ব কার্যকলাপ হচ্ছে–

i. দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি
ii. দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগ এ সাড়াদান এবং পুনরুদ্ধার
iii. দুর্যোগে সাড়াদান, পুনরুদ্ধার এবং দুর্যোগ উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতি বছরই আমাদের জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের বিপুল ক্ষতি সাধন করে। ২০০৪ সালের বন্যায় প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি সাধন হয়েছিল। যদিও চট্টগ্রাম এবং খুলনা অঞ্চল ২০০৪ সালের বন্যায় কবলিত হয়নি। কিন্তু সিলেট ও ঢাকা বিভাগের নিম্নাঞ্চল বন্যায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকার এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বেড়িবাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, পাকা ও মজবুত ঘরবাড়ি তৈরি, নদী খনন, প্রশিক্ষণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, পূর্ব প্রস্তুতি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

ক. বেড়িবাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র, নদীখনন কোন ধরনের কার্যক্রম?

খ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ব্যয় সাশ্রয়ী একটি পদক্ষেপ ব্যাখ্যা কর।

গ. বাংলাদেশের একটি নকশা মানচিত্র অংকন কর এবং তাতে ২০০৪ সালের বন্যামুক্ত এবং বন্যাকবলিত জেলাসমূহ দেখাও।

ঘ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত দুর্যোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

অষ্টম অধ্যায়

এইডস

চারটি ইংরেজি শব্দ–Acquired Immune Deficiency Syndrome এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল AIDS (এইডস)। আবার তিনটি ইংরেজি শব্দ Human Immunodeficiency Virus এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল HIV (এইচআইভি)। এইচআইভির কারণে এইডস হয়। কোনো রোগ বা সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য শরীরের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে এইচআইভি ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করে দেয়। তাই, এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অতি সহজেই যে কোনো রোগে (যেমন : নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ডায়রিয়া) আক্রান্ত হয়ে পড়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞান এইডস-এর কোনো প্রতিষেধক বা কার্যকর ওষুধ এখনো আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। ফলে নিশ্চিত অকাল মৃত্যুই এইডস-এ আক্রান্ত ব্যক্তির শেষ পরিণতি। তাই, এইডস একটি ঘাতক ব্যাধি হিসেবে পরিচিত।

মানবদেহে এইচআইভি প্রবেশ করার সাথে সাথেই শরীরে এইডস এর লক্ষণ দেখা যায় না। এইচআইভি শরীরে প্রবেশ করার ঠিক কতদিন পর একজন ব্যক্তির মধ্যে এইডস-এর লক্ষণ দেখা দেবে তা ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা এবং অঞ্চলভেদে ভিন্নতর হয়। তবে এটা মনে করা হয়ে থাকে যে, এইচআইভি সংক্রমণের শুরু থেকে এইডস-এ উত্তরণ পর্যন্ত সময়ের ব্যাপ্তি সাধারণত ৬ মাস থেকে বেশ কয়েক বৎসর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫-১০ বৎসর অথবা তারও বেশি। এই দীর্ঘ সুপ্তাবস্থার তাৎপর্য হচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমিত একজন ব্যক্তি (যার শরীরে এইডস-এর কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি বা যে আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ) তার অজান্তেই অন্য একজন সুস্থ ব্যক্তির দেহে এইচআইভি ছড়িয়ে দিতে পারে।

এইডস-এর প্রধান লক্ষণসমূহ

এইডস-এর নির্দিষ্ট কোনো লক্ষণ নেই। তবে, এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অন্য যে রোগে আক্রান্ত হয় সে রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এই লক্ষণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : (১) শরীরের ওজন অতি দ্রুত হ্রাস পাওয়া, (২) দীর্ঘদিন (দুমাসেরও বেশি সময়) ধরে পাতলা পায়খানা, (৩) পুনঃপুন জ্বর হওয়া বা রাতে শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, (৪) অতিরিক্ত অবসাদ অনুভব করা, (৫) শুকনা কাশি হওয়া ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, কারো মধ্যে উপরিউক্ত একাধিক লক্ষণ দেখা দিলেই তার এইডস হয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যাবে না। তবে, কোনো ব্যক্তির এসব লক্ষণ দেখা দিলে বিলম্ব না করে অভিজ্ঞ বা দক্ষ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে এইচআইভি সংক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

এইচআইভি কীভাবে সংক্রমিত হয়

বায়ু, পানি, খাদ্য অথবা সাধারণ ছোঁয়ায় বা সংস্পর্শে এইচআইভি ছড়ায় না। এইচআইভি মানবদেহের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট তরল পদার্থে (রক্ত, বীর্য, বুকের দুধ) বেশি থাকে। ফলে, মানবদেহের এই তরল পদার্থগুলোর আদান-প্রদানের মাধ্যমে এইচআইভি ছড়াতে পারে। সুনির্দিষ্টভাবে যে যে উপায়ে এইচআইভি ছড়াতে পারে, তা হল :

১) এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত রোগীর রক্ত কোনো ব্যক্তির দেহে পরিসঞ্চালন করলে
২) আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত সুচ বা সিরিঞ্জ অন্য কোনো ব্যক্তি ব্যবহার করলে
৩) আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো অঙ্গ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে
৪) এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে (গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে বা সন্তানের মায়ের দুধ পানকালে) তার শিশু এই রোগে সংক্রমিত হতে পারে।
৫) অনৈতিক ও অনিরাপদ দৈহিক মিলন ঘটলে।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ

এইচআইভি সংক্রমণের উপায়গুলো জেনে এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা এইডস প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে পারি। এইডস প্রতিরোধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হল :

১) আমাদের সকল আচরণে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন যথাযথভাবে অনুসরণ করা,

২) অন্যের রক্ত গ্রহণ বা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের আগে রক্তে এইচআইভি আছে কি-না তা অবশ্যই পরীক্ষা করে নেয়া,

৩) ইনজেকশন নেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবারই নতুন সুচ/সিরিঞ্জ ব্যবহার করা এবং অপারেশনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করে নেয়া,

৪) অনৈতিক ও অনিরাপদ যৌন আচরণ থেকে বিরত থাকা,

৫) এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত মায়ের সন্তান গ্রহণ বা সন্তানকে বুকের দুধ দানের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া,

৬) কোনো যৌনরোগ থাকলে বিলম্ব না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া।

এইডস প্রতিরোধ : ‘না’ বলা

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ‘না’ বলা একটি বড় কৌশল। অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা প্রায়শই আবেগ দ্বারা চালিত হয়, যুক্তি দ্বারা নয়। জীবনের সমস্যা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে অনেক সময় ‘না’ বলার প্রয়োজন হয় এবং নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে হয়, যা অল্পবয়সীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ।

এমন হতে পারে যে, একজন শিক্ষার্থী তার সহপাঠী বা প্রিয় বন্ধুর একটি প্রস্তাব পেল যা তাকে যৌন আচরণ করতে প্ররোচিত অথবা মাদকে আসক্ত হতে প্রভাবিত করতে পারে। শিক্ষার্থী কিছুতেই এই প্রস্তাব মানতে চায় না, আবার বন্ধুত্বও নষ্ট করতে চায় না। এমন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে ‘না’ বলতে হবে। একবার এবং বারবার। সহপাঠী বন্ধুটি এবং অন্যরা তাকে জোর করতে পারে। এমন ক্ষেত্রে তাকে দৃঢ়চেতা হতে হবে।

‘না’ বলার জন্য– (১) যুক্তি দেখাতে হবে, (২) প্রস্তাবটির ক্ষতির বিষয়টি তুলে ধরতে হবে, (৩) নিজ অবস্থানের দৃঢ়তা প্রকাশ করতে হবে এবং ‘না’ বলতে হবে।

“অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ

প্রতিকারবিহীন এইচআইভি/এইডস রোগের চরম পরিণতি মৃত্যু, তাই সকলকে বিশেষ করে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদেরকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিভিন্ন দেশের সাম্প্রতিক এইচআইভি/এইডস পরিস্থিতি থেকে জানা যায় যে, নতুন এইচআইভি আক্রান্তদের অর্ধেকই ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী। অন্যদিকে এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ বয়সী মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অধিক ঝুঁকিতে রয়েছে। এর প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে : (১) আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে মেয়েদের দুর্বল অবস্থান, (২) মেয়েরা এইচআইভি/এইডস বিষয়ে ছেলেদের তুলনায় কম অবহিত, (৩) নারী-পুরুষ বৈষম্যের কারণে পুরুষ দ্বারা মেয়েদের নিগৃহীত হওয়া, (৪) মেয়েদের অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধাদানের ক্ষমতার অভাব, (৫) মেয়েদের বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং (৬) যৌন কৌতূহল ও অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক ইত্যাদি। মেয়েদের মতো অল্পবয়সী ছেলেরাও ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং এইচআইভি/এইডস থেকে মুক্ত থাকার জন্য ছেলেমেয়েদের যেমন শিক্ষিত হতে হবে, তেমনি তাদের সুরক্ষার জন্য পরিবার ও সমাজকে সচেতন হতে হবে। অন্যথায় সমগ্র জাতি এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে।

---

* আর ব্যাভিচারের কাছেও যেও না, নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ এবং খুবই মন্দ পথ।
আল কোরআন, সূরা বনী ঈসরাইল-৩২

যৌন রোগ এবং এইচআইভি

ইংরেজি শব্দাবলি Sexually Transmited Disease এবং Sexualy Traansmited Infection এর সংক্ষিপ্ত নাম যথাক্রমে এসটিডি (STD) এবং এসটিআই (STI) এসব রোগ বা সংক্রমণ সাধারণত অনিরাপদ যৌনমিলনের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। কিছু কিছু যৌনরোগ যৌনমিলন ছাড়া অন্যান্য উপায়েও সংক্রমিত হতে পারে। যৌনরোগসমূহ ভাইরাসঘটিত অথবা ব্যাকটেরিয়াঘটিত হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রধান রোগগুলো হল : গনোরিয়া, সিফিলিস, ক্ল্যামিডিয়া, এইচআইভি, জননেন্দ্রিয়ের চর্মরোগ ও ফোঁড়া, হেপাটাইটিস-বি ইত্যাদি। এসব রোগের প্রধান লক্ষণগুলো হল : যৌনাঙ্গ বা এর আশেপাশে ঘা/চুলকানি হওয়া, প্রস্রাবের সময় ব্যথা ও জ্বালা করা, যৌনাঙ্গ থেকে পুঁজ পড়া ইত্যাদি।

যৌনরোগ এবং এইচআইভি সংক্রমণের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যাদের কোনো যৌনরোগ রয়েছে তাদের এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অন্যদের চাইতে অনেকগুণ বেশি।

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির পরিচর্যা

মরণব্যাধি এইডস-এর পরিণতি আমরা জানি। একজন এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অতি সহজেই অন্যকে সংক্রমিত করে না এবং আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে না। তাই আমাদের লক্ষ রাখা প্রয়োজন এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিকে যেন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা না হয়। তাকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে উৎসাহিত করতে হবে। সুতরাং তাদের প্রতি আমাদের করণীয় হবে :

১) এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করা,
২) এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে মানসিকভাবে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করা এবং তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া,
৩) এইডস আক্রান্তদেরকে অন্যান্য সবার মতো সমান সুযোগ দেওয়া,
৪) এইচআইভি/এইডস আক্রান্তদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ থেকে বঞ্চিত না করা,
৫) পরিবার ও সমাজের অন্য সদস্যগণ কর্তৃক এদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

এইচআইভি/এইডস : বিশ্ব পরিস্থিতি ও বাংলাদেশ

এইডস এমনই মারাত্মক যে, তা মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কমিয়ে দেয় ও একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। এইডস মানবসভ্যতা এবং উন্নয়নের বিকাশের পথে অন্যতম অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে। জাতিসংঘের এইডস বিষয়ক সংস্থা UNAIDS এর সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৭ সালের শেষ অবধি বিশ্বে এইচআইভি/এইডস সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৩ কোটির বেশি। এর মধ্যে শুধুমাত্র ২০০৭ সালেই এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক এবং ঐ বছরেই এইডস-এ মৃত্যুবরণ করেছে প্রায় ২১ লক্ষ লোক। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় ১১,০০০ লোক এইচআইভিতে আক্রান্ত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী এইচআইভি/এইডস-এর ভয়াবহ বিস্তার ঘটেছে। প্রায় সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ মারাত্মকভাবে এইচআইভি/এইডস কবলিত। পূর্ব ইউরোপ এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে এর দ্রুত বিস্তার হচ্ছে। তবে এশীয় দেশসমূহেরও নিশ্চিন্ত থাকার কোনো কারণ নেই। আমাদের প্রতিবেশী ভারত এবং মিয়ানমারসহ চীন, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডেও এইচআইভি/এইডস এর ব্যাপক বিস্তৃতি লক্ষ করা যাচ্ছে। বাংলাদেশে যদিও এখন পর্যন্ত এইচআইভি/এইডস পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেনি, তবুও বিশ্ব পরিস্থিতি বিশেষ করে আঞ্চলিক পরিস্থিতির কারণে আমাদের এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকার কোনো অবকাশ নেই। এ দেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠার আগেই আমাদের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে (২০০৭) উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর (মাদক গ্রহণকারী, মহিলা ও পুরুষ যৌনকর্মী এবং তাদের খদ্দের, সমকামী, পেশাগত রক্ত বিক্রেতা, ভ্রাম্যমাণ জনগোষ্ঠী ইত্যাদি) মধ্যে সামগ্রিকভাবে এইচআইভি সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব ১% এর নিচে। ২০০৭ সালে প্রাপ্ত সরকারি তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির সম্ভাব্য সংখ্যা প্রায় ৭৫০০, এইচআইভি সংক্রমিত চিহ্নিত ব্যক্তির সংখ্যা ১২০৭, এইডস-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬৫ এবং এইডস-এ মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা ১২৩। অর্থাৎ বাংলাদেশেও এইচআইভি/এইডস-এর প্রাদুর্ভাব হয়েছে। একই সুচ ও সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহারের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার প্রায় মহামারী পর্যায়ে পৌঁছেছে। শুধুমাত্র ২০০৬ সালে বাংলাদেশে ৩৩৩ জন নতুন এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখনই এইডস সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায়গুলো যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। এইচআইভি এক ধরনের–

ক. ছত্রাক খ. রক্ত কণিকা
গ. বিশেষ ভাইরাস ঘ. ব্যাকটেরিয়া

২। এইচআইভি এইডস এ আক্রান্ত হবার ক্ষেত্রে অল্প বয়সী মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় বেশি ঝুঁকিতে আছে, কারণ–

i. আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে মেয়েদের দুর্বল অবস্থান
ii. মেয়েরা এইচআইভি এইডস বিষয়ে ছেলেদের তুলনায় কম অবহিত
iii. মেয়েদের অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধাদানের ক্ষমতার অভাব

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আক্কেল আলী সৈয়দপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘ ১০ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটিয়ে দেশে ফিরেছেন। ইতিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা যায় তিনি এইচআইভি এইডস এ আক্রান্ত।

৩। আক্কেল আলীর এইচআইভি/এইডস এ আক্রান্ত হবার সম্ভাব্য লক্ষণ হচ্ছে–

i. শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পাওয়া
ii. দীর্ঘদিন উচ্চ রক্তচাপে ভোগা
iii. রাতে শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত আক্কেল আলীর প্রতি পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশীদের কেমন আচরণ করা উচিত–

ক. দূরত্ব বজায় রাখা উচিত খ. সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করা উচিত
গ. তার অসুস্থতা নিয়ে আলোচনা করা উচিত ঘ. পরিবার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত

সৃজনশীল প্রশ্ন

হাশমত ডি ভি পেয়ে আমেরিকায় প্রবাসী হয়েছেন আজ থেকে ৭ বছর আগে। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় তিনি ধীরে ধীরে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে ঝুঁকে পড়েন। এক সময় তার পাতলা পায়খানা হয় এবং পুন:পুন জ্বর আসে। ডাক্তার উপসর্গগুলো শনাক্ত করেন এবং রক্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন যে হাশমত সাহেব এইচআইভিতে আক্রান্ত। ইতিমধ্যে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এইচআইভি–আক্রান্ত হবার ভয়ে স্ত্রী হাসনা সন্তান নিয়ে বাবার বাড়ি চলে যান। এমনকি হাশমতের বাবা পর্যন্ত এইডস এর ভয়ে ছেলেকে এড়িয়ে চলে। একদিন এক স্বাস্থ্যকর্মী হাসনার বাড়িতে আসে এবং বিষয়টি জানতে পেরে এইচআইভি সংক্রামণের উপায়, রোগীর পরিচর্যা এবং প্রতিরোধের বিষয়ে বর্ণনা করেন। এতে হাসনা নিশ্চিত হন এবং শ্বশুর বাড়িতে ফিরে আসেন।

ক. এইডস কী?
খ. এইচআইভি সংক্রমিত হবার একটি প্রধান মাধ্যম ব্যাখ্যা কর।
গ. হাসনা ও তার পরিবারের সদস্য কীভাবে হাশমতের পরিচর্যা করতে পারে, সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।
ঘ. ''এইচআইভি –এইডস প্রতিরোধে 'না' বলা একটি কৌশল''– বিশ্লেষণ কর।

২০১০
শিক্ষাবর্ষ

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সবচেয়ে গরীব সে, যে বিদ্যা হতে বঞ্চিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা বাংলাদেশ

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য